বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৪৬

উৎসর্গ

"নিমাই তাঁহারে ধরিয়াছে বুকে, বুদ্ধ নিয়াছে কোলে।"

—কাজী নজরুল ইস্‌লাম।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্মরণে

—সেবক গ্রন্থকার।

নিবেদন

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এই বক্তৃতাগুলি লেখা হয়। ঐ বৎসর নবদ্বীপ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সমিতির আমন্ত্রণে, দোল-পূর্ণিমার দিনে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নাটমন্দিরে একটী বক্তৃতা প্রথম পাঠ করি। বিষ্ণুপ্রিয়া সমিতি আমাকে 'গৌড়তত্ত্বরত্নাকর' উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুনে ইহার কতকগুলি বক্তৃতা পাঠ করি। ১৯৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ইহার অনেকগুলি বক্তৃতা পাঠ করি। পরিশেষে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার ৪টী বক্তৃতা পাঠ করি। এই সমগ্র ১২টী বক্তৃতা এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিলেন। এজন্য সাধারণভাবে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট এবং বিশেষভাবে আমার সহপাঠী বন্ধু শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ, রেজিষ্ট্রার মহাশয়ের নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। রেজিষ্ট্রার মহাশয় উদ্‌যোগী না হইলে এত শীঘ্র এবং এত সহজে বক্তৃতাগুলি ছাপা হইত না—বহু বিঘ্ন ছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার সময়ে মাননীয় ভাইস্-চ্যান্সেলার ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জি, এম. এ., ডি. লিট্. আমাকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কৃপাপাত্র ও তদ্‌সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকার লেখক হিসাবে যে উচ্চ প্রশংসায় সম্মানিত করিয়া সভাস্থলে পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন এবং আমার প্রিয়বন্ধু বাংলার রঙ্গমঞ্চের নবযুগ-প্রবর্ত্তক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নটকেশরী শ্রীশিশিরকুমার ভাতুড়ী, এম. এ. বক্তৃতাশেষে আমাকে ধন্যবাদ দিতে গিয়া যে সকল প্রশংসা করিয়াছেন তজ্জন্য এই উভয় মনিষীর নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

দেশবন্ধুর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা অর্পণা রায়, কীর্ত্তন-সরস্বতী, আমার সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের 'নদীয়ানাগর' ভজন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। স্পষ্ট বলাই ভাল, তিনি 'নদীয়ানাগর' ভজন পদ্ধতির অনুকূলে মত দেন নাই। আমার অধ্যাপক স্বর্গীয় মনমোহন ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা

শ্রীমতী লতিকা ঘোষ, বি. এ (কলিকাতা), বি. লিট (অক্সন্), আমার সহিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর প্রচার সম্পর্কে মহাপ্রভুর নিকট আচার্য্য অদ্বৈত প্রভুর নীলাচলে তর্জা-প্রহেলিকা প্রেরণের যোগাযোগ ও সম্বন্ধ, সম্যক্ বিচার বিশ্লেষণ করিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তিনি বলেন, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর প্রচারের সহিত আচার্য্য অদ্বৈতের তর্জা-প্রহেলিকার যোগাযোগ আছে। আমার বন্ধু নবদ্বীপবাসী সুসাহিত্যিক শ্রীজনরঞ্জন রায় চৈতন্যভাগবত রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্মতারিখ লইয়া অনেক তর্ক-বিতর্কের পর শেষে আমার সহিত একমত হইয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য ইঁহাদের সকলের নিকট এবং পৃথকভাবে প্রত্যেকের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আর উল্লেখযোগ্য, আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীনবশঙ্কর রায়চৌধুরী এই দ্বাদশটী বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি লিখিয়াছে। আর আমার মধ্যম পুত্র শ্রীগৌরীশঙ্কর রায়চৌধুরী, বি. কম, এ. আই. আই. বি, ও তাহার বন্ধু শ্রীসুধাংশু মাধব দে, বি.এ, এই সমগ্র বক্তৃতাগুলির প্রুফ সংশোধন করিয়াছে। এজন্য তাহারা প্রত্যেকে আমার ধন্যবাদের পাত্র। —ইতি।

পীরতলা
নবদ্বীপ পোঃ, নদীয়া জেলা
১লা কার্ত্তিক, ১৩৫৩।

—গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম বক্তৃতা

[শ্রীচৈতন্যের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে গৌড়েশ্বর নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের "জাতিপ্রাণ" লইবার আদেশ দিয়াছিলেন কি-না? আদেশ প্রত্যাহার করার কারণ কি? পিরল্যা গ্রাম কোথায়? অদ্বৈত ও যবন হরিদাস শ্রীকৃষ্ণের অবতারের জন্য কেন প্রার্থনা করিতেছিলেন? শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণের অবতার হইবার কারণ কি? অবতারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন চরিতগ্রন্থের মত। বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্যের চেষ্টা।]

পৃঃ ১—৩৩

দ্বিতীয় বক্তৃতা

[শিশু নিমাইয়ের বাল্য-দৌরাত্ম্যের—১ম অধ্যায়—২য় অধ্যায়। নিমাইয়ের বাল্য-দৌরাত্ম্যে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের আভাষ পাওয়া যায় কি-না? বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে নিমাইয়ের প্রথম মানসিক পরিবর্ত্তন। নিমাইয়ের ছাত্রজীবনের বৈশিষ্ট্য। তিনটি অধ্যাপকের মধ্যে পণ্ডিত গঙ্গাদাসের গুরুত্ব। নিমাই কোন্ কোন্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন? মুরারি গুপ্তের সহিত বিদ্যা-কলহ। জগন্নাথ মিশ্রের তিরোভাব। নিমাইয়ের শচীমাতাকে সান্ত্বনা প্রদান। গঙ্গার ঘাটে লক্ষ্মীর সহিত নিমাইয়ের সাক্ষাৎ।]

পৃঃ ৩৪—৬১

তৃতীয় বক্তৃতা

[হুসেন সাহর রাজত্বকাল—নবদ্বীপলীলার পটভূমি। নিমাইয়ের লক্ষ্মীর সহিত বিবাহ। বিভিন্ন চরিতগ্রন্থের বর্ণনা। জয়ানন্দ ও লোচনে নদীয়ানাগর ভাব বর্ণন—বৃন্দাবনদাসে ইহার প্রতিবাদ। নিমাইয়ের অধ্যাপকলীলা—বায়ুরোগ। ঈশ্বরপুরীর নবদ্বীপ আগমন। দিগ্বিজয়ীর পরাভব। অধ্যাপক নিমাইয়ের পূর্ব্ববঙ্গে গমন। সর্প দংশনে লক্ষ্মীর মৃত্যু। নিমাইয়ের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন—"সংসার অনিত্য", এই কথা বলিয়া মাতাকে সান্ত্বনা দান।]

পৃঃ ৬২—৯১

চতুর্থ বক্তৃতা

[নিমাইয়ের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়ার দ্বিতীয়বার বিবাহ। হরিদাসের নবদ্বীপ আগমন, বিভিন্ন চরিতগ্রন্থের মতবিরোধ ও তাহার সামঞ্জস্য বিধান। গয়া গমন। গয়া হইতে ফিরিয়া নিমাইয়ের মানসিক পরিবর্ত্তন বৃদ্ধি। ১ম স্তর। ইহার পাঁচটী কারণ নির্দ্দেশ। পণ্ডিত গঙ্গাদাস নিমাইয়ের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে কোন ধারনায় আসিতে পারেন নাই কেন? অধ্যাপক জীবনের পর্য্যাবসান কেন এবং কবে হইল? বায়ুব্যাধি অথবা কৃষ্ণপ্রেমের উন্মত্ততা। শেষ ১২ বৎসর দিব্যোন্মাদের অঙ্কুর নিমাইয়ের মানসিক পরিবর্ত্তনের এই অবস্থায় পাওয়া যায় কি-না?]

পৃঃ ৯২—১২৩

পঞ্চম বক্তৃতা

[নিমাইয়ের মানসিক পরিবর্ত্তনের ২য় স্তর। অদ্বৈত নিমাইয়ের পরবর্ত্তী জীবন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, গদাধর নহেন। নিমাইয়ের বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ। কীর্ত্তনারম্ভ। কাজীর অত্যাচার। পাষণ্ডীর দৌরাত্ম্য। রাষ্ট্র ও সমাজের আবেষ্টন। নিত্যানন্দের নবদ্বীপ আগমনের হেতু কি? শ্রীবাস ভবনে নিমাইয়ের অভিষেকের অর্থ কি? অভিষেকের সময় অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের কথোপকথন—ভবিষ্যৎ প্রচারের উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ। যবন হরিদাসের উপর রাজ অত্যাচারের দরুণ নিমাইয়ের অবতার হইবার কারণ উল্লেখ।]

পৃঃ ১২৪—১৫৮

ষষ্ঠ বক্তৃতা

[নিমাই পণ্ডিতের বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের আজ্ঞা। নিত্যানন্দ ও যবন হরিদাস, এই দুই জনকে নিমাই পণ্ডিত কেন প্রথম প্রচারকরূপে নির্ব্বাচন করিলেন? প্রচারে বিঘ্ন ও তাহার কারণ বিশ্লেষণ। জগাই-মাধাই উদ্ধার—প্রচারের অভিনব প্রকৃতি নিরূপণ। চন্দ্রশেখর ভবনে নাটকাভিনয়। নিমাইয়ের রুক্মিণী বেশে নৃত্য—ইহার তাৎপর্য্য কি? পুনরায় কাজী ও পাষণ্ডীর অত্যাচার—কারণ বিশ্লেষণ। প্রতিবাদে নগর সংকীর্ত্তন। চাঁদ কাজী কে? সিমুলিয়া গ্রাম কোথায়? চাঁদ কাজীর বাড়ী আক্রমণ ও লুণ্ঠন সম্পর্কে বিভিন্ন চরিতগ্রন্থের মতের সামঞ্জস্যের চেষ্টা।]

পৃঃ ১৫৯—১৮৬

সপ্তম বক্তৃতা

[নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ বিচার। নিত্যানন্দকে সন্ন্যাসের সংকল্প জ্ঞাপনে নিত্যানন্দের উত্তর। গদাধরের আপত্তির হেতু কি? সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য কথন ও তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন চরিতগ্রন্থের মতবাদের আলোচনা। শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার আপত্তি। নিমাই অদ্বৈতকে সন্ন্যাসের সংকল্প জ্ঞাপন করিয়াছিলেন কি-না? কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম কেন হইল? সন্ন্যাসের পর শ্রীচৈতন্য প্রথম হরিদাসের বাড়ী গিয়াছিলেন কি-না? শান্তিপুর অদ্বৈতভবনে শচীমাতার সহিত সাক্ষাৎ ও নীলাচল বাসের উপযোগীতা সম্বন্ধে কথোপকথন।]

পৃঃ ১৮৭—২২২

অষ্টম বক্তৃতা

[শ্রীচৈতন্যের নীলাচল গমন ও নীলাচল বাসের হেতু কি? ভুবনেশ্বরে চৈতন্যদেবের শিবপূজা উপলক্ষে দামোদর পণ্ডিতের প্রতিবাদ এবং মুরারি গুপ্তের সমর্থনের হেতু কি? ঐ শিবস্তোত্র চৈতন্যদেবের নিজের রচিত কি-না? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও বাসুদেব সার্ব্বভৌমের মধ্যে কথোপকথন সম্পর্কে চরিতগ্রন্থে বিভিন্ন মত ও তাহার সামঞ্জস্য।]

পৃঃ ২২৩—২৪৬

নবম বক্তৃতা

[শ্রীচৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ—বিভিন্ন গ্রন্থের বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য। রামানন্দের সহিত সাক্ষাতের মূল কোথায়? শ্রীচৈতন্য অবতারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রামানন্দ রায়ের নূতন ব্যাখ্যা কী? রামানন্দ রায় ঐ ব্যাখ্যা কোথায় পাইলেন? নবদ্বীপের ভক্তমণ্ডলীতে রামানন্দের ব্যাখ্যা তখন সম্পূর্ণ অবিদিত। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণান্তর বোম্বাই প্রদেশে ভ্রমণের উদ্দেশ্য কী? শ্রীচৈতন্যদেব সমাজ-সংস্কারক ছিলেন কি-না? নীলাচলে পুনরাগমণ।]

পৃঃ ২৪৭—২৭৫

দশম বক্তৃতা

[শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল হইতে রামকেলী এবং পুনরায় নীলাচল কোন্ পথে গিয়াছিলেন? বিভিন্ন চরিতগ্রন্থের মত বিচার। রামকেলী আসিবার উদ্দেশ্য

কি? গৌড়েশ্বর হুসেন সাহ্'র দুই মন্ত্রী সাকর মল্লিক ও দবীর খাসের সহিত অর্দ্ধরাত্রে গোপন সাক্ষাতের উদ্দেশ্য কি? মথুরা-বৃন্দাবন গমন কোন্ পথে? ফিরিবার কালে প্রয়াগে শ্রীরূপ ও কাশীতে শ্রীসনাতনের সহিত কী কথোপকথন হইয়াছিল? বৈষ্ণবধর্ম্মের নীতিবাদ। নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন—ভ্রমণ শেষ।]

পৃঃ ২৭৬—৩০৩

একাদশ বক্তৃতা

[শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে প্রচারের জন্য প্রেরণের হেতু ও কাল নিরূপণ। ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন। দামোদর পণ্ডিতকে কেন শচীমাতার নিকট প্রেরণ করিলেন? ঠাকুর হরিদাস নাম-জপের কী নূতন ব্যাখ্যা দিলেন? শ্রীসনাতনের দেহত্যাগের সংকল্প ও চৈতন্যদেবের নিষেধের হেতু কী? পানিহাটীতে নিত্যানন্দের চিড়া মহোৎসব। চৈতন্যদেব পরে কোন আপত্তি করিয়াছিলেন কি-না? চৈতন্যদেবের দেহত্যাগের পূর্ব্বাভাষ কে প্রথম পাইয়াছিল? ঠাকুর হরিদাসের নির্ব্বাণ উপলক্ষ্যে চৈতন্যদেবের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।]

পৃঃ ৩০৪—৩২৪

দ্বাদশ বক্তৃতা

[শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ উজ্জ্বল নীলমণি সম্মত কি-না? উড়িয়া এক স্ত্রীলোকের জগন্নাথ দর্শন উপলক্ষে চৈতন্যদেবের ব্যবহার ও তাহার তাৎপর্য্য। শ্রীচৈতন্যের সিংহদ্বারে পতন—চটক পর্ব্বত গমন—দিব্যোন্মাদের কোন্ অবস্থা। জগদানন্দকে শচীমাতার নিকট প্রেরণের হেতু কী? শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের কত বৎসর পরে প্রতাপরুদ্রের মৃত্যু হয়। শ্রীঅদ্বৈতের তরজা-প্রহেলী প্রেরণ—তরজার অর্থ কি—তরজা প্রাপ্তে দিব্যোন্মাদ বৃদ্ধি পাইবার কারণ কি? নিদ্রিত শঙ্করের প্রতি শ্রীচৈতন্যের ব্যবহার। সমুদ্রে পতন ও উদ্ধার। শিক্ষাষ্টক শ্রীচৈতন্যের নিজমুখের বাক্য কি-না? নীতিবাদের ক্রমবিকাশ। শ্রীচৈতন্যের দেহত্যাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত বিচার। দেহ গেল কোথায়? শ্রীচৈতন্যের দেহত্যাগ শ্রবণে গৌড়দেশে ভক্তগণসমীপে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের অভিভাষণ।]

পৃঃ ৩২৫—৩৪৫

বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য*

প্রথম বক্তৃতা

[শ্রীচৈতন্যের জন্মের অব্যবাহিত পূর্ব্বে গৌড়েশ্বর নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের 'জাতিপ্রাণ' লইবার আদেশ দিয়াছিলেন কিনা? আদেশ প্রত্যাহার করার কারণ কি? পিরল্যা গ্রাম কোথায়? অদ্বৈত ও যবনহরিদাস শ্রীকৃষ্ণের অবতারের জন্য কেন প্রার্থনা করিতেছিলেন? শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণের অবতার হইবার কারণ কি? অবতারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন চরিত গ্রন্থের মত। বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্যের চেষ্টা।]

নিমাই যখন নবদ্বীপে শচীগর্ভে, ঠিক সেই সময় গৌড়েশ্বর ফতেসাহ (১৪৮৩-১৪৯১) আজ্ঞা দিলেন যে, নবদ্বীপ উচ্ছন্ন কর; নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের জাতি এবং প্রাণ নাশ কর। ইহা ১৪৮৫ খৃঃর ঘটনা।

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিব প্রমাদ।
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে
নিশ্চিন্তে না থাকহ প্রমাদ হব পাছে।
নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ অবশ্য হবে রাজা
গন্ধর্ব্বে লিখন আছে ধনুর্ম্ময় প্রজা। [চৈঃ মঃ নদীয়া খণ্ড]

* * *

এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল।

*   *   *

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়।
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে
ধনপ্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে।
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে
ঘর দ্বার লোটে তার লৌহ পাশে বাঁধে।
দেউল দেহরা ভাঙ্গে ওপারে তুলসী
প্রাণ ভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপ বাসী।
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত।

*   *   *

বিশারদ সুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য
সবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য।
উৎকলে প্রতাপ রুদ্র ধনুর্ময় রাজা
রত্ন সিংহাসনে সার্ব্বভৌমে কৈল পূজা।

[চৈঃ মঃ নদীয়া খণ্ড যবনোপদ্রব]

নদীয়া উচ্ছন্ন হইবার পর গৌড়েশ্বর রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে—

"কালী খড়্গ খর্পরধারিনী দিগম্বরী
মুণ্ডমালা গলে কাট কাট শব্দ করি।"—

রাজাকে মারিতে উদ্যত। গৌড়েশ্বর ভয় পাইয়া পাল্টা হুকুম দিলেন—

পূর্ব্বে জেমত ছিল নবদ্বীপ রাজধানী
তার শতগুণ অধিক যেন শুনি।

*   *   *

মহা মহাজন জে ছাড়িয়াছিল গ্রাম
নবদ্বীপে আইলা সভে পূর্ণ হইল কাম। [চৈঃ মঃ নদীয়া খণ্ড]

শ্রীকৃষ্ণ চক্র হাতে গৌড়েশ্বরকে ভয় দেখাইলেন না। ভয় দেখাইলেন খড়্গ হাতে মা কালী। জয়ানন্দের কথা হইতে আমরা কি পাইলাম? পাইলাম—

১ম, গৌড়েশ্বর কেন নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের জাতি প্রাণ নাশ করিয়া, নদীয়া উচ্ছন্ন করিবার আজ্ঞা দিলেন। 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে',—'গন্ধর্ব্বে লিখন আছে', 'নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ অবশ্য হবে রাজা',—যদিও ইহা মিথ্যা কথা, তথাপি গৌড়েশ্বর ইহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিলেন। এবং একথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উচ্ছেদ করার গুরুতর রাজনৈতিক কারণ দেখা যায়। হিন্দু বা যবন কোন্ রাজা, সিংহাসনচ্যুত হইবার আশঙ্কা থাকিলে বিদ্রোহী প্রজাকে সময় থাকিতে দমন না করেন? ইহা রাজধর্ম্ম।

২য়, গৌড়েশ্বরের নামটি জয়ানন্দ করেন নাই সত্য, কিন্তু ইতিহাসে আমরা দেখিয়াছি যে ফতে সাহ-ই এই গৌড়েশ্বর। তাঁহার রাজত্বকালেই (১৪৮৩-১৪৯১) এই ঘটনা ১৪৮৫ খৃঃ ঘটিয়াছিল।

৩য়, নবদ্বীপের কাছেই পিরল্যা গ্রাম, এখনও আছে। এই গ্রামের ব্রাহ্মণেরা মুসলমান হইয়াছে; তাহারাই রাজদরবারে মিথ্যা গুজব রটাইয়া, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের মুসলমান করিতে চায়। ইহাও খুব স্বাভাবিক ইচ্ছা। ব্রাহ্মণ যখনই মুসলমান হইয়াছে, তাঁহার হিন্দু-বিদ্বেষ ইতিহাসে প্রলয় কাণ্ড না করিয়া ছাড়ে নাই। বহু দৃষ্টান্ত আছে।

৪র্থ, অলৌকিক উপায়ে এই অত্যাচার দমন হইল। কারণ লৌকিক উপায়ে এই অত্যাচার দমন করিবার সামর্থ্য নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের ছিল না। ক্ষত্রিয়েরা নাই, ক্ষত্রিয় বর্ণই লুপ্ত। শূদ্রেরা বহু জাতিতে বিভক্ত, কেহ কারুর জল ছোঁয় না। মুসলমানদের মত একতা নাই। লৌকিক উপায় সম্ভব ছিল না।

৫ম, বাসুদেব সার্ব্বভৌম এই অত্যাচারে নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যায় পলাইয়া গেলেন। সুতরাং নিমাই ভূমিষ্ঠ হইবার কয়েক মাস পূর্ব্বেই তিনি নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিলেন।

নিমাইয়ের জন্ম তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

কিন্তু রাজা প্রতাপ রুদ্র ১৪৮৫ খৃঃ তাঁহাকে রত্নসিংহাসনে বসাইয়া পূজা করেন নাই। কেননা প্রতাপ রুদ্র (১৪৯৭-১৫৪০) তখন নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। পরে নিশ্চয় তিনি সার্ব্বভৌমকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, সম্মান করিয়াছিলেন।

৬ষ্ঠ, চারিশত বৎসরের পাঠান রাজত্বের ইতিহাস হইতে জয়ানন্দ নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথাও লিখিলেন—"ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।"

জয়ানন্দের পূর্ব্বে বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবত লিখিয়াছেন। তখন ভাগবত নাম ছিল না। ছিল চৈতন্য 'মঙ্গল'। পরে নাম পরিবর্ত্তিত হয়। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

আদি খণ্ড মধ্য খণ্ড শেষ খণ্ড করি
বৃন্দাবন দাস প্রচারিলা সর্ব্বোপরি। [চৈঃ মঃ আদি খণ্ড]

বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—যে, নিমাই যখন ভূমিষ্ঠ হইল তখন সেই সদ্যোজাত শিশুকে দেখিয়া নিমাইয়ের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী বলিলেন—

"বিপ্র রাজা গৌড়ে হইবেক" হেন আছে
বিপ্র বলে সেই রাজা জানিব তা পাছে।
[চৈঃ ভাঃ আদি-৩য়]

ইহার অর্থ, এই শিশু সেই রাজা হইবে কিনা পরে জানা যাইবে।

সুতরাং গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হইবার কথা জয়ানন্দের পূর্ব্বেই বৃন্দাবন-দাস লিখিয়াছেন। জয়ানন্দ অবশ্যই ইহা পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু এই কথাটির উপর নির্ভর করিয়া, গৌড়েশ্বর ফতে সাহ নবদ্বীপের উপর যে প্রলয় কাণ্ড করিলেন,—এক জয়ানন্দ ছাড়া সে কথা আর কেহ লিখেন নাই। জয়ানন্দের কথা মিথ্যা মনে করিবার কোন কারণ নাই। সত্য বলিয়াই মনে হয়। বৃন্দাবন দাসের লেখা হইতে বুঝা যায় যে নিমাই জন্মিবার পূর্ব্বেই 'বিপ্ররাজা গৌড়ে হইবেক'—গুজবটি রটিয়াছিল। সুতরাং পিরল্যা গ্রামের যবনেরা এই গুজবটিকেই গৌড়েশ্বরের নিকট 'নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিব প্রমাদ, নিশ্চিন্তে না থাকিহ প্রমাদ হব পাছে',—নিমাই যখন শচীগর্ভে—তখন গিয়া বলিয়াছিল।

কিন্তু এই গুজবটিকে জয়ানন্দ মিথ্যাবাদ বলিয়া সমস্ত চক্রান্ত পিরল্যা গ্রামের যবনদের উপর ফেলিয়া দিলেও, ইহা রটিবার তো একটা হেতুও থাকা দরকার। বৃন্দাবনদাস লিখিত নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কথায় মনে হয়—ইহা একটি সাধারণে প্রচলিত গুজব। এবং এই সাধারণ

গুজবই পিরল্যা গ্রামের যবনেরা বিশেষ করিয়া গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে গিয়া বলিল। নিমাই তখন জন্মেন নাই, অথচ গুজবটি জন্মিয়াছে। ইহারই বা কারণ কি ?

মাত্র একশত বৎসর পূর্ব্বে ভিটুরিয়ার জমিদার রাজা গণেশ (১৩৮৫-১৩৯২) পাণ্ডুয়া দখল করিয়া, যবন রাজত্ব উৎখাত করিয়া, হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। গৌড়েশ্বর ফতে সাহ, এবং পিরল্যা গ্রামের যবনদের, হিন্দু রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটা আতঙ্ক যে একেবারেই ছিলনা—এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। আর গৌড়ে যবন রাজত্বে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর যে অত্যাচারের বর্ণনা আমরা জয়ানন্দে পাইলাম,—তাহাতে হিন্দু রাজত্ব ফিরিয়া আসুক,—গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হউক, ব্রাহ্মণ্যপ্রধান নবদ্বীপের হিন্দুদের পক্ষে এরূপ ইচ্ছা হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। অত্যাচার পীড়িত হিন্দুদের এই স্বাভাবিক ইচ্ছাই ক্রমে একটা গুজব আকারে প্রকাশ পাইয়া ছিল।

বিশেষতঃ নিমাই যখন শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে জন্মিতেছেন, আর শ্রীকৃষ্ণ অত্যাচারী কংসকে বধ করিয়া মথুরায় রাজা হইয়াছিলেন,—তখন নিমাই কেন গৌড়েশ্বরকে বধ করিয়া গৌড়ে রাজা হইবেন না ? বিনা কারণে একটা গুজব রটেনা। এবং বৃন্দাবন দাস ও জয়ানন্দ দুই জনে একসঙ্গে এই গুজবটিকে গ্রন্থ লিখিবার জন্য মিথ্যা করিয়া কল্পনা করেন নাই।

লোচন দাসও বৃন্দাবনদাসের পরে গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিতে
জগৎমোহিত যার ভাগবত গীতে। (চৈঃ মঃ, সূত্রখণ্ড)

লোচন বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থকে 'মঙ্গল' না লিখিয়া 'ভাগবত' লিখিলেন। সুতরাং বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তনের পর লোচন তাঁর গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। নিমাই ভূমিষ্ঠ হইলে পর লোচন শিশু নিমাইয়ের মধ্যে রাজা হইবার লক্ষণ সমস্ত দেখিতে পাইলেন—

মহারাজ রাজাধিক লক্ষণ বিরাজে। (চৈঃ মঃ, আদি খঃ)

বৃন্দাবনদাসও লিখিয়াছেন—

"মহারাজ লক্ষণ সকল লগ্নে কহে।"

নিমাই গৌড়ে রাজা হইবে, মুসলমান রাজত্বের অবসান ঘটাইবে—এতগুলি লেখক এমনি একটা আভাষ দিতেছেন।

গৌড়েশ্বর ফতে সাহ'র অত্যাচারে যখন 'প্রাণ ভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী', যখন বাসুদেব সর্ব্বভৌমের মত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ নবদ্বীপ ছাড়িয়া উড়িষ্যায় পলাইয়া যাইতেছেন,—এইরূপ একটা জঘন্য পরাধীনতার মধ্যে যখন হিন্দু সমাজ পতিত, শ্রীকৃষ্ণের অবতার শ্রীচৈতন্য তখন শুধু শচী গর্ভে নয়, সেই পর্য্যুদস্ত সমাজের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতেছেন। ইতিহাস চরিত গ্রন্থের এই ভয়াবহ কাহিনীকে সমর্থন করিতেছে। হিন্দুরাজাদিগকে অত্যাচার ও দমন করিবার জন্য গৌড়েশ্বর ফতে সাহর প্রধান সেনাপতি মুল্‌ক আন্দীলকে আমরা রাজধানীর বাহিরেই সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকিতে দেখি। নবদ্বীপের উপর অত্যাচার ১৪৮৫ খৃঃ একটি বিশেষ ঘটনা হইলেও, ইহা গৌড়েশ্বরের সাধারণ রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই ইতিহাসে দেখা যায়।

যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে নিমাই শচীগর্ভে আসিয়াছেন, অপর চরিত লেখক অপেক্ষা জয়ানন্দে আমরা তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাইলাম। বৃন্দাবন দাস নিমাইয়ের জন্মের সময় নবদ্বীপের যে একখানি সমাজ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা নিপুণ শিল্পী ব্যতিরেকে অপরে পারিতনা।

(এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে,
লক্ষকোটী অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়
সভে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে)
বালকেহ ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে। (চৈঃ ভাঃ আদি-২য়অঃ)

(আবেগের আতিশয্যে, লোক গণনায় কিছু অত্যুক্তি আছে। কিন্তু বৃন্দাবন দাস যে কালের বর্ণনা দিয়াছেন—সেই কালে নবদ্বীপে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতিভার, তাঁহার মণীষার, তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির এক চূড়ান্ত বিকাশ দেখাইয়াছে। নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি, নব্যতন্ত্র সংকলন—সমস্তই এই কালের ইতিহাস। রঘুমণি, রঘুনন্দন, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ—

ইঁহারা সকলেই,—শ্রীচৈতন্যের বিরাট অভ্যুদয়ের অল্প কিছু পূর্ব্বে, কেননা পরে নিশ্চয়ই নয়, এই কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার পশ্চাতে একটা ইতিহাস আছে।

চিত্রের অপরাংশে

ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।

* * * * * *

বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥ (চৈঃ ভাঃ, আদি—২য় অঃ)

তারপরে—

না বাখানে যুগ ধর্ম্ম—কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি কেহর জিহ্বায়॥
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে॥
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গলে। (চৈঃ ভাঃ, আদি—২য় অঃ)

এইত অবস্থা। সারা নবদ্বীপে কয়েকটি মাত্র কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব আছেন। তাঁহারা—

আপনা আপনি সভে করেন কীর্ত্তন,
কেহ কারো না জানেন নিজ অবতার।

শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণের অবতার না হইলে, দলের অপরে কে কোন অবতার হইবেন ঠিক হইতে পারে না। তবে সমধর্ম্মী বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে একটা বান্ধবতা স্বভাবতই ছিল।

সভে করে সভারে বান্ধব ব্যবহার।

এই সকল কৃষ্ণ ভক্তেরা—

তুই চারিদণ্ড থাকি অদ্বৈত সভায়—

যে যার বাড়ীতেই ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। তাঁহাদের—

আলাপের স্থান নাহি করেন ক্রন্দন।

ইহাদের মধ্যে—

চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে—
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈস্বরে।

নিশা হইলে! কিন্তু ইহাতেও বিঘ্ন ছিল। পাষণ্ডী ও যবনরাজ ভীতি। এ তুই উচ্চৈস্বরে হরিনামের বিরোধী। ১৫দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নবদ্বীপে উচ্চৈস্বরে হরিনাম করা নিরাপদ ছিল না।

শুনিয়া পাষণ্ডী বলে হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ॥
মহাতীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার॥
কেহ বলে এ ব্রাহ্মণে এই গ্রাম হইতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে॥
এ বামুনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবেক বল॥
এই মত বলে যত পাষণ্ডীর গণ। (চৈঃ ভাঃ, আদি—২য়-অঃ)

এই 'পাষণ্ডীগণে'র মধ্যে ব্রাহ্মণেরাও ছিলেন। কেন না, 'ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতিপ্রাণ লয়'। 'যজ্ঞসূত্র-কাঁধে দেখিলে আর রক্ষা নাই।'

আচার্য্য অদ্বৈত এই কথা শুনিলেন—

শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
দিগম্বর হই সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে বোলে॥
শুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব নয়ন-গোচর॥
সবা উদ্ধারিবে কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সবা লৈয়া॥

যবে নাহি পারেঁ। তবে এই দেহ হইতে।
প্রকাশিয়া চারি ভুজ চক্র লইমু হাতে ॥
পাষণ্ডীরে কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর, মুঞি তাঁর দাস ॥
এই মত অদ্বৈত বলেন অনুক্ষণ।
সংকল্প করিয়া পূজে কৃষ্ণের চরণ ॥ (চৈঃ ভাঃ, আদি-২য় অঃ)

জয়ানন্দে পাই যবন রাজ অত্যাচার; বৃন্দাবনদাসে পাই তার প্রতিক্রিয়া। অদ্বৈত এই প্রতিক্রিয়া।

তিনটি কথা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১ম, শ্রীঅদ্বৈত প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণবদের আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন যে 'করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব নয়ন গোচর।' কৃষ্ণের আগমনের সময় হইয়াছে, কৃষ্ণ আসিবেন, আসিতেছেন। ২য়, আর একান্তই যদি কৃষ্ণ না আসেন তবে আমিই কৃষ্ণের অবতার হইব, 'প্রকাশিয়া চারি ভুজ চক্র লইমু হাতে'; কেন না পাষণ্ডীদলন আর যবন রাজভীতি দূরীকরণ, এই দুই কার্য্যের জন্য কৃষ্ণের অবতার ও আগমন একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। ৩য়, প্রয়োজন বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে নহে; মথুরা বা কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণকেই অদ্বৈত 'অবতারিবারে' আশা করিতেছিলেন, সংকল্প করিতেছিলেন, হুঙ্কার করিতেছিলেন। ত্রিভঙ্গ মুরলীধরের হাতে বাঁশের বাঁশী তিনি চান নাই। চাহিয়াছিলেন চক্র। কংস, শিশুপালাদি বধে প্রযুক্ত, কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার্থে, এমনকি ভীষ্মবধে সমুদ্যত বিদ্যুৎবর্ষী নিয়ত ঘূর্ণায়মান চক্র। আর চাহিয়াছিলেন, যবন-রাজভীতি ও পাষণ্ডীর বিনাশ। ইহাই প্রথম সংকল্প। বৃন্দাবনদাস নিমাইয়ের কৃষ্ণের অবতার হওয়ার কারণ তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছু পূর্ব্বের সামাজিক আবেষ্টনের মধ্য হইতেই পরিষ্কার খুলিয়া দেখাইয়াছেন। অপ্রাকৃত, অলৌকিক বা অস্পষ্ট কিছুই দেখা যাইতেছে না।

নিমাইয়ের জন্মের পূর্ব্বে কৃষ্ণভক্তদের মধ্যে আচার্য্য অদ্বৈত অগ্রগণ্য। নিমাই নিজ মুখে বলিয়াছেন, 'ভারতবরষে নাহি আচার্য্য সমান' (লোচন); 'তিনি সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ',—কৃষ্ণভক্তি তিনি ব্যাখ্যা করেন। তিনি "সিংহ" নামে খ্যাত।

তুলসীর মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহা কুতূহলে॥
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে।
সে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে॥
যে প্রেমের হুঙ্কার শুনিয়া কৃষ্ণনাথ।
ভক্তিবলে আপনে সে হইলা সাক্ষাৎ॥ (চৈঃ ভাঃ, আদি—২য় অঃ)

অদ্বৈতের হুঙ্কারে নিমাই কৃষ্ণের অবতার হইয়া জন্মিতেছেন। অদ্বৈত কৃষ্ণের অবতার চান। বিনা উদ্দেশ্যে চান না। জীবের উদ্ধারের জন্য চান। জীবের উদ্ধার বড় ব্যাপক কথা। ইহা শুধু বাসুলী ছাড়িয়া কৃষ্ণ ভজা নয়, কিম্বা ইহা শুধু ধর্ম্মের বিলাসে অলস জীবের ব্যক্তিগত আয়েস বা উদ্ধারও নয়। জীবের সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্ধারও ইহার অন্তর্ভুক্ত; নতুবা এ উদ্ধার সম্পূর্ণ উদ্ধার নয়। যবনরাজভীতি সন্ত্রস্ত, পাষণ্ডী পর্য্যুদস্ত ১৬শ শতাব্দীর বাঙ্গালী বৈষ্ণব, জীবের সম্পূর্ণ উদ্ধারই চাহিয়াছিল। বৃন্দাবন দাস এই প্রসঙ্গে বুদ্ধ অবতারের সহিত কল্কি অবতারেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

বুদ্ধরূপে দয়া ধর্ম্ম করহ প্রকাশ।
কল্কিরূপে কর ম্লেচ্ছগণের বিনাশ॥ (চৈঃ ভাঃ, আদি—২য় অঃ)

জীব উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা করুণা প্রসূত। করুণা কথাটা বৌদ্ধেরাই বেশী ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। পরে বৈষ্ণবেরা 'জীবে দয়া' নাম দিয়া ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান" (চৈঃ চঃ, অন্ত্য-২০ পঃ)। ইহাই আধুনিকদের দরিদ্রনারায়ণ সেবা।

স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥

করুণা না থাকিলে জীব উদ্ধারের চিন্তা আসে না। অদ্বৈত শুধু আচার্য্য নন, শুধু সিংহ নন, তিনি করুণার অবতার, অগ্রদূত। সমস্ত লীলারই তিনি অগ্রদূত। এই জীব উদ্ধারের জন্যই কৃষ্ণ অবতারের প্রয়োজন। অদ্বৈতের বড় আশা—

মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার॥

তবে শ্রীঅদ্বৈত সিংহ আমার বড়াঞি।
বৈকুণ্ঠ-বল্লভ যদি দেখাও হেথাঞ॥ (চৈঃ ভাঃ, আদি—২য় অঃ)

কথাটা পরিষ্কার হইয়া গেল। প্রথম কথা চাই জীব উদ্ধার। দ্বিতীয় কথা চাই তার জন্য দ্বাপরের কৃষ্ণের মত একজন শক্তিশালী লোক। নিমাইয়ের জন্মের পূর্ব্বে নবদ্বীপ বৈষ্ণব সমাজে এমনি একটা গুরুতর প্রস্তাবনা চলিতেছিল। সেই প্রস্তাবনার নেতৃত্ব করিতেছেন বৈষ্ণবাগ্রগণ্য আচার্য্য অদ্বৈত। যিনি "সিংহ" নামে খ্যাত।

শুধু অদ্বৈত নহেন, যবন হরিদাসও এই সময় কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করিবার জন্য গোঁফায় বসিয়া নাম সংকীর্ত্তন করিতেছেন। অদ্বৈত ও হরিদাস, একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান, ইহারা দুইজনে একত্রে কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। হরিদাসের চেষ্টাকে উপেক্ষা করিলে অপরাধ করা হইবে। কবিরাজ গোস্বামী হরিদাসের চেষ্টাকে অদ্বৈতের চেষ্টার সহিত সমান ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

কৃষ্ণ অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিল।
জল তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল॥
হরিদাস করে গোঁফায় নাম সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন এই তার মন॥
দুই জনের ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার।
(চৈঃ চঃ, অন্ত্য, ৩য় পঃ)

দুইজনের ভক্তিতে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণের অবতার হইলেন। নিমাই অবতার হওয়ার পূর্ব্বেই আমরা যবন হরিদাসকে গোঁফায় বসিয়া নাম সংকীর্ত্তন করিতে দেখিতেছি। যবন হরিদাস অদ্বৈতের মতই একজন প্রাক্-চৈতন্য কৃষ্ণ-ভক্ত বৈষ্ণব। তিনি আচার্য্য অদ্বৈতের একান্ত অনুগত।

নিমাইয়ের জন্মের পূর্ব্বে নবদ্বীপে যে বৈষ্ণব আবেষ্টনটি আমরা দেখিতেছি, তাঁহারা অধিকাংশই নবদ্বীপের লোক নহেন। যিনি নেতা, সেই অদ্বৈত সিংহও—নবদ্বীপ অধিবাসী নহেন। তিনি শান্তিপুরের লোক। তিনিও পূর্ব্বে শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। তাঁহারা শ্রীহট্ট হইতে শান্তিপুরে আসিয়াছেন।

বৃন্দাবনদাস এই সকল প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণবদের আদি বাসস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন,—

কারো জন্ম নবদ্বীপে কারো চাটীগ্রামে।
কেহ রাঢ়ে উড্রদেশে, শ্রীহট্টে পশ্চিমে ॥
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি হইল সবার মিলন ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য পূজিত ॥
ভবরোগ নাশে বৈদ্য মুরারি নাম যার।
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি সবার প্রধান।
চৈতন্য-বল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম ॥
চাটীগ্রামে হইল তা সবার পরকাশ।
বুঢ়ণে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস ॥
রাঢ় মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
যহি অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান ॥
ত্রিহোতে পরমানন্দ পুরীর প্রকাশ।
নীলাচলে যার সঙ্গে একত্র বিলাস ॥

(চৈঃ ভাঃ, আদি—২য় পঃ)

ইহাদের নবদ্বীপ আসিয়া একত্র হইবার কারণ বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন,—

নবদ্বীপে হইবে প্রভুর অবতার
অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার।

ইহারা কেহই মানুষ নহেন। সকলেই দ্বাপরের কৃষ্ণলীলার অবতার। প্রভুর আজ্ঞায় সকলেই পূর্ব্ব হইতে মানুষের ভিতর জন্মিয়াছেন মাত্র।

প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্ব্ব পরিকরে
জন্ম লভিলেন সভে মানুষ ভিতরে। (চৈঃ ভাঃ, আদি—২য় অঃ)

তারপরে প্রশ্ন—

গঙ্গাতীর পুণ্যস্থান সকল থাকিতে।
বৈষ্ণব জন্ময়ে কেন অশোচ্য দেশেতে॥
আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদ জন্মায়েন দূরে দূরে॥
যে যে দেশ গঙ্গা হরিনাম বিবর্জ্জিত।
যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিত॥
(চৈঃ ভাঃ, আদি—২য় পঃ)

(উত্তর বেশী কঠিন হইবেন।—
সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য অবতার।)

সুতরাং—

শোচ্য দেশে শোচ্য কুলে আপন সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সবারে করে ত্রাণ॥

অন্ততঃ ইহা বুঝা গেল যে নবদ্বীপের কুলীন ব্রাহ্মণদের উদ্ধারের জন্য তিনি অবতীর্ণ হ'ন নাই। শোচ্য দেশের ও শোচ্য কুলের লোকদের উদ্ধারের জন্যই তাঁহার আগমন। সে আগমন নিষ্ফল হয় নাই।

শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের বাঙ্গালেরাই নিমাইয়ের জন্মের পূর্ব্বে, নবদ্বীপে প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণব আবেষ্টনটি গড়িয়া তুলিয়াছিল—পরিপুষ্ট করিয়াছিল। এই আবেষ্টনটি লইয়াই নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যলীলার সূত্রপাত।

এখন দেখা যাক—শ্রীচৈতন্যদেব নিজে কোন দেশের লোক? জয়ানন্দ লিখিয়াছেন,

শ্রীহট্টদেশের মধ্যে জয়পুর গ্রাম।
পূর্ব্বে সরস্বতী উত্তরদিকেতে গোমতী॥
পশ্চিমে ঢোলসমুদ্র দক্ষিণে করাতি।
জয়পুরে শত শত ব্রাহ্মণের ঘর॥
দিগ্বিজয়ী নিজ দর্শন ব্যাখ্যা চতুর্ম্মুখ॥
হেন বংশে জগন্নাথ মিশ্রের উৎপত্তি।
শচী বিভা দিল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী॥ (চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)

শ্রীহট্টদেশের জয়পুর গ্রামেই শ্রীচৈতন্যদেবের পিতা ও মাতার বিবাহ

হইল। বিবাহের পর তাঁহারা নবদ্বীপ আসিলেন। কিন্তু ইহাতে মতান্তর আছে।

শ্রীহট্টনিবাসী প্রদ্যুম্ন মিশ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী—সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"জগন্নাথ মিশ্র দেশে (শ্রীহট্টে) ব্যাকরণাদি শেষ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে জগন্নাথ মিশ্র নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেন।"

সুতরাং শ্রীচৈতন্যের পিতামাতার বিবাহ শ্রীহট্টে হইল (জয়ানন্দ) অথবা নবদ্বীপে হইল (প্রদ্যুম্ন মিশ্র) তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এই দুই বিভিন্ন মতের পরিপোষক আরো প্রমাণ না পাওয়া গেলে—ইহার কোন একটি মতকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

তারপরে জয়ানন্দ বলেন যে শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বপুরুষেরা উড়িষ্যাবাসী ছিলেন। এত সঠিকরূপে একথা আর কোন চরিত-লেখক বলেন না। এই সব ঐতিহাসিক তত্ত্ব জানিবার এমন একটা সুযোগ জয়ানন্দের হইয়াছিল, যাহা অপর চরিত-লেখকদের হয় নাই। কেননা মিথ্যা কল্পনা করিয়া এ সব কথা লিখিবার কোনই হেতু নাই।

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

> চৈতন্য গোসাঞির পূর্ব্বপুরুষ, আছিল যাজপুরে।
> শ্রীহট্টদেশেরে পালায়া গেলা রাজা ভ্রমরের ডরে॥
> সেই বংশে পরম বৈষ্ণব কমললোচন তাঁর নাম।
> পূর্ব্বজন্মের তপে গোসাঞি তাঁর ঘরে করিল বিশ্রাম॥
>
> (চৈঃ মঃ, উৎকল খণ্ড)

সুতরাং—

"চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ উৎকলের যাজপুরে বাস করিতেন। রাজা ভ্রমরের ভয়ে সেই স্থান হইতে তাঁহারা শ্রীহট্টদেশে পলায়ন করেন।" ভ্রমর উপাধি, রাজার প্রকৃত নাম কপিলেন্দ্রদেব। তিনি উড়িষ্যাকে স্বাধীন হিন্দু রাজ্য ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহা ১৫দশ শতাব্দীর কথা। (যে ইতিহাস শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে,—সেই লীলার অগ্রদূত শ্রীহট্টের আচার্য্য অদ্বৈত,—সেই লীলার কেন্দ্র শ্রীহট্টের শ্রীবাসের বাড়ীতে,—সেই লীলার প্রধান নেতা

শ্রীহট্টবাসীর সন্তান শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত—বৈষ্ণব আন্দোলনই যে ১৬শ শতাব্দীর নবদ্বীপে শ্রীহট্টবাসীর নেতৃত্বে হইয়াছে, এমন নয়। নব্যন্যায় উদ্ভাবনকারী রঘুনাথ শিরোমণির পিতা, পিতামহও শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপ আসিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের মতে, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী দেশের সম্ভবতঃ ময়মনসিংহ জেলার লোক। সুতরাং এক বৃহৎ তন্ত্রসার প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ব্যতিরেকে ১৬শ শতাব্দীর নবদ্বীপে বাঙ্গালী সভ্যতার তিন তিনটি বিশেষ বিভাগ,—নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি, বৈষ্ণবধর্ম্ম,—তিন তিনটি বাঙ্গাল ব্রাহ্মণের মণীষা প্রসূত। এই কালের বাঙ্গালী সভ্যতার নব কলেবর হইয়াছিল নবদ্বীপের মাটিতে। কিন্তু এই নব কলেবর গড়িয়া তুলিয়াছিল যে সকল কারিগর, তাঁহারা নবদ্বীপে সমাগত বাহিরের বাঙ্গাল দেশের লোক। ইতিহাস আলোচনায় ইহাই দেখা যায়।

চন্দ্র গ্রহণের সময় যখন সমস্ত নবদ্বীপ সংকীর্ত্তন মুখরিত, সেই সময় নিমাই শচীগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। জন্ম-তারিখ ১৪৮৬।১৯শে ফেব্রুয়ারী। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইল প্রকাশ।
চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর ইচ্ছায়॥
হেনই সময়ে সর্ব্ব জগত জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচী নন্দন॥ (চৈঃ ভাঃ, আদি—২য় অঃ)

ফাল্গুনের তারিখ ১৯ হইতে ২৭—গণনায় মতান্তর আছে। নিমাইয়ের মাতামহ সদ্যোজাত শিশুকে দেখিতে আসিলেন। তিনি জন্মের লগ্ন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

মহারাজ লক্ষণ সকল লগ্নে কহে।
বিপ্র রাজা গৌড়ে হইবেক হেন আছে।
বিপ্র বলে সেই রাজা জানিব তা পাছে॥
(চৈঃ ভাঃ, আদি—২য়-প)

আর একজন ব্রাহ্মণ শিশুকে দেখিয়া বলিলেন—

অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও এ শিশুর ভজিবে চরণ॥ (চৈঃ ভাঃ আদি—৩য় প)

এই শিশু গৌড়ে রাজা হইবে এবং মুসলমানেরাও এই শিশুকে ভজনা করিবে এই দুইটি বড় সহজ কথা নয়। তৎকালের হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ হইতেই হিন্দু সমাজের মনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে এই দুইটী কথাই সেই সমাজ মনের ইচ্ছা প্রসূত। সমাজ মনে যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছিল এ কথা দুইটি তাহারই প্রকাশ। জয়ানন্দ লিখিতেছেন—

ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি প্রবেশ করিল।
প্রসব সময় জানি আইলা নারায়ণী॥
শচী ঠাকুরাণী গৌরচন্দ্রে প্রসবিল।
নাড়ীচ্ছেদ করি ধাত্রীমাতা কৈল কোলে॥

(চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)

জয়ানন্দ নিজেই ভবিষ্যত বাণী করিতেছেন যে—

আচণ্ডাল আদি যত হইব নিস্তার। (চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)

ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের ভেদটা বড় বেশী প্রকট হইয়াছে। রঘুনন্দন অষ্ট-বিংশতি তত্ত্বে, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের ভেদে অস্পৃশ্যতার দরুণ মিলনের কোন সেতুই রাখেন নাই। রঘুনন্দনের এই সঙ্কোচন নীতির প্রতিক্রিয়া আমরা শ্রীচৈতন্যের আচণ্ডাল উদ্ধারে দেখিতে পাইব। জয়ানন্দ নিজে রঘুনন্দনের বংশের ব্রাহ্মণ। কিন্তু রঘুনন্দনদের শ্রীচৈতন্যে কোনই ভক্তি ছিল না। সুতরাং জয়ানন্দ তাঁহাদিগকে অক্লেশে পাষণ্ডী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

"খুড়া জ্যাঠা পাষণ্ডী চৈতন্যে অল্পভক্তি।" জয়ানন্দের কথায় রঘুনন্দনকে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বলিতে হয়।

এই শিশুর দ্বারা আচণ্ডাল উদ্ধার হইবে। শ্রীবাসের বাড়ী অভিষেকের সময় অদ্বৈত লীলার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় আচণ্ডাল উদ্ধারের কথাই যুবক নিমাইকে দিয়া অঙ্গীকার করাইয়া লইয়াছিলেন। কৃষ্ণের অবতার যুবক নিমাই অদ্বৈতকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"সত্য যে তোমার অঙ্গীকার"। সুতরাং জয়ানন্দে এই শিশু হইতে আচণ্ডাল উদ্ধার হইবে, একথার ইঙ্গিত তৎকালের সামাজিক সমস্যা পূরণের এক অতি গুরুতর কথা। বৃন্দাবনদাস বলিলেন যে বিষ্ণুদ্রোহী যবন এই

শিশুকে ভজনা করিবে। জয়ানন্দ বলিলেন—এই শিশু আচণ্ডাল আদি যত উদ্ধার করিবে।

তারপরে লোচনদাস। তিনি লিখিয়াছেন যে বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণ নারদকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, ব্রহ্মা, শিব ইহাদিগকে বল গিয়া —আমি নবদ্বীপে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইব এবং আগে হইতেই তাঁহারাও যেন গিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। নারদ ব্রহ্মা ও শিবকে বলিল এবং তাঁহারাও নির্দ্ধারিত রূপে আসিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেন। শিব আসিয়া অদ্বৈত হইলেন, ব্রহ্মা আসিয়া হরিদাস হইলেন; বলরাম হইলেন নিত্যানন্দ, কৃষ্ণ হইলেন শ্রীচৈতন্যদেব, রাধিকা হইল গদাধর।

দ্বারকার যত ছিল আর যদুবংশে
পৃথিবী জনম লৈল নিজ নিজ অংশে। (চৈঃ মঃ, সূত্রখণ্ড)

বৃন্দাবনদাসের মত লোচনও লীলার সহচরদিগকে আগেই মহাপ্রভুর আজ্ঞায় জন্ম দিলেন।

হেনমতে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈলা।
নিজ নিজ অংশে সবে জন্মিতে লাগিলা॥ (চৈঃ মঃ, সূত্রখণ্ড)

ইহা পৌরাণিক অবতার, ঈশ্বর আসিয়া মানুষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। বৈদান্তিক অবতারে এরূপটি হয় না। মানুষ নিজেকে ব্রহ্ম জানিয়া ক্রমে ব্রহ্ম হইয়া যান। 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'।

লোচন আচার্য্য অদ্বৈতকে দিয়া শচীগর্ভকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করাইলেন। ইহা অপর কোন চরিতলেখক করেন নাই।

শচী প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম।
চমকিত শচীদেবী দেখি অবিধান॥ (চৈঃ মঃ, আদি খঃ)

বৃন্দাবনদাসের মত লোচনও পার্ষদগণের জন্মের ও নামের একটা ফর্দ্দ দিলেন। কিন্তু অনাবশ্যক মনে করিয়া কে কোথায় জন্মিলেন তাহা বলেন নাই।

লোচন বলেন, শচীগর্ভে নিমাই দশ মাস ছিলেন। "দশ মাস পূর্ণগর্ভ ভেল দিশে দিশে"। তারপর 'পৌর্ণমাসী তিথি'—

ফাল্গুন শোভন নিশি হিমকর জ্যোতি,
চন্দ্রমা গ্রাহয়ে রাহু—(পাঠান্তরে, রাহু চন্দ্র গরাসয়ে)
প্রভু শুভজন্ম, পৃথিবীতে হেনকালে। (চৈঃ মঃ, আদি খঃ)

জন্মমাত্রই লোচন শিশু চৈতন্যের রূপ বর্ণনা করিতেছেন—

উন্নত নাসিকা তিল কুসুম জিনিঞা।
ঝলমল গোরা অঙ্গ কিরণ অমিঞা॥
অধর অরুণ আর চারু গণ্ডজ্যোতি।
সুন্দর শ্রীবুক দেখি উঠয়ে পিরিতি॥
সিংহ গ্রীবা গজস্কন্ধ বিশাল হৃদয়।
আজানুলম্বিত ভুজ তনু রসময়॥
বিশাল নিতম্ব উরু কদলীর যেন।
অরুণ কমলদল দুখানি চরণ॥
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ সে পঙ্কজ পদতলে। (চৈঃ মঃ, আদি খঃ)

কবিরাজ গোস্বামী যুবক চৈতন্যের বর্ণনায় (চৈঃ চঃ, আদি—৩য় পঃ) লিখিয়াছেন, "সিংহগ্রীব" "আজানুলম্বিত ভুজ",—"তিলফুল জিনি নাসা"। লোচনের বর্ণনার সহিত এই আক্ষরিক মিল সম্ভব হইল কিরূপে? ইহা প্রচলিত সাধারণ উপমা। তথাপি আরো বহু স্থানে লোচনের সহিত কবিরাজ গোস্বামীর আক্ষরিক মিল সন্দেহের সৃষ্টি করে। লোচনের বর্ণনা সবই সত্য। সকল গ্রন্থেই আছে, চৈতন্যদেবের রূপের তুলনা নাই। অতুলন বিশ্ববিমোহন। কিন্তু একদিনের শিশুর এই রূপবর্ণনা লোচনের পক্ষে অবিবেচনার কাজ হইয়াছে। যুবক চৈতন্যের রূপ ও রসমূর্ত্তি তিনি একদিনের শিশুতে আরোপ করিয়া লিখিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী তাহা করেন নাই।

চৈতন্য জন্মিয়াছেন। সকলেই দেখিতেছে।

দেখিতে দেখিতে সভার যুড়াল নয়ান
সভার মনে হইল এই নাগরীর প্রাণ॥ (চৈঃ মঃ, আদি খঃ)

নারীগণ অনুমান করিলেন যে, বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া জন্মিয়াছেন। তাঁহাদের—

আলসল অঙ্গ সভার শ্লথ নীবিবন্ধ। (চৈঃ মঃ, আদি খঃ)

নিতান্ত অসঙ্গত কল্পনা। আঁতুড় ঘরে একদিনের শিশু দেখিয়া এ ভাব যদি সেদিন নদীয়া নাগরীদের প্রাণে উদয় হইয়া থাকে, তবে যাহারা দেখিতে আসিয়াছিলেন তাহারা সাধারণ এবং সুস্থ ব্যক্তি ছিলেন না। যেখানে বাৎসল্য স্বাভাবিক সেখানে আদিরসের অবতারণায় রসাভাষ হইয়াছে। লোচন নাগরালী ভাবের প্রচারক আদি রসের কবি।

লোচন কিন্তু আর একটী কথাও বলিলেন, যাহা বৃন্দাবনদাস ও জয়ানন্দ বলিয়াছেন। "মহারাজ রাজাধিপ লক্ষণ বিরাজে।"

লোচন দর্শকদের দিয়া শিশু চৈতন্যের পায়ে "ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ সে পঙ্কজ পদতলে" দেখাইয়া দিলেন।

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন যে, "চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘ মাসে"—নিমাই শচীগর্ভে আসিলেন।

হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রে হৈল ত্রাস॥ (চৈঃ চঃ, আদি, ১৩ পঃ)

লোচন গর্ভে বাস ১০ মাস লিখিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী বলেন ১৩ মাস।

তারপর—

চৌদ্দশত সাত শকে মাস ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব শুভক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌড়চন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন॥
এত জানি চন্দ্রে রাহু করিল গ্রহণ। (চৈঃ চঃ, আদি, ১৩ পঃ)

প্রভু ভূমিষ্ঠ হইলেন।

প্রসন্ন হইল সব জগতের মন।
হরি বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন॥ (চৈঃ চঃ আদি, ১৩ পঃ)

এ হাসির অর্থ কি? ইহার অর্থ বৃন্দাবনদাস পূর্ব্বেই দিয়া গিয়াছেন—

অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও এ শিশুর ভজিবে চরণ ॥ (চৈঃ ভাঃ, আদি, ৩য় পঃ)

কবিরাজ গোস্বামী এখানে স্পষ্টই বৃন্দাবনদাসকে অনুসরণ করিয়াছেন। আরও একটা অর্থ করা যায়। হিন্দু যবনকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করে, এখন শ্রীচৈতন্যলীলায় হিন্দু যবনকে আর অস্পৃশ্য জ্ঞান করিবে না। সুতরাং যবন শ্রীচৈতন্য ভূমিষ্ঠ হইবার পর হিন্দুকে দেখিয়া হাস্য করিল।

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী "বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ ভূষণ"—"মহাপুরুষের চিহ্ন" শিশুর অঙ্গে দেখিয়া উহা সকলকে বলিলেন। "ধ্বজ বজ্র শঙ্খ চক্র মীন" পদতলে এ সমস্ত চিহ্নও দেখা গেল। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণের অবতার বলিলেন না, বলিলেন মহাপুরুষ লক্ষণ।

বৃন্দাবনদাসকে অনুসরণ করিয়া কবিরাজ গোস্বামীও পার্ষদগণকে আগে অবতীর্ণ করিয়া—"শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার" বলিলেন।

কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়
অবতীর্ণ হৈল কৃষ্ণ নিজে নদীয়ায়। (চৈঃ চঃ, আদি, ৩য় পঃ)

শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য হইয়া জন্মিলেন।

সকল চরিত-লেখকই আগে অবতারের বিশেষত্ব ও লীলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন।

বৃন্দাবনদাস বলেন যে—

কোন হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।
কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাহার ॥
(চৈঃ ভাঃ, আদি, ২য় অঃ)

আধুনিকেরাও বৃন্দাবনদাসের কথারই প্রতিধ্বনি করেন। অবতার পুরুষের আবির্ভাবের কারণ আমরা জানিতে পারি না। যে সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে অবতার পুরুষের আবির্ভাব হয়, সেই সামাজিক আবেষ্টন তাঁহার আবির্ভাবের একমাত্র কারণ, ইহা বলা অতিশয় দুঃসাহসের কার্য্য। হেতু বা কারণ সম্পর্কে দুজ্ঞেয়তা বা অজ্ঞেয়তা বৃন্দাবনদাস প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তথাপি শ্রীভাগবত ও গীতার অভিমত প্রতিধ্বনি করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

(ধর্ম্ম পরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্ম্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে॥
সাধুজন-রক্ষা দুষ্ট-বিনাশ কারণে।
*　　　*　　　*
তবে প্রভু যুগ-ধর্ম্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে॥
কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরি সংকীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥
কীর্ত্তন নিমিত্ত গৌড়চন্দ্র অবতার॥)

(চৈঃ ভাঃ, আদি খণ্ড, ২য় অঃ)

বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্য ও শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে একসঙ্গে বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন, ইহারা দুইজনেই "সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক, যুগধর্ম্মপালক ও করুণাবতার"। করুণার মধ্যে বৌদ্ধদের প্রভাব রহিয়াছে ; আর দুষ্ট বিনাশের মধ্যে গীতার প্রভাব রহিয়াছে। বৃন্দাবনদাস মৎস, কুর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল অবতারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই অবতারের ধারায় বিশেষ করিয়া, কৃষ্ণের অবতার রূপে, শ্রীচৈতন্যকে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য সর্ব্বঅবতার হইলেও বিশেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অবতার।

বৃন্দাবনদাস স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন যে, শ্রীচৈতন্য যে যুগে জন্মিয়াছেন সেই যুগধর্ম্মের তিনি পালক ; অতএব তিনি যুগ অবতার।

এক্ষণে প্রশ্ন শ্রীচৈতন্যের সময়ে যুগধর্ম্ম কি? বৃন্দাবনদাস ইহা অদ্বৈতের প্রতি শ্রীচৈতন্যের বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

(অদ্বৈত বলয়ে যদি ভক্তি বিলাইবা
স্ত্রীশূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা।
আচণ্ডাল নাচুক তোর নামগুণ গাইয়া॥
প্রভু বলে সত্য যে তোমার অঙ্গীকার। (চৈঃ ভাঃ, মধ্য-৬ষ্ঠ পঃ)

যবন হরিদাসের প্রতি শ্রীচৈতন্যের বাক্যেও যুগধর্ম্ম প্রকাশ পাইয়াছে। হরিদাসকে মহাপ্রভু বলিতেছেন—

এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি সেই জাতি মোর দড়॥

যেবা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে।
শীঘ্র আইনু তোর দুঃখ না পারোঁ সহিতে॥
(চৈঃ ভাঃ, মধ্য-১০ম পঃ)

মুসলমান হইয়া বৈষ্ণব হওয়াতে যবনরাজ বাইশ বাজারে হরিদাসকে বেত্রাঘাত করিয়াছিল। শীঘ্র অবতীর্ণ হইবার ইহা যে একটি বিশেষ কারণ—তাহাই বৃন্দাবনদাস বলিলেন।

অদ্বৈত চৈতন্য চরণ গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ দিয়া পূজা করিয়া বলিলেন—

যেন তুমি শাস্ত্রে সব জিনিলে সংসার।
তেন কৃষ্ণ ভজ, কর পাষণ্ডী সংহার॥ (চৈঃ ভাঃ, মধ্য-২য় পঃ)

সুতরাং পাষণ্ডী সংহার এই যুগধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। প্রভু বলিলেন—

কোন ছার হয় পাপ পাষণ্ডীর গুণ।
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর॥
সংহারিমু বলি সব করয়ে হুঙ্কার।
মুই সেই মুই সেই বোলে বার বার॥
ক্ষণে বলে ছিণ্ড ছিণ্ড পাষণ্ডীর মাথা। (চৈঃ ভাঃ, মধ্য-২য় পঃ)

"খণ্ড খণ্ড", "কাটিমু সভারে" "ছিণ্ড ছিণ্ড"—লীলার সূত্রপাতে সকল চরিতগ্রন্থেই এই শব্দ শুনিতে পাই।

শ্রীবাসকে ধরিবার জন্য রাজার নৌকা আসিতেছে, ইহা শুনিয়া শ্রীবাসের বাড়ীতে গিয়া প্রভু বলিলেন—

ওহে শ্রীনিবাস কিছু মনে ভয় পাও।
শুনি তোমা ধরিতে আইসে রাজ নাও॥ (চৈঃ ভাঃ, মধ্য-২য় পঃ)

প্রভু বলিলেন, যদি নৌকা সত্যই আসে—

\মুই সর্ব্ব আগে গিয়া নৌকায় চড়িমু।/

সুতরাং যবনরাজভীতি দূরীকরণ এই যুগধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত।

আমরা দেখিব যে, চাঁদ কাজীর বাড়ী আক্রমণ ও লুণ্ঠনও সেই একই কারণে এই যুগধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত।

বৃন্দাবনদাস শ্রীপাদ নিত্যানন্দের আজ্ঞায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন, সুতরাং তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ নিত্যানন্দ প্রভুর অনুমোদিত।

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

এথা কলিযুগে বড় হৈল অনাচার।
পৃথিবী কান্দিয়া গেল ব্রহ্মার তুয়ার ॥
(চৈঃ মঃ, আদি-যুগধর্ম্ম ও অবতার প্রসঙ্গ)

পৃথিবীর ব্রহ্মার তুয়ারে কান্দিয়া যাইবার যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছে। অনাচারের একটী দীর্ঘ তালিকা জয়ানন্দ দিয়াছেন—

স্ত্রী হইয়া স্বামীর বচন নাহি ধরে।
বৃক্ষ লতা ফল হরে রাজা ম্লেচ্ছ জাতি ॥
মৎস্য মাংসে প্রিয় হইল বিধবা যুবতী।
রাজা নাহি পালে প্রজা ম্লেচ্ছের আচার ॥
তুই তিন চারি বর্ণে হৈল একাকার।
দেবতা ব্রাহ্মণে হিংসা করে ম্লেচ্ছজাতি ॥
ক্ষেত্রী যুদ্ধে শক্তিহীন, নাহি যতি সতী (চৈঃ মঃ, আদি খঃ)

সেই সতীদাহের দিনে বিধবা যুবতীদের নিকট মৎস্য, মাংস যদি সত্যই প্রিয় হইয়া থাকে তবে বিধবাদের পক্ষে ইহা অতিশয় তুঃসাহসের কার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনটী কথা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। (১ম) রাজা প্রজা পালন করেন না; রাজা ম্লেচ্ছ জাতি; এই ম্লেচ্ছ জাতি দেবতা ব্রাহ্মণকে হিংসা করে। (২য়) ক্ষত্রিয়েরা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারিতেছে না। তাহারা শক্তিহীন হইয়াছে। (৩য়) চারিবর্ণ বিভাগ যে ছিল, তাহা নাই। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে স্বীকার করা হয় নাই। এই তুই বর্ণ লুপ্ত। কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র আছে। জয়ানন্দ "খুড়া-জ্যাঠার" কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। সুতরাং বৃন্দাবনদাসের কথাই—"ধর্ম্মের পরাভব হইয়াছে," "অধর্ম্মের প্রবলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে,"—জয়ানন্দ সমর্থন করিলেন। অবতারের আবির্ভাবের কারণ জয়ানন্দ যাহা দিলেন তাহা সম্পূর্ণ বৃন্দাবনদাসের অনুগামী। "আচণ্ডাল আদি যত হইব নিস্তার"—একথাও জয়ানন্দ বহু স্থানে বলিয়াছেন। তারপর বৃন্দাবনদাসের মতকেই সমর্থন করিয়া জয়ানন্দ গৌরাঙ্গকে যুগাবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

যুগাবতারে যত করিলা গৌরাঙ্গ। (চৈঃ মঃ, আদি খঃ)

*　　*　　*　　*

যুগধর্ম্ম পালন কীর্ত্তন দেশে দেশে। (চৈঃ মঃ, নদীয়া খঃ)

গদাধর পণ্ডিতের আজ্ঞাতে জয়ানন্দ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সুতরাং জয়ানন্দের ব্যাখ্যা গদাধর পণ্ডিতের সম্পূর্ণ অনুমোদিত।

বৃন্দাবনদাস ও জয়ানন্দ উভয়েই 'যুগাবতার' কথাটীর উপর জোর দিতেছেন। উভয়েই একমত, সুতরাং বুঝিতে হইবে—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও গদাধর পণ্ডিত ইঁহারা উভয়েই, শ্রীচৈতন্য যে যুগাবতার এ সম্পর্কে একমত। কেননা বৃন্দাবনদাস যেমন নিত্যানন্দ আজ্ঞাবলে গ্রন্থ লিখিয়াছেন—জয়ানন্দও সেইরূপ গদাধরের আজ্ঞামতে গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

লোচনদাস বলিলেন—উকি কথা! শ্রীচৈতন্যকে ত 'যুগাবতার' বলা চলিবে না। দ্বাপরে ও কলিতে একই অবতার; কৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য হইয়া জন্মিয়াছেন। কৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম, সুতরাং শ্রীচৈতন্যও তাই। যুগাবতার ত অংশ অবতার, সুতরাং শ্রীচৈতন্য অংশ অবতার হইতে পারেন না। বিরোধ দেখা দিল। আর বিরোধ দেখা দিলেই ক্রমে সমন্বয়ও আসিবে।

লোচন বলেন—

যুগ অবতার কৃষ্ণ এ বড় অশক্য।
যুগ অবতার কৃষ্ণ কহিব কেমতে॥
বৃন্দাবনচন্দ্র যুগ-অবতার নহে।
পূর্ণ পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ ভাগবতে কহে॥
যেনই দ্বাপরে কৃষ্ণ তেন গৌরচন্দ্র।
এই দুই যুগে এক পূর্ণ অবতার॥ (চৈঃ মঃ, সূত্র খঃ)

লোচনের কোনই সন্দেহ নাই যে, শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য হইয়া জন্মিয়াছেন।

কলিযুগের গোরা কৃষ্ণ জানিয়াছি আমি। (চৈঃ মঃ, সূত্র খঃ)

লোচন এক্ষেত্রে বৃন্দাবনদাস ও জয়ানন্দের প্রতিবাদ করিলেন। প্রতিবাদ করিয়াও তিনি শ্রীচৈতন্যের অংশ অবতার অর্থাৎ যুগাবতার অস্বীকার তো করিলেনই না, সম্পূর্ণ স্বীকার করিলেন। পূর্ণের ভিতর অংশ বিরোধ না করিয়া অনায়াসেই থাকিতে পারে। এক এক যুগে এক এক রকমের সমস্যা দেখা দেয়। প্রত্যেক যুগের সমস্যাকে সম্পূরণ করিবার জন্য যিনি অবতীর্ণ হন তিনি যুগাবতার। যে যুগ-সমস্যা সম্পূরণ

করিবার জন্য বৃন্দাবনদাস ও জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যকে অবতীর্ণ করাইয়াছেন সে যুগ-সমস্যা লোচন উপেক্ষা করেন নাই। সূত্রখণ্ডের প্রারম্ভেই "পাষণ্ডান্ পরিচুর্ণয়ান্" বলিয়া লোচন শ্রীচৈতন্যকে স্তবস্তুতি করিয়াছেন। আর আচার্য্য অদ্বৈতের মুখে বৃন্দাবনদাস এই পাষণ্ডী সংহারের জন্য অবতারের প্রয়োজন স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন—

কৃষ্ণনাম না শুনিল সংসার ভ্রমিয়া।
কৃষ্ণহীন জীব দেখি এই মোর শোক॥
লোকের নিস্তার হেতু না দেখি উপায়। (চৈঃ মঃ, সূত্র খণ্ড)

এ সকল কথা বৃন্দাবনদাসের প্রতিধ্বনি। সংকীর্ত্তনের কথাও আছে—

সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম বই—ধর্ম্ম নাহি আর।
কেনে বা কীর্ত্তনে লুঠে গায় মাখে রেণু।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন প্রকট করিব। (চৈঃ মঃ, সূত্র খণ্ড)

বৃন্দাবনদাসে যুগাবতার শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন—"সঙ্কীর্ত্তন প্রারম্ভে মোহার অবতার"। তবে যে তেজ, যে হুঙ্কার বৃন্দাবনদাসে আছে, লোচনে তাহা নাই। লোচন ইহার কারণ দিয়াছেন। পূর্ব্ব অবতারে অসুর বধের জন্য খড়্গ, তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রয়োগ প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য অবতারে কোন বিশেষ অসুর বধ উদ্দেশ্য নয়। মানুষের অন্তরে যে আসুরী ভাব আছে তাহাকেই বিনাশ করিতে হইবে।

এবে সেই সর্ব্বজন হৃদয় আসুরী।
এবে নাম সংকীর্ত্তন খড়্গ তীক্ষ্ণ লঞা॥
অন্তর আসুর জীবের ফেলিব কাটিয়া। (চৈঃ মঃ, সূত্র খণ্ড)

সুতরাং এ অবতারে—

লোক বুঝাবারে প্রভু হইবে মহাদীন।
দীন ভাব প্রকাশ করিব কলিযুগে। (চৈঃ মঃ, সূত্র খণ্ড)

লোচন যুগ-অবতারের কথা আরও বিশদ করিয়া বলিতেছেন—

এই প্রভু প্রতি যুগে যুগে অবতার।
যে যুগে যে যুগ-ধর্ম্ম করয়ে প্রচার॥
প্রতি যুগে অবতার অংশেতে জনম। (চৈঃ মঃ, সূত্র খণ্ড)

কিন্তু বৃন্দাবনদাস এবং জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যকে যুগাবতার বলিলেও তাঁহাকে তো অংশ অবতার বলেন নাই। কৃষ্ণের অবতারই বলিয়াছেন এবং কৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়াছেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্য তাঁহাদের মতে অংশও নন, অপূর্ণও নন।

লোচন বলেন—

যে প্রেম যাচয়ে শিব, বিরিঞ্চি অনন্ত।
তাহা বিলসিব কলি অধম দুরন্ত॥ (চৈঃ মঃ, সূত্র খণ্ড)

ইহা বৃন্দাবনদাসের প্রতিধ্বনি। বৃন্দাবনদাসে প্রভু বলিতেছেন—

ব্রহ্মা শিব নারদাদি যারে তপ করে।
হেন ভক্তি বিলাইমু বলিনু তোমারে॥ (চৈঃ ভাঃ, মধ্য-৬ষ্ঠ)

এখন লোচনের অংশ অবতার ছাড়িয়া দিয়া পূর্ণ অবতারের কথায় আসা যাক্। লোচন বলেন শ্রীচৈতন্য যেখানে পূর্ণ অবতার সেখানে প্রভু বলিতেছেন—

বৃন্দাবন ধন প্রকাশিব কলিযুগে।
ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ ভুঞ্জাইব লোকে॥
নিজ প্রেমা বিলসিব হেন লয় চিতে।
নিজ প্রেমা বিলাসিব প্রতিজ্ঞা করিল॥ (চৈঃ মঃ, সূত্র খণ্ড)

কবিরাজ গোস্বামী রায় রামানন্দের মুখে প্রভুকে বলিয়াছেন ;—

নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার।
নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন॥
আনু সঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন। (চৈঃ চঃ, মধ্য-৮ম পঃ)

ইহার কোনটি ধ্বনি এবং কোনটিই বা প্রতিধ্বনি? শুধু ভাব নয়, ভাষার আক্ষরিক মিল রহিয়াছে। "নিজ" এই বাক্যটির উপর সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

আরও আছে ;—লোচন, পূর্ণ অবতারের তত্ত্ব ব্যাখ্যায়, বলিতেছেন—

রাধার বরণে অঙ্গ গৌরাঙ্গ হইয়া।
রাধিকার ভাব রস অন্তরে করিয়া॥—(চৈঃ মঃ, আদি খঃ)

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

রাধিকার ভাব মূর্ত্তি—প্রভুর অন্তর। (চৈঃ চঃ, আদি-৪র্থ পঃ)

—আক্ষরিক মিল রহিয়াছে। লোচন লিখিয়াছেন—

রাধাকৃষ্ণ অবতার করিতে বিহার।
আপনে স্বতন্ত্র রাধা প্রকৃতি আকার॥
প্রকৃতি পুরুষ যেন দোঁহে আত্মতনু।
দোঁহে একতনু, কার্য্য বুঝি হৈল ভিনু॥ (চৈঃ মঃ, আদি খণ্ড)

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥
প্রেম ভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে কৈল অবতার। (চৈঃ চঃ, আদি-৪র্থ পঃ)

দ্বাপরে কৃষ্ণ রাধা এক আত্মা হইলেও দুই দেহ ছিল, কলিতে আত্মাও এক এবং দেহও এক—"রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।" (চৈঃ চঃ, মধ্যঃ, ৮ম পঃ)। 'রাধাভাব দ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং'—'ইনিই শ্রীচৈতন্য, একদেহে রাধাকৃষ্ণ অবতার।'

বিশেষজ্ঞেরা স্থির করিয়াছেন যে, ১৬১৫ খৃঃ কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃত সমাপন করেন। তখন পর্য্যন্ত বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম "মঙ্গল" ছিল। কেননা কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থকে 'মঙ্গল' বলিয়া লিখিয়াছেন। পরে যে কারণেই হউক 'মঙ্গল' নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া 'ভাগবত' হয়। লোচন বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থকে 'ভাগবত' বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইলে বলিতে হয়, লোচন কবিরাজ গোস্বামীর পরে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আর যদি লোচনে 'ভাগবত' কথাটা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরা যায়, তবে শুধু ভাগবত কথাটি নয়—লোচনের 'রাধাভাব' সম্পূর্ণই চৈতন্যচরিতামৃত হইতে পরবর্ত্তীয়দের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে মনে করা অসঙ্গত হইবে না। সঙ্গতই হইবে।

লোচনে রাধাভাব আসিবে কেন? লোচন তাঁহার গুরু নরহরির আজ্ঞায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস নরহরিকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার গ্রন্থে নরহরির নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। সেই ক্ষোভে নরহরি লোচনকে দিয়া গ্রন্থ লেখাইয়াছেন।—তা ছাড়া, নরহরি

নদীয়া-নাগরী ভজন-পদ্ধতির প্রবর্ত্তক। শ্রীচৈতন্যের নাগরালি ভাব বৃন্দাবনদাস উল্লেখ করিয়া উপহাস করিয়াছেন।

অতএব মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে॥ (চৈঃ ভাঃ, আদি, ১৩পঃ)

কৃষ্ণ নাগর হইলেও গৌরাঙ্গ নাগর নহে—ইহাই বৃন্দাবনদাসের মত। সুতরাং বৃন্দাবনদাস নরহরির নাম উল্লেখ করেন নাই। অন্য কারণও থাকিতে পারে।

গৌরাঙ্গ যদি নাগর হন, তবে আর তিনি রাধিকা হইবেন কি রূপে? এ যুক্তি অসার নয়। সুতরাং লোচনে শ্রীচৈতন্যের 'রাধিকার ভাবরস অন্তরে করিয়া' প্রক্ষিপ্ত মনে করিবার কারণ আছে। নরহরি নিজে 'রাধিকার ভাবরস অন্তরে করিয়া' শ্রীচৈতন্যকে, শ্রীকৃষ্ণের মত, লম্পট নাগর ভাবে ভজনা করিয়াছেন।

পূর্ণ পূর্ণব্রহ্ম যারে বোলে সর্ব্বজনে।
গোপিকা-লম্পট সে জানিহ বৃন্দাবনে॥
যেই দ্বাপরে হয় কৃষ্ণ-অবতার।
সেই কলিকালে গৌড়চন্দ্র পরচার॥
যেন কৃষ্ণ অবতার তেন গৌড়চন্দ্র।
এই দুই যুগ সব যুগের স্বতন্ত্র॥
এই কলিযুগে গৌড়চন্দ্র পূর্ণ ব্রহ্ম।
অংশ প্রবেশিল ইথে কহিল এ মর্ম্ম॥ (চৈঃ মঃ, আদিখণ্ড)

গৌরচন্দ্রে যেখানে এবং যখন 'অংশ প্রবেশিল'—তখন তিনি যুগাবতারের 'পাষণ্ডান্ পরিচূর্ণয়ান্' প্রভৃতি কার্য্য করিলেন। আর যেখানে 'গৌরচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম'—সেখানে তিনি কৃষ্ণ হইয়া 'নিজ প্রেমা বিলাসিব প্রতিজ্ঞা করিল'। ইহা হইতেই নদীয়া-নাগর ভজনের উদ্ভব। সুতরাং নিজে নাগর হইয়া আবার নিজেই রাধিকা হইলে—নরহরি, গদাধর ইহারা নিরুপায়। কেননা ইঁহারা গৌরাঙ্গের নাগরী।

বৃন্দাবনদাসের সময়েই শ্রীচৈতন্যের নাগর ভাবের ভজন দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তিনি ইহা সমর্থন করেন নাই। বৃন্দাবনদাস যেমন নরহরি প্রবর্ত্তিত ও লোচনে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যের নাগর ভাব সমর্থন

করেন নাই তেমনিই কবিরাজ গোস্বামী বর্ণিত শ্রীচৈতন্যে রাধিকার ভাবাবেশের উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। সুতরাং ইহাও তিনি সমর্থন করেন না। জয়ানন্দেও নাগর ভাব যথেষ্ট আছে। গদাধরের প্রেরণায় জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের নাগরালি ভাব বর্ণনা করিয়াছেন।

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

এমত চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান।
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥
কোন কারণে হৈল যবে অবতারে মন।
যুগধর্ম্ম কাল হৈল সেকালে মিলন॥ (চৈঃ চঃ, আদি-৪র্থ পঃ)

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন তাঁহার কাম নহে বলায় বৃন্দাবনদাস ও জয়ানন্দকে প্রতিবাদ করা হইল। ইহাকে অবতারের বাহ্য উদ্দেশ্য, 'এহো বাহ্য হেতু' বলিয়া, যুগাবতারের কার্য্যকে তুলনায় কবিরাজ গোস্বামী লঘু করিয়াছেন।

অবতরি প্রভু প্রচারিল সংকীর্ত্তন।
"এহো বাহ্য হেতু" পূর্ব্বে করেছি সূচন॥
অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ।
(চৈঃ চঃ, আদি ৪র্থ পঃ)

সেই মুখ্য বীজ কি? মুখ্য বীজ হইতেছে "কৃষ্ণের মাধুর্য্য রস আস্বাদ কারণ"; রাধিকার ভাবমূর্ত্তিতে প্রভুর অন্তর পূর্ণ হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য মূলতঃ কৃষ্ণ হইলেও অন্তরে তিনি রাধিকা। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও পণ্ডিত গদাধর এই রাধিকার ভাব অনুমোদন করেন নাই। সুতরাং বৃন্দাবনদাস ও জয়ানন্দে ইহার উল্লেখ নাই। লোচনে নাগরভাব আছে। রাধাভাব নাগরভাবের বিরুদ্ধ বলিয়া প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। রাধাভাবের প্রাবল্য ও প্রাচুর্য্য কবিরাজ গোস্বামী করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "দামোদর স্বরূপ হইতে ইহার প্রচার।" কিন্তু চৈতন্য চরিতামৃতে—(মধ্যঃ, ৮ম পঃ) দেখিতে পাই রায় রামানন্দ ইহা প্রথমে আবিষ্কার করিয়াছেন এবং প্রকাশ করিয়াছেন। তবে কি দামোদর স্বরূপ হইতেই রামানন্দ ইহা গ্রহণ করিয়াছেন? ইহা রামানন্দের স্বাধীন মত বলিয়াইত দেখা যায়।

যুগাবতার ও পূর্ণ অবতারের উদ্ভব, মিলন ও সমন্বয় কবিরাজ গোস্বামী করিয়াছেন—

কোন কারণে হৈল যবে অবতারে মন।
যুগধর্ম্ম কাল হৈল সেকালে মিলন॥
দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনি আস্বাদে প্রেম নাম সংকীর্ত্তন॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে
নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসারে॥

(চৈঃ চঃ, আদি, ৪র্থ পঃ)

পূর্ণ ভগবানের সহিত যুগ-অবতারের সামঞ্জস্য কবিরাজ গোস্বামী করিলেন এই বলিয়া যে, শ্রীচৈতন্য জন্মিবার সময় দৈবে যুগধর্ম্মের কাল আসিয়া তখন উপস্থিত হইল। সুতরাং তিনি যদিও পূর্ণ ভগবান, এবং যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন তাঁর কাম নয়—তথাপি দৈবে এককালে যোগাযোগ হওয়াতে দুই উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্তই তিনি অবতার হইলেন।

যুগ-অবতারের উদ্দেশ্য যবন ও আচণ্ডালের উদ্ধার। পূর্ণ ভগবান অবতারের উদ্দেশ্য বলিতেছেন—

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈল এক ঠাঞি॥

(চৈঃ চঃ, আদি, ৪র্থ পঃ)

চৈতন্য শুধু কৃষ্ণ নন। এক দেহে রাধাকৃষ্ণ দুই। রাধিকা ভাবে কৃষ্ণের দেওয়া রস আস্বাদন করিবার জন্য এক দেহে দুই একত্র হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণই এক পরমার্থ তত্ত্ব। রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা। শ্রীচৈতন্য এক দেহে রাধাকৃষ্ণ। অতএব শ্রীচৈতন্য পূর্ণ ভগবান।

পূর্ণ ভগবান অবতারের উদ্দেশ্য—

"কৃষ্ণের মাধুর্য্য রস আস্বাদ কারণ।"

কাজেই শ্রীচৈতন্যে রাধিকার ভাবেরই আধিক্য। এই রস আস্বাদনে যদিও রসের উল্লাস বৃদ্ধির জন্য পরকীয়া ভাবের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে,

তথাপি ইহাতে প্রাকৃত যৌন সম্বন্ধ কিছুই নাই। কাজেই ইহাতে কামগন্ধ নাই। মনে মনে কেবল ভাব আস্বাদন।

আপনারা দেখিলেন কবিরাজ গোস্বামী—(ক) যুগ অবতার ও পূর্ণ ভগবান অবতার প্রথমে পৃথক্ করিয়া পরে কেমন একসঙ্গে জুড়িয়া দিলেন। আবার পূর্ণ ভগবান অবতারে—(খ) চৈতন্যের কৃষ্ণ-অবতার অক্ষত রাখিয়াও কেমন কৌশলে তাঁহার রাধাভাবের ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের দেহরক্ষার ৮২ বৎসর পরে কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

কবিরাজ গোস্বামীর মতে বৃন্দাবনদাস কেবল যুগ-অবতারের উদ্দেশ্য লইয়াই লীলার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর মতে 'এহো বাহ্য,'—লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। বৃন্দাবনদাসকে চৈতন্যলীলার আদিব্যাস বলিয়াও এবং তাহার উচ্ছিষ্ঠ চর্ব্বণ করিতেছেন বলিয়াও—কবিরাজ গোস্বামী এই আদিব্যাসকে অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। কেননা কবিরাজ গোস্বামীর মতে বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্য-লীলার মুখ্য উদ্দেশ্যই বর্ণনা করেন নাই। বাহ্য উদ্দেশ্য মাত্র বর্ণনা করিয়াছেন,—এবং পূর্ণ ভগবানের কার্য্য, কেবল রাধার ভাবে কৃষ্ণ বিরহে পাগল হইয়া ও, "ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ"কে মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া, অধিকতর গৌরব দিয়াছেন।

কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের অন্তরকেই শুধু রাধাভাবে পূর্ণ করেন নাই, তাঁহার দেহকে পর্য্যন্ত শ্রীরাধার অঙ্গ বলিয়া স্বয়ং প্রভুর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। রামানন্দ যখন ভাবাবেশে প্রভুকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন তখন প্রভু নিষেধ করিয়া বলিলেন যে,—তুমি আমাকে ছুঁইও না; কেননা আমার দেহ গৌরাঙ্গ নয়, রাধাঙ্গ—উহা কৃষ্ণ বিনা আর কেহ স্পর্শ করিতে পারে না।

গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তিঁহো না স্পর্শে অন্য জন॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য-৮ম)

কবিরাজ গোস্বামীর ব্যাখ্যা বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং অনুমোদিত। এবং এই ব্যাখ্যাই সাধারণতঃ বৈষ্ণব সমাজে এক্ষণে প্রচলিত।

আচার্য্য অদ্বৈত নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যকে শ্রীরাধিকা রূপে চান নাই। শ্রীপাদ নিত্যানন্দও ইহা চান নাই—চাহিতে পারেন না। শ্রীবাস ইহা চান নাই; গদাধর ইহা চান নাই, তিনি শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণে বিশেষ আপত্তি করিয়াছিলেন। পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে এই চারি তত্ত্বের এক তত্ত্বও শ্রীচৈতন্যের রাধাভাবের অবতার নবদ্বীপে চান নাই এবং শেষ পর্য্যন্ত ইহা স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া কোন চরিতগ্রন্থে উল্লেখ নাই।

অবতার তত্ত্বে বৃন্দাবনদাস দিয়াছেন কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ, জয়ানন্দ সম্পূর্ণ বৃন্দাবনদাসের অনুগামী—লোচন দিয়াছেন বৃন্দাবনের কৃষ্ণ। নাগরালীভাব বৃন্দাবনের কৃষ্ণ ভিন্ন হইতে পারে না। কবিরাজ গোস্বামী দিয়াছেন,—"বৃন্দাবনের মাথুর বিরহের বিরহিনী রাধিকা।"

চরিত গ্রন্থগুলিতে একের পর আর অবতারের ব্যাখ্যার এই পরিবর্ত্তন কেন হইয়াছে? সহজ বুদ্ধিতে দেখা যায় যে, নবদ্বীপের আবেষ্টনটী শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতার করিতে প্রেরণা দিয়াছিল,—সুযোগ দিয়াছিল। নবদ্বীপের আবেষ্টনটীকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু নিজমুখে বলিয়াছিলেন—

করাইবা তোমরা কৃষ্ণের অবতার। (চৈঃ ভাঃ, মধ্য, ২য় অঃ)

এখানে 'তোমরা' কথাটী উপেক্ষণীয় নয়। শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে প্রচার বিমুখ দেখিয়া প্রভু নিজমুখে বলিয়াছেন,—"যদি মুর্খ, নীচ, পতিতদের উদ্ধার করিবে না"—

তবে অবতার বা কি নিমিত্ত করিলে। (চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য, ৫ম)

শ্রীচৈতন্যকে ভক্তেরাই অবতার করিয়াছেন ইহা যেমন স্পষ্ট; এবং যে উদ্দেশ্যে অবতার করিয়াছেন, তাহাও সুস্পষ্ট। এবং আরও সুস্পষ্ট যে, নবদ্বীপের পার্ষদগণ শ্রীচৈতন্যের মধ্যে শ্রীরাধিকার অবতার চান নাই।

আবার অন্যদিকে নীলাচলের ভক্তেরা রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যের মধ্যে শ্রীরাধিকাকেই চাহিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনের এই শেষ ২৪ বৎসরের আবেষ্টনটী উপেক্ষণীয় নয়। নবদ্বীপের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেরণায় যদি কৃষ্ণের অবতার হওয়া সম্ভব হইয়া থাকে, তবে নীলাচলের প্রেরণায় রাধিকার অবতার হওয়া অসম্ভব নয়,—সম্পূর্ণ সম্ভব।

জীবনে ক্রমবিকাশ আছে, নরলীলায় অবতার পুরুষের জীবনেও ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। দেশ, কাল, পাত্র এই ক্রমবিকাশে সহায়তা করে। পরিবর্ত্তন ভিন্ন ক্রমবিকাশ সম্ভব নয়। শ্রীচৈতন্যের অবতার তত্ত্বে এই ক্রমবিকাশমুখে নবদ্বীপ ও নীলাচলে যে পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে চরিতগ্রন্থগুলিতে তাহারই উল্লেখ দেখা যায়।

দ্বিতীয় বক্তৃতা

[শিশু নিমাইয়ের বাল্য-দৌরাত্ম্যের—১ম অধ্যায়—২য় অধ্যায়। নিমাইয়ের বাল্য-দৌরাত্ম্যে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের আভাষ পাওয়া যায় কি না? বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে নিমাইয়ের প্রথম মানসিক পরিবর্ত্তন। নিমাইয়ের ছাত্রজীবনের বৈশিষ্ট্য। তিনটি অধ্যাপকের মধ্যে পণ্ডিত গঙ্গাদাসের গুরুত্ব। নিমাই কোন কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন? মুরারি গুপ্তের সহিত বিদ্যা-কলহ। জগন্নাথ মিশ্রের তিরোভাব। নিমাইয়ের শচীমাতাকে সান্ত্বনা প্রদান। গঙ্গার ঘাটে লক্ষ্মীর সহিত নিমাইয়ের সাক্ষাৎ।]

শিশু চৈতন্যকে লইয়া শচীমাতা একমাসকাল আঁতুড় ঘরে অবস্থান করিলেন। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

পরিপূর্ণ হইল মাসেক এইমতে
বালক উত্থানপর্ব্বে যত নারীগণ
শচীসঙ্গে গঙ্গাস্নানে করিলা গমন। (চৈঃ ভাঃ, আদি—৪র্থ অঃ)

চারিমাসেরও পরে কিছুদিন গেল, "নাম-করণের কাল হইল সম্মুখ।" বিদ্বান সব বিচার করিলেন যে, এই শিশু জন্মিবার পর হইতে—

দুর্ভিক্ষ ঘুচিল বৃষ্টি পাইল কৃষকে
অতএব ইহান 'শ্রীবিশ্বম্ভর' নাম। (চৈঃ ভাঃ, আদি—৪র্থ অঃ)

কিন্তু স্ত্রীলোকেরা আপত্তি করিলেন—

ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা পুত্র নাই
শেষে যে জন্ময়ে তার নাম সে নিমাঞি।
(চৈঃ ভাঃ, আদি—৪র্থ অঃ)

বিদ্বানেরা শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বম্ভর নাম বহাল রাখিয়া মীমাংসা করিলেন,—

নিমাঞি যে বলিলেন পতিব্রতাগণ
সেহো নাম দ্বিতীয় ডাকিব সর্ব্বজন। (চৈঃ ভাঃ, আদি—৪ অঃ)

নিমাই হামাগুড়ি দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন,—

জানু পাতি চলে প্রভু পরম সুন্দর
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর

এই হামাগুড়ি দেওয়ার কালে শিশু একদিন এক বিষম কাণ্ড করিয়া বসিল।

একদিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়
ধরিলেন সর্প প্রভু বালক লীলায়।

এদিকে,—"আথে ব্যথে সভে দেখি হায় হায় করে।" যদিও,—

জাতি সর্প তেঞ্রি না লঙ্ঘিল,
কেহ বলে বালকের পুনর্জন্ম হৈল।

তারপর ক্রমে—"হাটিয়া করেন প্রভু অঙ্গনে ভ্রমন।"

এইবার নিমাই একাকী বাড়ীর বাহিরে যাইতে আরম্ভ করিল।

কি বিহানে কি মধ্যাহ্নে কি রাত্রি সন্ধ্যায়
নিরবধি বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়।

শুধু তাই নয়, প্রতিবেশীদের ঘরে ঢুকিয়া চুরি করিয়া খাইতে লাগিল।

কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে, কারো ভাত খায়
হাণ্ডী ভাঙ্গে, যার ঘরে কিছুই না পায়।

(চৈঃ ভাঃ আদি—৪র্থ অঃ)

ইহা যদি কৃষ্ণলীলার আরোপ না হয়, তবে বালক নিমাইয়ের দৌরাত্ম্যের একটা রকমারি দৃষ্টান্ত।

বৃন্দাবনে মা যশোদা কৃষ্ণের পায়ে নূপুর দিয়াছিলেন, কাজেই শব্দ হইত। নবদ্বীপে শচীমাতা নিমাইয়ের পায়ে নূপুর দেন নাই। হইলে কি হয়, শচী-জগন্নাথ নিমাইয়ের শুধু পায়েতেই নূপুরের ধ্বনি শুনিতে লাগিলেন।

একদিন ডাকি বলে মিশ্র পুরন্দর
আমার পুস্তক আন বাপ বিশ্বম্ভর॥
বাপের বচন শুনি ঘরে ধাই যায়।
রুণু ঝুণু করিয়ে নূপুর বাজে পায়ে॥
মিশ্র বলে কোথা শুনি নূপুরের ধ্বনি।
চতুর্দ্দিগে চায় দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণি॥
আমার পুত্রের পায়ে নাহিক নূপুর।
কোথায় বাজিল বাদ্য নূপুর মধুর॥ (চৈঃ ভাঃ আদি—৪র্থ অঃ)

ঘর হইতেই, বাপকে পুঁথি দিয়া নিমাই ত খেলিতে চলিয়া গেল। এদিকে ঘরে আসিয়া, শচী-জগন্নাথ—

সবগৃহে দেখে অপরূপ পদচিহ্ন
ধ্বজ, বজ্র, পতাকা, অঙ্কুশ ছিন্নভিন্ন ॥

বৃন্দাবনের নন্দ-যশোদার বাৎসল্যেই বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে শিশুসন্তান-লালিত পালিত হয়। নবদ্বীপে শচী-জগন্নাথের ঘরেও তাহাই হইতেছিল। নিমাইয়ের সুন্দর রূপ দেখিয়া প্রতিবেশীরাও ইহাতে যোগ দিয়াছিল। তার উপর চরিতলেখকেরা চিত্রের যে সকল অংশ বাকী ছিল—তাহা বিধিমত পূরণ করিয়া দিয়াছেন।

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন

ছয় দিবসে লৈয়া যত বন্ধুজনে
করিল সূতিকা পূজা বিবিধ বিধানে
বিশ্বম্ভর নাম থুইল বিংশতি দিবসে
নিমাঞ পণ্ডিত নাম জগত প্রকাশে
ছয় মাসে অন্নপ্রাশন করাইল
নিমাই বলিয়া সভে ডাকিতে লাগিল
গলায়ে বাবলা পিঠে, পাটের থোপনি
হামাগুড়ি দিঞা বুলে দ্বিজ শিরোমণি
কুন্দ কলিকা দুটি দন্ত উঠিল
পাকা তেলাকুচা জেন অধর ফুটিল।

(চৈঃ মঃ,—নদীয়া খঃ)

জয়ানন্দ 'বিংশতি দিবসে' বিশ্বম্ভর নাম থুইলেন। বৃন্দাবনদাস চারি মাসেরও কিছুদিন পরে নামকরণ করিয়াছেন। লোচন ছয় মাসে অন্নপ্রাশনের দিন নামকরণ করিয়াছেন।

তারপর একদিন শচীমাতা রন্ধনশালায়, নিমাই বালকদের সহিত আঙ্গিনায় খেলিতেছে। শচীমাতা হঠাৎ দেখিলেন, নিমাইয়ের—

শিরে শিখিপুচ্ছচূড়া, গলে গুঞ্জাদাম
আচম্বিতে কনক নূপুর পায়ে বাজে। (চৈঃ মঃ,—নদীয়া খঃ)

জয়ানন্দ ধাত্রীমাতা নারায়ণীকে পর্য্যন্ত দিয়া এ সমস্ত দেখাইলেন। ধাত্রীমাতা নারায়ণীকে এক জয়ানন্দ ছাড়া আর কেহ ডাকেন না। শিখিপুচ্ছচূড়া—অলৌকিক না হইয়া, সম্পূর্ণ লৌকিকও ত হইতে পারে।

লোচন নিমাইয়ের বিশ্বম্ভর নামকরণ সম্পর্কে ভিন্ন ব্যাখ্যা দিতেছেন—

বিশ্ব-শাসন হেতু থুইল বিশ্বম্ভর নাম।
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় মাসে
নামকরণ হৈল অন্নপ্রাশন দিবসে।

লোচনের মতে, জয়ানন্দ-কথিত বিংশতি দিবসে নামকরণ হয় নাই। লোচন এখানে বৃন্দাবনদাসের অনুগামী। লোচনও দেখাইয়াছেন—

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ সে পঙ্কজ পদতলে।

একদিন নিমাই আঙ্গিনায় নাচিতেছিল। শচীমাতা—

শূন্যপায়ে নূপুরের ধ্বনি যে শুনিনু,

বলিয়া—জগন্নাথ মিশ্রের নিকট ভয় পাইয়া বলিলেন—

সাতকন্যা মরি মোর এইটি ছাওয়াল
ইহা দিয়া কিছু হৈলে নাহি জীব আর।

নিমাই এখন এক পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছে। অন্যান্য বালকের সঙ্গে খেলা করিতেছে—

তবে আর কতদিনে শচীর নন্দন।
বয়স্য সহিতে করে বাহিরে ভ্রমণ॥
গঙ্গাতীরে তরুমূলে খেলিয়া বেড়ায়।
মার্কণ্ড খেলা খেলে এক চরণে দাণ্ডায়॥
জানুর উপরে জানু রহে একপদে।
দেখিয়া জননী ডাকে উৎকৃষ্ট শব্দে॥
মায়েরে দেখিয়া প্রভু পালাইয়া যায়।
মাতিল কুঞ্জর যেন উলটীয়া চায়॥
ধর ধর বলি ডাকে শচী দেবী রাণী।
আগে আগে ধায় মোর প্রভু দ্বিজমণি॥

ধরিবারে চাহে শচী ধরিতে না পারে।
যাঞা সান্ধাইল গিয়া ঘরের ভিতরে॥
ঘর মধ্যে যত ভাণ্ড ভাজন আছিল।
ধর ধর করিতে সব ভাঙ্গিয়া ফেলিল
নাসায় অঙ্গুলি শচী দাণ্ডাইয়া চাহে॥
হেঁট বয়ান করি বিশ্বম্ভর রহে।

(চৈঃ মঃ,—আদিখণ্ড)

মাতা ও পুত্রের একখানি সুন্দর চিত্র লোচন অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহা আর কেহ পারেন নাই।

লোচন শিশু নিমাইয়ের দৌরাত্ম্যের আরও বিবরণ দিয়াছেন—

(ক) পুত্রের চাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য মিশ্র ব্রাহ্মণ ডাকাইয়া যজ্ঞ-স্বস্ত্যয়ন করাইলেন। কোন ফল হইল না।

স্বস্ত্যয়ন করিয়া কর বালক কল্যাণ।

(চৈঃ মঃ,—আদিখণ্ড)

(খ) গঙ্গাস্নান করিলে চাঞ্চল্য ঘুচিবে, এই মনে করিয়া শচীমাতা শিশু নিমাইকে পায়ে হাঁটাইয়া গঙ্গাস্নানে নিয়া গেলেন। ফল উল্টা হইল।

এথা শচী গৌরচন্দ্র লওয়া গঙ্গাস্নানে।
চঞ্চল ঘুচিবে পুত্র এই করি মনে॥
খেলিতে খেলিতে সে অশুচি দেশে যায়।
ত্যক্ত ভাণ্ড পরশ করিয়া চলি যায়॥

(চৈঃ মঃ,—আদিখণ্ড)

একে শচীমাতা শুচিবায়ুগ্রস্ত। (হিন্দু সমাজে অনেক বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক এই ব্যাধিগ্রস্ত। ইহা একপ্রকার মানসিক ব্যাধি। আচারের নিগড় ইহাকে সমাজে আরও প্রশ্রয় দিয়াছে।

দেখিয়াত শচীদেবী করে হায় হায়।
অধিক চঞ্চল পুত্র হইল আমার॥)

(চৈঃ মঃ,—আদিখণ্ড)

অশুচি দেশে গিয়া শিশু নিমাই আবার মায়ের সঙ্গে তর্ক করে। বলে যে, ইহা অশুচি নয়।

(গ) "আর একদিন ত্যক্ত মৃত্তিকার ভাণ্ড বর্জ্জয়ে যেখানে", সেখানে গিয়া নিমাই বসিল। (নিষিদ্ধ কার্য্যে একটু বেশী আগ্রহ)। মাতা ভৎর্সনা করিলেন। নিমাই মাতাকে তর্কে আহ্বান করিল—"কি শুচি অশুচি আগে বিচায়া বল।" পরে শিশু অতি গর্হিত কার্য্য করিল।

ইহা বলি সম্মুখে ইষ্টকা লৈলা হাতে।
ইষ্টকা প্রহার কৈল জননীর মাথে॥
ইষ্টকা প্রহারে মূর্চ্ছা পাইল শচীরাণী।
মা মা বলে পুনঃ কান্দয়ে আপনি॥

(চৈঃ মঃ,—আদিখণ্ড)

এইত অবস্থা।

(ঘ) আর একদিন শচীমাতা গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন, বাড়ী আসিয়া দেখেন নিমাই এক কুকুরের শাবক কোলে লইয়া বসিয়া খেলা করিতেছে।

"শ্বানের শাবকে বিশ্বম্ভর কোলে করে।"

"শিরে কর হানি বলয়ে জননী, না জানি কি তোর লীলা।" ইহার পর কিন্তু নিমাইকে বাঁধিয়া রাখিয়া শচীমাতা গঙ্গাস্নানে যাইতেন।

(ঙ) একদিন বৈদ্য মুরারি রাস্তা দিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে করিতে যাইতেছিলেন। পথে বালকদের সঙ্গে নিমাই খেলিতেছিল। মুরারিকে নিমাই 'হাত নাসা মুখ' অনুকরণ করিয়া উপহাস করিল। মুরারি 'কুবচন বলিল রুখিয়া'। কি তার ফল হইল দেখুন। পরদিন মুরারি মধ্যাহ্নে বাড়ীতে খাইতে বসিয়াছেন—

"মধ্যে ভোজন বেলা, ধীরে ধীরে নিয়ড় গেলা
থালু ভরিয়া মুত মুতিলা"। (চৈঃ মঃ,—আদিখণ্ড)

জয়ানন্দও শচী মাতাকে ইষ্টক মারিবার কথা বলিয়াছেন—

"ইটাল মারিল মায়ের মুখে, রক্ত পড়ে বায়া শচীর মুখে
মূর্চ্ছা গেল শচী আউলাল কেশ।
রড় দিয়া প্রভু গেল পালাঞা। (চৈঃ মঃ,—নদীয়াখণ্ড)

উচ্ছিষ্ট হাঁড়ীতে বসিবার কথাও আছে।

রাজপথ দিঞা নিজ গৃহ প্রবেশিতে।
হুঙ্কার দিয়া পড়ে উচ্ছিষ্ট কুণ্ডেতে॥
সকল উচ্ছিষ্ট হাঁড়ী একত্র করিয়া।
ব্রহ্ম বাখানিল তার উপরে বসিয়া॥
সর্ব্বভূত সমকরি—আত্মবৎ দয়া।
পুরীষ চন্দন ভেদ এই সব মায়া॥ (চৈঃ মঃ,—নদীয়াখণ্ড)

এতখানি বেদান্ত না বলিলেও—বালক নিমাই যে অশুচিতার বিরুদ্ধে তর্ক করিয়াছিল—ইহা প্রমাণ হয়।

আর একদিন মিশ্র খাইতে বসিয়াছেন। নিমাই—

বাপের যজ্ঞসূত্র লইল কাড়ি
রড় দিয়া গেল মামার বাড়ী। (চৈঃ মঃ,—নদীয়া খঃ)

মামাকে গিয়া কহিল, দেখ মামা—

আমি তোমা না দেখিলে ভাল না বাসি।

শচীমাতাকে 'ইটাল' মারিবার কথা কেবল জয়ানন্দ ও লোচন বলেন। বৃন্দাবনদাস বলেন নিমাই যতই চঞ্চল হউক মায়ের গায়ে কখনও হাত তুলিতেন না। কবিরাজ গোস্বামী বলেন—তা ঠিক নয়। "কভু মৃদু হস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন, মাতাকে মুর্চ্ছিত দেখে করয়ে ক্রন্দন।"

কবিরাজ গোস্বামী বাল্যলীলা খুব সংক্ষেপে লিখিয়াছেন। অন্ত্যলীলায় যাঁহাকে দিয়া রাধিকার ভূমিকায় বিরহের চরম অভিনয় করাইবেন—তাঁহার বাল্যলীলায় কৃষ্ণলীলার আরোপ সবিস্তারে করিতে কবিরাজ গোস্বামী হয়ত কিঞ্চিৎ অসুবিধা বোধ করিয়াছেন। তথাপি তিনি ঘরের মেঝেতে—

"ধ্বজবজ্র শঙ্খ চক্র মীন" শচীমাতাকে দেখাইলেন। শচীমাতা নিমাইকে স্তন দিবার কালে চরণে ঐ সমস্ত চিহ্ন দেখিয়া মিশ্রকে ডাকিয়া দেখাইলেন। মিশ্র শ্বশুরকে দেখাইলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী বলিলেন—

বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ ভূষণ
এই শিশু অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ। [চৈঃ চঃ,—আদি-১৪পঃ]

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণ অবতারের কথা বলিলেন না। বলিলেন, এ শিশু কালে মহাপুরুষ হইবে। চক্রবর্ত্তীর চিহ্ন ও লগ্ন গণনাদি কালে এত সত্য হইয়াছিল যে অবিশ্বাসীর মনেও জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস আনিয়া দেয়।

নিমাইয়ের দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে এইরূপ আছে—

শিশুগণ লয়ে পাড়া পড়সীর ঘরে।
চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বালকেরে॥

(চৈঃ চঃ, আদি-১৪ পঃ)

শিশু সব শচীস্থানে কৈল নিবেদন।
শুনি শচী পুত্রে কিছু দিল ওলাহণ॥
কেনে চুরি কর—কেনে মারহ শিশুরে।
কেন পর ঘরে যাহ—কিহা নাহি ঘরে॥

ইহাতে বিপরীত ফল হইল।

শুনি ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু ঘর ভিতর যাঞা।
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥

(চৈঃ চঃ, আদি-১৪ পঃ)

কবিরাজ গোস্বামী একজন বড় রকমের দার্শনিক কবি। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলায় বাৎসল্যের অবতারণায়—তিনি হয় ইচ্ছা করিয়া সঙ্কোচ করিয়াছেন,—না হয়—বাৎসল্য তিনি ফুটাইতে পারেন নাই। লোচনের ছবি চরিতামৃতের ছবি অপেক্ষা এ ক্ষেত্রে অধিকতর জীবন্ত ও নিখুঁত। শিশু চৈতন্যের উপর কবিরাজ গোস্বামীর এত বেশী 'ঈশ্বর বুদ্ধি' রহিয়াছে যে, শিল্প সাধনায় যে অসঙ্কোচ স্বাধীনতা প্রয়োজন শিল্পীতে তাহার অভাব দেখা যায়।

নামকরণ সময়ে দুই নামের মধ্যে যেটী অধিক বাৎসল্য জড়িত চৈতন্যচরিতামৃতে সেই "নিমাই" নামের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। বিশ্বম্ভর নামের এই ব্যাখ্যা আছে—

সর্ব্ব লোকের করিবে এই ধারণ পোষণ।
বিশ্বম্ভর নামে এর এইত কারণ॥

বৃন্দাবনদাস ও লোচনদাস বিশ্বম্ভর নামের যে পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা দিয়াছেন তা আগেই যথাস্থানে বলা হইয়াছে। নিমাইয়ের বাল্য দৌরাত্ম্যের প্রথম অধ্যায় শেষ হইল।

সকল চরিতকার-ই নিমাইয়ের হাতে খড়ি দিয়াছেন,—

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে, হাতে খড়ি দিবার কাল আসিলে, মিশ্র নিমাইয়ের হাতে খড়ি দিলেন, সেই সঙ্গে "কর্ণবেধ করিলেন শ্রীচূড়াকরণ"—

দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখি যায়
দিন তুই তিনেতে পড়িলা সর্ব্বফলা
কি মাধুরী করি প্রভু ক খ গ ঘ বলে। (চৈঃ ভাঃ, আদি-৫অঃ)

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—'চূড়ামঙ্গলিঞা সে করিল চূড়াকর্ণ।' তারপর একদিন অন্যান্য বালকদের সঙ্গে নিমাই সুদর্শন পণ্ডিতের বাড়ী গেলেন—

ক খ চৌত্রিশ অক্ষর কাঠনেতে লেখি
হামাগুড়ি দিঞা পড়ে গুরু মাত্র দেখি।
ক খ ইহার নাম গুরুরে জিজ্ঞাসে
ইহার নাম ওঝা ক খ কেন বোল॥

কিছু তর্কও হইল—

ইহা শুনি সুদর্শন ক্রোধে বাড়ি মারি।
(চৈঃ মঃ, নদীয়া খঃ)

এইত প্রথমদিনের কাণ্ড। অবশ্য ইহা জয়ানন্দ ছাড়া আর কেহ লেখেন নাই। লোচন হুবহু বৃন্দাবনদাসের ভাষা অনুকরণ বা অপহরণ করিয়াছেন! হাতে খড়ি যথাসময়ে দেওয়া হইল। ইষ্ট কুটুম্ব সব আনিয়া চূড়াকর্ণ হইল। তারপর—

কি মাধুরী করি প্রভু ক খ গ ঘ বোলে—
দিন তুই তিনে সে লিখিল সর্ব্বকলা। (চৈঃ মঃ, আদি)

লোচন যদি ইহা বৃন্দাবনদাস হইতে নিজে অপহরণ না করিয়া থাকেন—তবে পরবর্ত্তীয়দের দ্বারা ইহা লোচনে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

লোচনে কবিরাজ গোস্বামী হইতেও বহু প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রক্ষিপ্ত দোষে লোচন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দুষ্ট। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের পর লোচন নিমাইকে হাতে খড়ি দিয়াছেন। সে কথা ঠিক নয়। নিমাইয়ের হাতে খড়ি হইবার অন্ততঃ এক বৎসর পরে বিশ্বরূপের সন্ন্যাস হয়। অপর চরিত লেখক সকলেই তাই লিখিয়াছেন।

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন যে—বৃন্দাবনদাস ইহা সবিস্তারে লিখিয়াছেন,—সুতরাং আমি আর কি লিখিব।

অধ্যয়ন লীলা প্রভু দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্য মঙ্গলে কৈল বিস্তারি বর্ণন॥ (চৈঃ চঃ, আদি, ১৫পঃ)

তারপর—

কতদিনে মিশ্র পুত্রে হাতে খড়ি দিল।
অল্প দিনে দ্বাদশ ফলা অক্ষর শিখিল॥ (চৈঃ চঃ আদি ১৪পঃ)

আদি লীলা, এমন কি সমগ্র নবদ্বীপ লীলা জানিতে যাহারা কৌতূহলী,—বৃন্দাবনদাস ছাড়া তাঁহাদের আর অন্য গতি নাই।

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের (১৪৯১ খৃঃ) পূর্ব্বে, বৃন্দাবনদাস নিমাইয়ের বাল্য দৌরাত্ম্যের অনেক বর্ণনা দিয়াছেন।— হঠাৎ একদিন নিমাই বায়না ধরিল যে, যদি আমার প্রাণরক্ষা চাও তবে জগদীশ আর হিরণ্য এই দুই ব্রহ্মণের বাড়ী যাও—

একাদশী উপবাস আজি সে দোঁহার।
বিষ্ণু লাগি করিয়াছে যত উপহার॥
সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ।
তবে মুঞি সুস্থ হই হাটিয়া বেড়াও॥

(চৈঃ ভাঃ, আদি, ৫খঃ)

ব্রাহ্মণ দুইজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন; সমস্ত শুনিয়া তাঁহারা নৈবেদ্য দিলেন।

সন্তোষ হইলা সব পাই উপহার।
অল্প অল্প কিছু প্রভু খাইল সভার॥

বালক নিমাই শুধু দুরন্ত নয়, অতিশয় চতুর।

তারপর সঙ্গীগণ সহ গঙ্গাস্নানে গিয়া নিমাই বিষম দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল।

পড়িয়া শুনিয়া সর্ব্বশিশুগণ সঙ্গে।
গঙ্গাস্নানে মধ্যাহ্নে চলেন বহুরঙ্গে॥
সভারে লইয়া প্রভু গঙ্গায় সাঁতারে।
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে নানা ক্রীড়া করে॥
জলক্রীড়া করে গৌর সুন্দর শরীর।
সভার গায়েতে লাগে চরণের নীর॥
সভে মানা করে তবো মানা নাহি মানে।
ধরিতেও কেহ নাহি পারে এক স্থানে॥
পুনঃ পুনঃ সভারে করায় প্রভু স্নান।
কারে ছুঁয়ে কারো অঙ্গে কুল্লোল প্রদান॥

(চৈঃ ভাঃ, আদি-৫ম অঃ)

সকল বিপ্র মিলিয়া নিমাইয়ের পিতার নিকটে নালিশ করিতে আসিল।

শুন শুন ওহে মিশ্র পরম বান্ধব।
তোমার পুত্রের অন্যায় কহি সব॥
ভাল মতে করিতে না পারি গঙ্গাস্নান।
কেহ বলে জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান॥
আরো বলে কারে ধ্যান কর এই দেখ।
কলিযুগে নারায়ণ মুঞি পরতেখ॥
কেহ বলে মোর শিবলিঙ্গ করে চুরি।
কেহ বলে মোর লই পালায় উত্তরি॥
কেহ বলে পুষ্প দুর্ব্বা নৈবেদ্য চন্দন।
বিষ্ণু পূজিবার সজ্জা বিষ্ণুর আসন॥
আমি করি স্নান, হেথা বৈসে সে আসনে।
সব খাই পরি তবে করে পলায়নে।
আরো বলে তুমি কেন দুঃখ ভাব মনে।
যার লাগি কৈলে সেই খাইল আপনে॥

কেহ বলে সন্ধ্যা করি জলেতে নাম্বিয়া।
ডুব দেই লৈয়া যায় চরণে ধরিয়া॥
কেহ বলে আমার না রহে সাজি ধুতি।
কেহ বলে আমার চোরায় গীতাপুঁথি॥
কেহ বলে পুত্র অতি বালক আমার।
কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার॥
কেহ বলে মোর পৃষ্ঠ দিয়া কান্ধে চড়ে।
মুঞিরে মহেশ বুলি ঝাপ দিয়া পড়ে॥
কেহ বলে বৈসে মোর পূজার আসনে।
নৈবেদ্য খাইয়া বিষ্ণু পূজয়ে আপনে॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে।
যতেক চপলশিশু সেই তার সঙ্গে॥
স্ত্রীবাসে, পুরুষ-বাসে করয়ে বদল।
পরিবার বেলে সভে লজ্জায় বিকল॥
পরম বান্ধব তুমি মিশ্র জগন্নাথ।
নিত্য এইমত করে,—কহিল তোমাত॥
দুই প্রহরেও নাহি উঠে জল হৈতে।
দেহবা তাহার ভাল থাকিবে কেমতে॥

(চৈঃ ভাঃ আদি, ৫অঃ)

স্নানার্থী পূজা আহ্নিকে ব্রতী ব্রাহ্মণদের উপর নিমাইয়ের উপদ্রবের যে লম্বা ফর্দ্দ পাওয়া গেল, ইহা হইতে এই চঞ্চল, চতুর বালকের মানসিক বিকাশের একটা ইতিবৃত্ত আমরা পাইলাম। ব্রাহ্মণ সজ্জনের গঙ্গাস্নানের একটি সুন্দর প্রাচীন চিত্র দেখিলাম। এমন জীবন্ত নিখুঁত চিত্রাঙ্কণ এক বৃন্দাবনদাস ছাড়া আর কেহ আঁকিতে পারেন নাই। সব চিত্রটাই যেন চক্ষের সম্মুখে ভাসে। কিন্তু ফরিয়াদী কেবল ব্রাহ্মণেরা নহেন,—স্নানার্থিনী বালিকারাও আসিয়া শচী দেবীর নিকট অভিযোগ করিলেন।

শুন ঠাকুরাণী নিজ পুত্রের করণ।
বসন করয়ে চুরি, বোলে বড় মন্দ॥

ব্রত করিবারে যত আনি ফুল ফল।
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে॥
অলক্ষিতে আসি কর্ণে বোলে বড় বোল।
কেহ বলে, মোর মুখে দিলেক কুল্লোল॥
ওকরার ফল দেয় কেশের ভিতরে।
কেহ বলে—'মোরে চাহে বিভা করিবারে'॥

(চৈঃ ভাঃ, আদি, ৫অঃ)

এই শেষের মেয়েটির অভিযোগ নিতান্তই গুরুতর। অথচ এ অভিযোগ মিথ্যা নয়, এই জন্য যে—ইহার পরে লক্ষ্মীর সহিত নিমাইয়ের বিবাহ, গঙ্গার ঘাটে এই রকম দৌরাত্ম্য হইতেই সূচনা হইয়া, পরে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল।

বালিকাদের অভিযোগে আরো একটি কথার ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহা এ কালের সুরুচি সম্মত নয়।

পূরবে শুনিলা যেন নন্দের কুমার।
সেই মত সব করে নিমাই তোমার॥ (চৈঃ ভাঃ, আদি, ৫অঃ)

বালিকারা অপমান বোধ করিয়াছে, দুঃখ অনুভব করিয়াছে, এবং শচীমাতাকে শাসাইতেও দ্বিধা করে নাই। নিতান্ত লজ্জাকর বলিয়া তাহাদের পিতা মাতাকে এতদিন এসব কথা তাহারা বলে নাই।

দুঃখে বাপ মায়েরে বলিব যেই দিনে।
ততক্ষণে কোন্দহল হইবে তোমা সনে॥
নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল।
নদীয়ায় হেন কর্ম্ম কভু নহে ভাল॥ (চৈঃ ভাঃ, আদি, ৫অঃ)

অর্থাৎ শ্রীহট্টে যা সম্ভব, নদীয়ায় তা চলিবেনা।

শচীদেবী মায়ের মত স্নেহে সকল বালিকাকে একে একে কোলে তুলিয়া নিয়া বলিলেন, আজ নিমাই আসিলে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিব। আর উপদ্রব করিতে পারিবে না।

সভা কোলে করিয়া কহেন প্রিয়বাণী।
নিমাঞি আইলে আজি এড়িমু বাধিয়া॥
আর যেন উপদ্রব নাহি করে গিয়া।
শচীর চরণধূলি লই সভে শিরে॥
তবে চলিলেন পুনঃ স্নান করিবারে॥ (চৈঃ ভাঃ, আদি, ৫অঃ)

(বালিকাদের আচরণ যেমন তেজঃস্বিতাপূর্ণ, তেমনি পরম শোভনীয়) জগন্নাথ মিশ্র একদিন লাঠিহস্তে নিমাইয়ের উদ্দেশ্যে গঙ্গাঘাটে ধাবিত হইয়াছিলেন। (সেদিন কিন্তু এই অভিযোগকারিণী কুমারীরাই নিমাইকে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিয়া রক্ষা করিয়াছিল। অভিযোগকারিণীরা নিমাইকে অতিশয় ভালবাসিত।

কুমারীরা সভে বলে শুন বিশ্বম্ভর।
মিশ্র আইলেন এই,—পলাহ সত্বর॥) (চৈঃ ভাঃ, আদি, ৫ অঃ)

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—যে, নিমাই পিতা মাতা কাহাকেও ভয় করিতেন না, কেবল বিশ্বরূপ অগ্রজকে দেখিয়া কিছুটা নম্র হইতেন।

নিমাইয়ের অগ্রজ বিশ্বরূপ অস্পষ্ট আবছায়ার মত মনে হয়। যাঁহারা গৌরাঙ্গ চরিত লিখিতে বসিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বিশ্বরূপের বিস্তৃত বর্ণনা আশা করা যায়না সত্য, তথাপি নিমাইয়ের বাল্য লীলার পটভূমিকায় বিশ্বরূপের স্থান অস্পষ্টতার মধ্যে নহে। বিশ্বরূপ নিমাই অপেক্ষা ১০ বৎসর বড়। বিশ্বরূপ ১৬ বৎসর বয়সে (১৪৯১ খৃঃ) সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন। তখন নিমাই ৬ বৎসরের বালক।

বৃন্দাবনদাস বলেন যে—বিশ্বরূপ অদ্বৈত সভায় আসিয়া গীতা ব্যাখ্যা করিতেন, উলঙ্গ নিমাই অগ্রজকে ডাকিবার জন্য সেখানে যাইতেন।

রন্ধন করিয়া শচী বলে বিশ্বম্ভরে।
তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে॥

'দিগম্বর সর্ব্বঅঙ্গ ধূলায় ধূসর' নিমাই অদ্বৈতের সভায় আসিয়া দাদাকে বলিতেন—

ভোজনে আইস ভাই ডাকয়ে জননী।
অগ্রজ বসন ধরি চলয়ে আপনি॥ (চৈঃ ভাঃ, আদি, ৬ অঃ)

শিশু নিমাইকে দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত বলিয়াছেন—"চিত্ত বিত্ত হরে শিশু

সুন্দর দেখিয়া”। দুরন্ত নিমাই পিতা মাতা কাহাকেও ভয় করিতেন না; কিন্তু বিশ্বরূপকে দেখিলে নম্র হইতেন।

পিতা মাতা কাহারেও না করয়ে ভয়।
বিশ্বরূপ অগ্রজে দেখিলে নম্র হয়॥

'না ভায় সংসার সুখ বিশ্বরূপ মনে'—কিন্তু এই অবস্থায় বিশ্বরূপের 'বিবাহের—উদ্যোগ করয়ে পিতা'। ফল উল্টা হইল, বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন,—নাম হইল—'শ্রীশঙ্করারণ্য'। 'ভাইর বিরহে মূর্চ্ছা গেলা গৌর-রায়'—'অদ্বৈতাদি সবে বহু করিলা ক্রন্দন।' চঞ্চল নিমাইয়ের মনে ও ব্যবহারে একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল।

যে অবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
তদবধি প্রভু কিছু হইলা সুস্থির॥
নিরবধি থাকে পিতা মাতার সমীপে।
দুঃখ পাসরয় যেন জননী জনকে॥
খেলা সমবরিয়া প্রভু যত্ন করি পড়ে।
তিলার্দ্ধেক পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে॥
একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়।
আর বার উলটিয়া সবারে ঠেকায়॥ (চৈঃ ভাঃ, আদি, ৬ষ্ঠ পঃ)

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

ভালদ্রব্য বিশ্বরূপ গৌরাঙ্গেরে আনে।
গৌরচন্দ্র না দেখিলে না জীএ পরাণে॥
বিশ্বরূপ বলেন নিমাই মোর প্রাণ। (চৈঃ মঃ, নদীয়া খঃ)

'উন্মাদ-বৈরাগ্যে' শচী মাতাকে বলিয়া বিশ্বরূপ কাটোয়া গিয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস নিলেন। কেশব ভারতীই “নাম থুইল তাঁর শ্রীশঙ্করারণ্য।” কেশব ভারতীয় নিকট সন্ন্যাস লওয়ার কথা এক জয়ানন্দ ব্যতীত আর কেহ বলেন না। লোচন বলেন—বিশ্বরূপ—

বেদান্ত সিদ্ধান্ত জানে সর্ব্ব ধর্ম্ম-কর্ম্ম।
বিষ্ণু ভক্তি বিণু সে না করে কোন কর্ম্ম॥ (চৈঃ মঃ, আদি খঃ)

লোচন এখানে বৃন্দাবন দাসের অনুগামী। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন যে বিশ্বরূপ সকল শাস্ত্রেই 'বিষ্ণু-ভক্তি' ব্যাখ্যা করিতেন। মিশ্রের মুখে

বলাইয়াছেন যে—"পড়ি সর্ব্বশাস্ত্র, জানিল সংসার সত্য নহে তিল মাত্র"। ইহা বেদান্তের মায়াবাদ। বিশ্বরূপের যখন 'ষোড়ষ বরিষ ভেল বয়ঃক্রম' তখন পিতা 'বিশ্বরূপে বিভা দিতে কন্যা বিচারিল'। ইহা শুনিয়া বিশ্বরূপ রাত্রি প্রভাতে বাম হাতে পুঁথি লইয়া গঙ্গা সন্তরণ করিয়া চলিয়া গেলেন। এবং 'গত মাত্র মহাশয় সন্ন্যাস করিলা'। কাটোয়া বা কেশব ভারতীর নামোল্লেখ নাই সত্য, কিন্তু উহা হওয়া অসম্ভব নয়।

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—বিশ্বরূপের যৌবন দেখিয়া মিশ্র পুত্রের বিবাহ দিতে মন কৈল। একথা শুনিয়া বিশ্বরূপ পালাইয়া গিয়া সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলেন। নিমাই পিতামাতাকে সান্ত্বনা দিলেন—'তবে প্রভু মাতাপিতা কৈল আশ্বাসন'—এবং বলিলেন—

আমিত করিব তোমা দুঁহার সেবন
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল পিতামাতার মন।

(চৈঃ চঃ, আদি—১৫পঃ)

কবিরাজ গোস্বামী বিশ্বরূপের চরিত্র ফুটাইবার চেষ্টা মাত্রও করেন নাই।

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে, এই সময় কেহ আসিয়া মিশ্রকে বলিল যে, নিমাই লেখাপড়াতে খুব ভাল।

বৃহস্পতি জিনিয়া হইব অধ্যয়নে
শুনিলেই সর্ব্ব অর্থ আপনে বাখানে
তান ফাঁকি বাখানিতে নারে কোন জনে।

শচীমাতা সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু মিশ্র বিমর্ষ হইলেন। তার কারণ? মিশ্র বলিলেন—

এহো পুত্র না রহিব সংসার ভিতর
এই মত বিশ্বরূপ পড়ি সর্ব্ব শাস্ত্র
জানিল সংসার সত্য নহে তিল মাত্র
অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাঞি
মূর্খ হই ঘরে মোর রহুক নিমাঞি।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৬অঃ)

শচীমাতা বলিলেন—

মূর্খেরে ত কন্যাও না দিবে কোন জনে।

আর জীবিকাই বা দরিদ্র ব্রাহ্মণের কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে?

মিশ্র বলিলেন—ঈশ্বর খাইতে দেন, বিদ্যা দেয় না।

সাক্ষাতেই এই কেন না দেখ আমাত
পড়িয়াও আমার ঘরে কেনে নাহি ভাত।

ভাতের কষ্ট হয়ত নিমাইয়ের পিতার ছিল সত্য, কিন্তু ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্য তাঁহার দারিদ্র্যকে সেদিন মর্য্যাদা দিত।

মিশ্র নিমাইকে ডাকিয়া স্পষ্ট বলিলেন—

আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক তোমার।

ইহা বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের প্রতিক্রিয়া। নিমাই দুঃখিত হইল; ফলে নিমাই আরো উদ্ধত হইল।

অন্তরে দুঃখিত প্রভু বিদ্যারসভঙ্গে
পুনঃ প্রভু উদ্ধত হইলা শিশু সঙ্গে।

নিমাইয়ের বাল্যজীবনে বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের ঘাতপ্রতিঘাত আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

তারপরে নিমাই যে সকল দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন উহাকে আমরা বাল্য দৌরাত্ম্যের দ্বিতীয় অধ্যায় নাম দিতে পারি। উহা আমাদের নিকট উপভোগ্য ও হাস্যকর, কিন্তু প্রতিবেশীদের নিকট মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল নিশ্চয়।

যাহা পায় তাহা ভাঙ্গে অপচয় করে
নিশা হইলেও প্রভু না আইসে ঘরে
কম্বলে ঢাকিয়া অঙ্গ দুই শিশুমিলি
বৃষপ্রায় হৈয়া চলেন কুতুহলী

রাত্রিতে—?

কারো ঘরে দ্বার দিয়া, বান্ধয়ে বাহিরে
লঘ্বী গুর্ব্বী গৃহস্থ করিতে নাহি পারে।

একদিন মিশ্র বাড়ীতে নাই। পড়িতে না পাইয়া নিমাই ক্রুদ্ধ। তিনি—

বিষ্ণু নৈবেদ্যের যত বর্জ্জ হাণ্ডীগণ
বসিলেন প্রভু হাঁড়ী করিয়া আসন।

একে শচীমাতার শুচিবাই ছিল, তাতে পুত্রকে ঐরূপ অশুচি স্থানে বর্জ্জহাঁড়ীর উপর বসা দেখিয়া তিরস্কার করিলেন। বলিলেন—

বর্জ্জহাঁড়ী, ইহা সব পরশিলে স্নান
এতদিনে তোমার এ না জন্মিল জ্ঞান।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৬অঃ)

নিমাই কাজের কথা তুলিলেন—

তোরা মোরে না দিস্ পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্রে জানিব কেমতে॥
মূর্খ আমি, না জানিয়ে ভালমন্দ স্থান।
সর্ব্বত্র আমার হয়—অদ্বিতীয় জ্ঞান।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৬অঃ)

বালক নিমাইএর জ্ঞানস্পৃহা ও চতুরতা—এই তুই আমরা দেখিতেছি।

তারপর নিমাই তর্ক তুলিলেন—

বিষ্ণুর রন্ধন-স্থালী কভু তুষ্ট নয়
সে হাঁড়ী পরশে আর স্থান শুদ্ধ হয়।

এই তর্কের মধ্যে আমরা পাই তুইটি বস্তু। ১ম, স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ। প্রচলিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। পরবর্ত্তীকালে ধর্ম্মপ্রচার ব্যপদেশে তিনি এইরূপ প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সমাজের অস্পৃশ্য অঙ্গের উপরে গিয়াই সমুন্নত শিরে, বক্ষে সিংহের সাহস লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

এখনো নিমাইয়ের উপবীত হয় নাই। নিমাইয়ের পড়িবার আদেশ মঞ্জুর হইল, তবে তিনি অশুচি স্থান হইতে উঠিয়া আসিলেন। দৃঢ়তা বালকের সহজাত সংস্কার।

পড়িতে পাইলা প্রভু বাপের আদেশে
হইলেন মহাপ্রভু আনন্দ বিশেষে।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৬অঃ)

তারপরে যজ্ঞোপবীতের কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন নিমাইয়ের বয়স ৯ বৎসর (১৪৯৪ খৃঃ—বৈশাখ, অক্ষয় তৃতীয়া)। নিমাই যজ্ঞসূত্র ধরিলেন।

হাতে দণ্ড কাঁধে ঝুলি শ্রীগৌর সুন্দর
ভিক্ষা করে প্রভু সর্ব্ব সেবকের ঘর।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত ব্যাকরণ শাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিৎ। তাঁর নিকট নিমায়ের পড়িতে ইচ্ছা হইল।

বুঝিলেন পুত্রের ইঙ্গিৎ মিশ্রবর
পুত্রসঙ্গে গেলা গঙ্গাদাস বিপ্রঘর।

নবদ্বীপের বহু অধ্যাপকের মধ্যে বালক নিমাই নিজেই নিজের অধ্যাপক বাছিয়া লইলেন। এইরূপে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট নিমাই ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলেন।

গুরুর যতেক ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন
পুনর্বার সেই ব্যাখ্যা করেন স্থাপন।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৭অঃ)

এই খণ্ডন আর স্থাপনের মধ্যে আমরা নিমাইয়ের তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় পাই। অধ্যাপক নিমাইকে সকল শিষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন। 'বসায়েন গুরু সর্ব্বপ্রধান করিয়া' 'সর্ব্ব শিষ্য শ্রেষ্ঠ করি করিলা পূজিত'। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট আরো ছাত্র পড়িত—শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীকমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ আদি যত। 'সভারে চালেন প্রভু ফাঁকি জিজ্ঞাসিয়া'। শ্রীমুরারি জাতিতে বৈদ্য, তাঁহার জাতি তুলিয়া নিমাই মর্ম্মান্তিক রহস্য করিল।

প্রভু বলে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়
লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী কর দড়।
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৯অঃ)

বিদ্যাবিলাসে নিমাইয়ের অহঙ্কারের পরিচয়ও আমরা পাইতেছি।

কেহ বলে এত কেন কর অহঙ্কার
প্রভু বলে জিজ্ঞাসহ যে চিত্তে তোমার।

বিদ্যাভ্যাসে নিমাইয়ের বিশেষ যত্ন দেখা গেল। ইহাও তাঁহার ছাত্রজীবনের একটা বৈশিষ্ট্য।

ভোজন করিয়া মাত্র প্রভু সেই ক্ষণে
পুস্তক লইয়া গিয়া বসেন নির্জ্জনে।

এগার বৎসর বয়সেই ব্যাকরণের মৌলিক টীকা আরম্ভ করিলেন।

আপনে করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৭অঃ)

ইহাকেই বলে প্রতিভা। মিশ্র তখনো জীবিত, কেননা নিমাইয়ের সূত্রের টিপ্পনী দেখিয়া—'আনন্দে ভাসে মিশ্র মহাশয়'।

তারপর একদিন মিশ্র শচীমাতাকে বলিলেন যে, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি—'নিমাঞ করেছে যেন শিখার মুণ্ডন'। শচীমাতা স্বামীকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন—তুমি চিন্তা করিও না, নিমাই ঘরে রহিবে। 'চিন্তা না করিহ ঘরে রহিবে নিমাই'। কেননা—

পুঁথি ছাড়ি নিমাই না জানে কোন কর্ম্ম—
বিদ্যারস তার হৈয়াছে সর্ব্বধর্ম্ম।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৭অঃ)

বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের ৫ বৎসর পর জগন্নাথ মিশ্র অন্তর্দ্ধান হইলেন (১৪৯৬ খৃঃ)। তখন নিমাইয়ের বয়স ১১ বৎসর। 'মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিলা বিস্তর'। বৃন্দাবনদাস এই শোকাবহ ঘটনা বিস্তারি বর্ণনা করেন নাই।

দুঃখ বড় এ সকল বিস্তার করিতে
দুঃখ হয় অতএব কহিল সংক্ষেপে।

দুঃখ হইবারই কথা। অগ্রজ গৃহত্যাগী, পিতা মৃত—বহু সন্তানের মধ্যে মাত্র একা নিমাই জীবিত, তা তিনিও নাবালক,—ঘরেও 'দরিদ্রতার প্রকাশ' দেখা যায়। তথাপি নিমাই মাতাকে সান্ত্বনা দিলেন—

শুন মাতা মনে কিছু না চিন্তহ তুমি
সকল তোমার আছে যদি আছি আমি।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৭অঃ)

পিতার মৃত্যুর পরেও একদিন নিমাই শচীমাতার সহিত ক্রোধের বশে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করিলেন্। কেবল হাত দিয়া প্রহার করিলেন না, এই যা রক্ষা। "জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন"। ব্যাপারটা অতি সামান্য। একদিন মায়ের কাছে গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় তৈল, আমলকি, মালা ও চন্দন চাহিলেন। ঘরে উহা ছিল না। শচীমাতা বলিলেন—দাঁড়াও, মালা আনিয়া দিতেছি। এইত আর যাবে কোথায়— "এখনে যাইবে তুমি মালা আনিবারে"। অমনি ক্রোধে ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘরের সমস্ত দ্রব্য ভাঙ্গিয়া ছুড়িয়া ফেলিলেন। পরে ঘরকে মারিতে আরম্ভ করিলেন—'দোহারিয়া ঠেঙ্গা পাড়ে গৃহের উপর'। ঘর ছাড়িয়া—'বৃক্ষেরে দেখিয়া, তাহার উপরে ঠেঙ্গা পাড়ে দোহারিয়া'। শচীমাতার অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়।

গৃহের উপান্তে শচী সশঙ্কিত হৈয়া
মহা ভয়ে আছেন যেহেন লুকাইয়া
তথাপিও জননীরে না মারিল গিয়া।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৭অঃ)

তারপরে ক্রোধের আতিশয্যে অঙ্গনে নিজেই গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। 'শ্রীকনক অঙ্গ হৈলা বালুকা বেষ্টিত'।

এই প্রকার ক্রোধ বালক নিমাই চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। পাষণ্ডী সংহারে, যবন রাজভীতি দূরীকরণে, জগাইমাধাই উদ্ধারকালে চক্র স্মরণে, চাঁদ কাজীর বাড়ী আক্রমণ ও লুণ্ঠনে—আমরা যুবক নিমাইয়ের মধ্যে এই ক্রোধের বিকাশ আরো দেখিতে পাইব।

জয়ানন্দ বলেন—'সুদর্শন গঙ্গাদাস দুই বিদ্যাগুরু'। আগে সুদর্শন পরে গঙ্গাদাস। সুদর্শন পণ্ডিতের নিকট কলাপ ব্যাকরণ পর্য্যন্ত নিমাই পড়িল। 'সটীক কলাপ পড়ে সভার ব্যাপক'। তারপর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট পড়িতে গেল।

নবদ্বীপের ভিতর পণ্ডিত গঙ্গাদাস
তাহার মন্দিরে কৈল বিদ্যার প্রকাশ
চন্দ্র সারস্বত কাব্য নাটকে
স্মৃতি, তর্ক, সাহিত্য, পড়িল একে একে।

(চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)

আর একদিন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে বসিয়া নিমাই সমপাঠীদের দম্ভ করিয়া বলিলেন—

কোন ব্যাটা আছে দেখোঁ ব্যাখ্যা মোর খণ্ডে
তার কান্ধে চড়িয়া টাকর মার মুণ্ডে।

এই অভদ্র, ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্য শুনিয়া কোন শিক্ষক ধৈর্য্য রাখিতে পারে?

ইহা শুনি গুরু মারে পুস্তকের বাড়ি

নিমাই?

কাঁদিয়া পুস্তক চিরি ক্ষিতিতলে পড়ি।

মিশ্র আসিয়া নিমাইকে কোলে করিয়া বাড়ী আনিলেন। বলিলেন, এই পুত্রের জন্য আমাকে নবদ্বীপ ছাড়িতে হইবে। পরের দিন গঙ্গাদাসকে অনেক বিনয় করিয়া মিশ্র নিমাইকে পুনরায় পড়িতে দিয়া আসিলেন। পুত্রের স্বভাব সম্বন্ধে একটি কথা বলিলেন—"আত্ম বৈ পরের বচন নাহি ধরে"। স্বভাবস্বাধীন নিমাই চরিত্রের ইহাও একটি বৈশিষ্ট্য।

জয়ানন্দ "গর্ভাষ্টমে যজ্ঞসূত্র দিলা বিশ্বম্ভরে।" রত্নাকর নাপিত ক্ষৌর করাইল। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী 'কর্ণে কহিল গায়ত্রী'।

কৃষ্ণসার চর্ম্মসূত্র মিথিলি প্রবন্ধে
বিল্ব বংশদণ্ড শুভক্ষণে দিল কান্ধে।

(চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)

তারপর 'হবিষ্যান্ন ভোজন করাইল মাতামহী'—অর্থাৎ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী।

সুদর্শন গঙ্গাদাস দুই বিদ্যাগুরু
আশীর্ব্বাদ দিতে আইল রত্নমালা ছিরু।

নিমাই ৭ দিন মৌনব্রতী হইয়া রহিলেন। তিনদিন শূদ্রের মুখ দেখিলেন না। সমপাঠীরা সব আসিলে নিমাই—

ঠারেতে কহিল মাএ করিঞা প্রবন্ধ
তিল মোঞা দুগ্ধ লাড়ু সবাকারে দেহ।

জয়ানন্দও দৌরাত্ম্যের একটি লম্বা ফর্দ্দ দিয়াছেন ঃ—

ক) একদিন গুরুগৃহে জলের কলসী ভাঙ্গিয়া দিয়া সকলের পুঁথি জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন—

গুরুগৃহে ভাঙ্গে কুম্ভ অনেক সকল
জলেতে ভাসিল যত পঢ়ুয়ার পুস্তক

খ) প্রত্যেক দেবমন্দিরে যাইয়া নানারকম দৌরাত্ম্য। দেবতা বা ঠাকুর বলিয়া যে সহজাত একটা ভয় বা সম্ভ্রম বা সংস্কার তা নিমাইয়ের আদৌ ছিল না। কোন দেবমূর্ত্তি প্রাঙ্গনে ফেলিয়া দেয়, কোন ঠাকুরের সিংহাসনে নিজে গিয়া বইসে, কোন মন্দিরে গিয়া দেবতার নৈবেদ্য খায়, কোন মন্দিরে গিয়া ভিতর হইতে দ্বার বদ্ধ করিয়া কোকিল বা পারাবত ডাকে।

গ) শ্রীধর দ্বিজ কিন্তু গরীব, কলার পাটুআ বেচিয়া খায়। অলক্ষিতে তার পয়সা চুরি করিয়া আনিয়া হয় শ্রীবাসের বাড়ী, না হয় গঙ্গাতীরে গর্ত্তে লুকাইয়া রাখে। বাড়ী নেয় না। পরে শ্রীধরকে ঐ পয়সা ফিরাইয়া দেয়। আর কত বলিব ? আরো অনেক আছে।

তারপর বিশ্বরূপের শোকে মিশ্রের জ্বর হইল। 'বিশ্বরূপ শোকে তার গাএ আইল জ্বর'। 'মহাবায়ু, কফ, ঊর্দ্ধশ্বাস, রক্তস্রাব' দেখা দিল। পরে 'বিপ্রগণ মেলি লৈল গঙ্গা অন্তর্জলে'। এদিকে নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়ীতে পুঁথি লিখিতে গিয়াছেন।

গুরুগৃহে গৌরাঙ্গ পুস্তক লেখেন জথা
রড়দিয়া হরিদাস ঠাকুর গেল তথা।
হরিদাস ঠাকুর বলেন কি পুঁথি লেখ
তোমার বাপ অন্তর্জলে ঝাট গিয়া দেখ।

(চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)

বৃন্দাবনদাস হরিদাস ঠাকুরকে এসময়ে নবদ্বীপ আনেন নাই জানিয়াও জয়ানন্দ হরিদাস ঠাকুরকে আনিয়াছেন। গদাধর পণ্ডিতের নিকট শুনিয়া জয়ানন্দ এইরূপ লিখিয়া থাকিবেন। নিমাই—

পুঁথি আছাড়িয়া গেল গঙ্গা অন্তর্জলে
করুণা করিয়া কান্দে পিতা করি কোলে
আমারে ছাড়িয়া বাপ তুমি জাহ কথা
কেমনে বঞ্চিব বাপ রহিব আমি কুথা।

(চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)

মিশ্র নিমাইকে আলিঙ্গন দিয়া হাতে ধরিলেন। বলিলেন, তোমাকে আমি জগন্নাথে সমর্পণ করিলাম; আমার এক কথা শুন—"তুমার মাএর জেন নহে অপমান"। তারপর নিমাই "পিতৃদেহ দাহন করিল কুতুহলে"। জয়ানন্দ মৃত্যু তারিখ দিতেছেন—"জৈষ্ঠ্য নিদাঘকালে কৃষ্ণাষ্টমী তিথি"। বালক নিমাই এক নিদারুণ আঘাত পাইলেন। দুঃখ হয় বলিয়া বৃন্দাবনদাস যাহা বর্ণনা করেন নাই জয়ানন্দ তাহা করিয়াছেন।

লোচন বলেন—নিমাই গঙ্গার ঘাটে বালকদের লইয়া বিষম দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে। মিশ্র ঘাটে গিয়া 'করে ধরি লইয়া আইলা আপন কুমার'। ঘরে আনিয়া অনেক ভৎর্সনা করিলেন—'কুবুদ্ধি করিয়া তু বুলিস অনুক্ষণ'। মিশ্র 'হাতে ছাট ধরি' নিমাইকে মারিতে উদ্যত হইলেন। নিমাই জননীর কোলে গিয়া লুকাইল, আর "না খেলাব না খেলাব ধীরে ধীরে বোলে'। শচীমাতা আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'না মারিহ পুত্র মোর নৈল ডরাইয়া'। নিমাই মূর্খ হইয়া থাক, পড়িয়া কাজ নাই।

না পঢ়ুক পুত্র মোর হউক মুরুখ
মুরুখ হৈয়া শত বরিখ জীউক

মিশ্র রাগ করিয়া বলিলেন—

মুরুখ হৈলে পুত্র জীবকে কেমনে
কেমনে ব্রাহ্মণ ইথে কন্যা দিবে দানে।

(চৈঃ মঃ, আদি খণ্ড)

লোচন স্পষ্ট বৃন্দাবনদাসের কথাই উল্টাইয়া লিখিয়াছেন।

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে, বিশ্বরূপ সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া সন্ন্যাসী হইল, অতএব নিমায়ের পড়িয়া কাজ নাই। মিশ্র বলেন—

মূর্খ হৈয়া ঘরে মোর রহুক নিমাঞ
শচী বোলে মূর্খ হৈলে জীবেক কেমনে
মূর্খেরে ত কন্যাও না দিবে কোন জনে।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৬ অঃ)

এত আক্ষরিক মিল যে, এসকল অপহরণ লোচন নিজে করিয়াছেন কি না সন্দেহ হয়।

লোচন নবম বৎসরে উপবীত দেওয়াইলেন (১৪৯৪ খৃঃ)—'নবম বরিখ পুত্রের যোগ্য সময়'। জয়ানন্দ বলেন, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী 'কর্ণে কহিল গায়ত্রী'। কিন্তু লোচন তা বলেন না লোচন বলেন—

"গৌরচন্দ্রের কর্ণে মন্ত্র কহে তার বাপ"

(চৈঃ মঃ, আদি খণ্ড)

লোচন নাগরীদের আনিয়াছেন—

নাগরীর গণ যত গৌরাঙ্গ বেঢ়িল
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা করিবারে মন কৈল।

নদীয়ানাগরীভাবের প্রচারক হিসাবে লোচনকে নাগরীদের বাদ দিলে চলে না।

লোচন বলেন, দৈবনির্ব্বন্ধে মিশ্রের জ্বর হইল। জাহ্নবীর তীরে নিয়া গিয়া নিমাই পিতার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—

আমারে ছাড়িয়া পিতা কোথা যাবে তুমি
বাপ বলি ডাক আর নাহি দিব আমি।
আজি দশদিগ শূন্য অন্ধকার মোরে।

(চৈঃ মঃ, আদি খণ্ড)

সত্যি সেদিন বালকের চক্ষে দশদিক অন্ধকার বোধ হইয়াছিল। মিশ্র বলিলেন—"রঘুনাথচরণে সপিলুঁ আমি তোমা"।

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—"তুমা সমর্পিল আমি প্রিয় জগন্নাথে"।

কবিরাজ গোস্বামী অধ্যয়ন লীলা সম্বন্ধে নূতন কিছুই লেখেন নাই।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত স্থানে পড়ে ব্যাকরণ
শ্রুত মাত্রে কণ্ঠে কৈল বৃত্তি সূত্রগণ
অল্পকালে হৈল পঞ্জী টীকাতে প্রবীণ
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন।

(চৈঃ চঃ, আদি—১৫পঃ)

উপনয়নের কোন কথাই কবিরাজ গোস্বামী লেখেন নাই। মিশ্রের পরলোক গমনের কথা—'কতদিন রহি মিশ্র গেলা পরলোকে'—মাতা ও পুত্রের শোক বাড়িল, বন্ধু ও বান্ধব আসি প্রবোধিলা।

গঙ্গার ঘাটে দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী খাঁটি সত্য কথা লিখিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ একটি বিশেষ সত্য ঘটনা লিখিয়াছেন, যাহা অপরে লেখেন নাই।

কভু শিশু সঙ্গে স্নান করিলা গঙ্গাতে
কন্যাগণ এলা তাহা দেবতা পূজিতে
গঙ্গাস্নান করি পূজা করিতে লাগিলা
কন্যাগণ মধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা
কন্যারে কহে আমা পূজ আমি দিব বর
গঙ্গাদুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর
আপনি চন্দন পরি পরে ফুলমালা
নৈবেদ্য কাড়িয়া খায় সন্দেশ চালুকলা
ক্রোধে কন্যাগণ কহে শুনহে নিমাই
গ্রাম সম্বন্ধে হওনা আমা সভার ভাই?
আমা সভার পক্ষে ইহা করিতে না জুয়ায়
না লহ দেবতা সাজ, না কর অন্যায়
প্রভু কহে তোমা সভা দিমু এই বর
তোমা সভার ভর্ত্তা হবে পরম সুন্দর
পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধন ধান্যবান
সাত সাত পুত্র হবে চিরায়ু মতিমান
বর শুনি কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ
বাহিরে ভর্ৎসনা করে, করি মিথ্যা রোষ,

কোন কন্যা পালাইল নৈবেদ্য লইয়া
তারে ডাকে কহে প্রভু সক্রোধ হইয়া
যদি নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপনী
বুড়া ভর্ত্তা হবে আর চারি যে সতিনি।

(চৈঃ চঃ, আদি—১৪পঃ)

বালিকার মনে ভয় হইল। কি জানিবা—'কোন কিছু জানে কিবা দেবাধিষ্ট হয়'।

ভয়ে নৈবেদ্য আনিয়া দিল। নৈবদ্য খাইয়া নিমাই—'তারে ইষ্টবর দিল'।

এই গেল সাধারণ দৌরাত্ম্য। ইহার মধ্যে একদিন একটা বিশেষ ঘটনা হইল।

একদিন বল্লভাচার্য্যকন্যা লক্ষ্মী নাম।
দেবতা পূজিতে এলা করি গঙ্গাস্নান
তারে দেখি প্রভু হইলা অভিলাষ মন
লক্ষ্মী চিত্তে সুখ পায় প্রভুর দর্শন
সাহজীক প্রীতি দুঁহা করিল উদয়
বাল্যভাবে ছন্ন তনু করিল নিশ্চয়
দুঁহা দেখি দুঁহা চিত্তে হইল উল্লাস
প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর
আমাকে পূজিলে পাবে অভিস্পীত বর
লক্ষী তার অঙ্গে দিল পুস্প চন্দন
মল্লিকার মালা দিয়া করিলা বন্দন।

(চৈঃ চঃ, আদি—১৪পঃ)

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, নিমাইয়ের এইরূপ চাপল্য দেখিয়া—'শচী জগন্নাথ দেখি হন ওলাহন'।

সুতরাং জগন্নাথ মিশ্র তখন জীবিত ছিলেন এবং নিমাইয়ের বয়স তখন ১১ বৎসর অতিক্রম করে নাই।

ইহার মধ্যে তিনটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১ম, কবিরাজ গোস্বামী গঙ্গার ঘাটে লক্ষ্মীর সহিত নিমাইয়ের দুইবার সাক্ষাৎ করাইলেন। মিশ্র

জীবিত থাকিতে একবার, ১৬ বৎসর বয়সে (১৫০১ খৃঃ) বিবাহের পূর্ব্বে আর একবার। বৃন্দাবনদাস মাত্র বিবাহের পূর্ব্বে একবার সাক্ষাৎ করাইয়াছেন। ইহা জানিয়াও যখন কবিরাজ গোস্বামী দুইবার সাক্ষাৎ করাইয়াছেন তখন নিশ্চয় তিনি ইহা কাহারো নিকট শুনিয়া লিখিয়াছেন। শুধু 'সাহজীক প্রীতি' বালকের মধ্যে উদয় করিবার জন্য নিছক কল্পনার আশ্রয় তিনি লইয়াছিলেন—ইহা কি সম্ভব? ৺২য়, অতি অল্প বয়সে বালিকা লক্ষ্মীকে দেখিয়া নিমাইয়ের 'হৈলা অভিলাষ মন', লক্ষ্মীরও নিমাইকে দেখিয়া 'চিত্তে হইল উল্লাস'। কবিরাজ গোস্বামী ইহাকে 'সাহজীক প্রীতি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আধুনিক মনো-বিজ্ঞান, প্রতিভাসম্পন্ন বালকের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক বলিয়াই সিদ্ধান্ত করে। ৺৩য়, লক্ষ্মী যদি পিতামাতাকে না বলিয়া সত্যিই নিমাইকে গঙ্গার ঘাটে পুস্পচন্দন আর মল্লিকার মালা দিয়া বন্দনা করিয়া থাকেন তবে লক্ষ্মী চরিত্রকেও কবিরাজ গোস্বামী খুব সূক্ষ্ম তুলিকায় অতি নিপুন হস্তে অঙ্কিত করিয়াছেন

তৃতীয় বক্তৃতা

[হুসেন সাহর রাজত্বকাল—নবদ্বীপ লীলার পটভূমি। নিমাইয়ের লক্ষ্মীর সহিত বিবাহ। বিভিন্ন চরিত গ্রন্থের বর্ণনা। জয়ানন্দ ও লোচনে নদীয়ানাগর ভাব বর্ণন, বৃন্দাবনদাসে ইহার প্রতিবাদ। নিমাইয়ের অধ্যাপক লীলা—বায়ু রোগ। ঈশ্বরপুরীর নবদ্বীপ আগমন। দিগ্বিজয়ীর পরাভব। অধ্যাপক নিমাইয়ের পূর্ব্ববঙ্গে গমন। সর্প দংশনে লক্ষ্মীর মৃত্যু। নিমাইয়ের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন—"সংসার অনিত্য", এই কথা বলিয়া মাতাকে সান্ত্বনা দান।]

ষোড়শ শতাব্দীর ১ম বৎসর (১৫০১ খৃঃ), নিমাই পণ্ডিত তখন ১৬ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন, বৃন্দাবনদাস ইহাকে 'প্রথম যৌবন' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—"ষোড়শ বৎসর প্রভু প্রথম যৌবন"। এই প্রথম যৌবনেই তিনি অধ্যাপক হইয়াছেন, মুকুন্দ সঞ্জয়ের বড় চণ্ডীমণ্ডপে—'বিস্তর পড়ুয়া তায় ধরে'—'সেই স্থানে গৌরাঙ্গের বিদ্যার সমাজ'। অর্থাৎ পৃথক টোল করিয়া ছাত্র পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। মুরারি গুপ্ত পর্য্যন্ত আশ্বাস দিয়াছেন—'চিন্তিব তোমার স্থানে শুন বিশ্বম্ভর'।

গৌড় বাংলার রাজধানী, নবদ্বীপ বাংলার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দুর্ভেদ্য দুর্গ। গৌড়েশ্বর ফতে সাহ ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে 'নবদ্বীপ উচ্ছন্ন কর' আজ্ঞা দিয়াছিলেন। 'ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে', 'প্রাণ ভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী'। সুতরাং গৌড়েশ্বর নবদ্বীপের প্রতি উদাসীন নহেন। ফতে সাহর রাজত্বকালে (১৪৮২—১৪৯০ খৃঃ) শিশু নিমাই জন্মগ্রহণ করেন—ইহা আমরা দেখিয়াছি। পরে পাঁচজন গৌড়েশ্বর গৌড়ের সিংহাসনে আরোহন করেন। এখন (১৫০১ খৃঃ) হুসেন সাহ গৌড়েশ্বর। তাঁহার রাজত্বকাল, ষ্টুয়ার্ট বলেন ১৪৯৯—১৫২০ খৃঃ। আবার ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলেন ১৪৯৩—১৫১৮ খৃঃ। যে মতেই হউক, নিমাই পণ্ডিত যখন ১৫০১ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক হইলেন তখন গৌড়ের সিংহাসনে আমরা হুসেন সাহকে দেখিতে পাই। অধ্যাপক হইবার পর যে ৮ বৎসর নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপ লীলা করিবেন তার পটভূমিকায় আমরা হুসেন সাহর রাজত্বকালই দেখিতে পাইব। নিমাই

প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রথম প্রচারমুখে রাজশক্তির সহিত যে সংঘর্ষ দেখা দিবে তাহাও হুসেন সাহর রাজত্বকালেই ঘটিবে। চাঁদ কাজী হুসেন সাহর দৌহিত্র। সাকর মল্লিক ও দবীর খাস (রূপ আর সনাতন) ইহারা দুইজনেই হুসেন সাহর দুই মন্ত্রী। হুসেন সাহর সহিত নিমাইপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব আন্দোলন ঘাতপ্রতিঘাতে তরঙ্গায়িত।

অধ্যাপক হইবার পরেই যুবক নিমাই লক্ষ্মীকে বিবাহ করিলেন। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—

দৈবে লক্ষ্মী একদিন গেলা গঙ্গাস্নানে।
গৌরচন্দ্র হেনই সময়ে সেই খানে॥
নিজ লক্ষ্মী চিনিয়া হাসিলা গৌরচন্দ্র।
লক্ষ্মীও বন্দিলা মনে প্রভুপদদ্বন্দ॥
হেন মতে দোঁহা চিনি দোঁহা ঘর গেলা।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৯অঃ)

নিমাই যে লক্ষ্মীকে দেখিয়া 'হাসিলা', লক্ষ্মী সে হাসির অর্থ বুঝিতে পারিল। কেননা "লক্ষ্মীও বন্দিলা মনে প্রভুপদদ্বন্দ"। ইহা বিবাহ নয়, ইহা পূর্ব্বরাগ। স্থান, স্নান উপলক্ষে গঙ্গার ঘাট। লক্ষ্মীর বয়স ১২ হইতে পারে। বালিকা হইলেও লক্ষ্মী নিতান্ত বালিকা নহেন। নিমাইকে স্বামীরূপে পাইতে লক্ষ্মী অভিলাষিণী। নিমাই যে লক্ষ্মীকে দেখিয়া হাসিল ইহাতেও নিমাইয়ের বিবাহ করিবার ইচ্ছাই প্রকাশ পাইল। প্রতিভাসম্পন্ন বালকদের অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ পায়।

কবিরাজ গোস্বামী নিমাইকে লক্ষ্মীর সহিত গঙ্গার ঘাটে দুইবার সাক্ষাৎ করাইয়াছেন, কিন্তু বৃন্দাবনদাস বিবাহের পূর্ব্বে মাত্র একবার সাক্ষাৎ করাইলেন। বৃন্দাবনদাসের জননী নারায়ণীর নিকট শুনিয়া বৃন্দাবনদাস লীলার এই অংশ লিখিয়া থাকিবেন। সুতরাং ইহা নির্ভরযোগ্য। আর নারায়ণী বিধবা হইলেও লক্ষ্মীর প্রায় সমবয়স্কা বলিয়াই ধারণা হয়।

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

একদিন গৌরচন্দ্র গেলা গঙ্গাতটে
লক্ষ্মী শঙ্কর পূজা করে কর পুটে।

পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ স্তুতি ভক্তি করি
প্রদক্ষিণ হয়্যা বর মাগে ধ্যান করি
আমার মানস সিদ্ধ কর ত্রিলোচন
নবদ্বীপচন্দ্র করুন পানি গ্রহণ
হেন কালে বাম চক্ষু নাচিতে লাগিল
নবদ্বীপচন্দ্র লক্ষ্মী সম্মুখে দেখিল

(চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)

ঘটনার ক্ষিপ্র সমাবেশে নাটকের মনোহারিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

হাসি বলে গৌরচন্দ্র দয়ানিধি
এতদিনে তোমারে প্রসন্ন হৈল বিধি।

(চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)

তারপর জয়ানন্দ লক্ষ্মীর একটা সুন্দর রূপ বর্ণনা দিয়াছেন। লক্ষ্মীর মাথায় খুব সুন্দর চুল ছিল—"লাবণ্য কেশ ভ্রমর গুঞ্জরে"। শেষে জয়ানন্দ নিজে বলিতেছেন—

চলহ মন্দিরে লক্ষ্মী মনের সন্তোষে
বিধি অনুকুল তোর বিভা এই মাসে।

(চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)

জয়ানন্দের কথায় বুঝা যায় যে, লক্ষ্মীকে গঙ্গার ঘাটে দেখিয়া তাহার এক মাস মধ্যেই নিমাই তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিশোরী লক্ষ্মীর রূপ নিমাইয়ের খুব মনে ধরিয়াছিল এবং নিজে উৎসাহী হইয়া প্রথম যৌবনের প্রেরণায় লক্ষ্মীকে দেখার এক মাস মধ্যেই তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহ খুব দ্রুত হইয়াছিল।

জয়ানন্দের লক্ষ্মী বলিতেছেন—"নবদ্বীপচন্দ্র করুণ পানিগ্রহণ"। ইহা সত্য হইলে কবিরাজ গোস্বামী বর্ণিত প্রথম বারের বালক বয়সের সাক্ষাৎ শুধু কবিকল্পনা নাও হইতে পারে।

লোচন বলিতেছেন—বল্লভ আচার্য্যের কন্যা, রূপে গুণে শীলে ত্রিজগতে ধন্যা; লক্ষ্মী তাঁর নাম।

গঙ্গাস্নানে যায় সেই সখীর সহিতে।
বিশ্বম্ভর হরি তা দেখিল আচম্বিতে॥

একদৃষ্টে চাহে প্রভু সুস্মিত আনন।
দেখিয়া জানিল তার জন্মের কারণ॥
লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহা ইঙ্গিতে বুঝিল।
প্রভু পাদপদ্ম দেবী শিরে করি নিল॥

(চৈঃ মঃ, আদি খণ্ড)

লোচনও বলিতেছেন যে, তরুণী লক্ষ্মী নিমাইয়ের 'একদৃষ্টে চাহিয়া' থাকার 'ইঙ্গিত' বুঝিল এবং নিজ হৃদয়ের ভাব গোপন না করিয়া ভাব ও ভঙ্গীতে সম্মতি জানাইল—"প্রভু পাদপদ্ম দেবী শিরে করি নিল"।

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে
বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে
দৈবে বনমালী ঘটক শচীস্থানে এলা
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন
লক্ষ্মীরে বিবাহ কৈল শচীর নন্দন।

(চৈঃ চঃ, আদি—১৫পঃ)

কবিরাজ গোস্বামীর মতে ইহা বিবাহের পূর্ব্বে দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎ। লক্ষ্মীকে দেখিয়া "প্রভু হৈলা অভিলাষ মন", লক্ষ্মীও "চিত্তে হৈল উল্লাস", "সাহজিক প্রীতি দুঁহা করিলা উদয়"—এ সকল প্রথমবারের সাক্ষাৎ। তখন নিমাইয়ের পিতা মিশ্র জীবিত ছিলেন। সুতরাং নিমাইয়ের বয়স তখন ১১ বৎসরের বেশী হইতে পারে না।

এই পূর্ব্বরাগ ব্যাপারে বৃন্দাবনদাস ও লোচন নির্ব্বাক অভিনয় করাইয়াছেন। নিমাইয়ের 'হাসি' ও 'এক দৃষ্টে চাহিয়া' থাকা এবং ইহার 'ইঙ্গিত' লক্ষ্মীর বোধগম্য হওয়ার মধ্যে পূর্ব্বরাগ সংযত ও সংহত হইয়া কাব্যে ফুটিয়াছে ভাল। জয়ানন্দ ও কবিরাজ গোস্বামী উভয়কে কথা বলাইয়াছেন। জয়ানন্দের লক্ষ্মী বলিতেছেন 'নবদ্বীপচন্দ্র করুণ পানিগ্রহণ', কবিরাজ গোস্বামী প্রথমবারের সাক্ষাতেই লক্ষ্মীকে দিয়া নিমাইয়ের কণ্ঠে মল্লিকার মালা পড়াইয়া দিলেন। শুধু পূর্ব্বরাগ নয়, একেবারে গন্ধর্ব্ব বিবাহ করাইয়া তবে ছাড়িলেন। অথচ এই ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট শুনিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ তাঁহারই সব চেয়ে কম হইয়াছে।

সম্ভবতঃ কবিরাজ গোস্বামী কল্পনা করিতে গিয়া অপরাপর চরিত লেখক হইতে একটু বেশী অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন। কল্পনা অশোভনীয় হয় নাই। তবে বৃন্দাবনদাস ও লোচনের চিত্র, জয়ানন্দ ও কবিরাজ গোস্বামীর চিত্র হইতে কাব্যের রূপান্তরে বেশী উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

এইবার লক্ষ্মীর বিবাহ। বৃন্দাবনদাস লিখিতেছেন—

ঈশ্বর ইচ্ছায় বিপ্র বনমালী নাম
সেইদিন গেলা তিঁহ শচী দেবী স্থান
নমস্কারি আইরে বসিলা বিপ্রবর
আসন দিলেন আই করিয়া আদর
আইরে বোলেন তবে বনমালী আচার্য্য
পুত্র বিবাহের কেহে না চিন্তহ কার্য্য

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৯অঃ)

তারপর লক্ষ্মীর নাম তুলিয়া প্রস্তাব শেষ করিলেন—

আইবোলে "পিতৃহীন বালক আমার
জীউক পরুক আগে তবে কার্য্য আর"
আইর কথায় বিপ্র রস না পাইয়া
চলিলেন বিপ্র কিছু দুঃখিত হইয়া
দৈবে পথে দেখা হইল গৌরচন্দ্র সঙ্গে
প্রভু বলে 'কহ গিয়াছিলে কোন ভিতে' ?
বিপ্র বোলে "তোমার জননী সম্ভাষিতে
তোমার বিবাহ লাগি বলিলাঙ তানে
না জানি শুনিঞা শ্রদ্ধা না কৈলেন কেনে"
শুনি তান বচন ঈশ্বর মৌন হৈলা

জননীরে হাসিয়া বোলেন সেইক্ষণে
"আচার্য্যেরে সম্ভাষা না কৈলে ভাল কেনে ?

পুত্রের ইঙ্গিত পাই শচী হরষিতা
আরদিনে বিপ্রে আনি কহিলেন কথা

শচী বোলে "বিপ্র কালি যে কহিলা তুমি
শীঘ্র তাহা করাহ, বলিল এই আমি"।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৯অঃ)

যেদিন নিমাই লক্ষ্মীকে গঙ্গার ঘাটে প্রাতে দেখিলেন সেই দিনই, একদিন পরেও নয়, সম্ভবতঃ বৈকালে বনমালী ঘটক শচীমাতার নিকট লক্ষ্মীর সহিত নিমাইয়ের বিবাহের প্রস্তাব পাড়িলেন। শচীমাতা মত করিলেন না—'পিতৃহীন বালক, জীউক পঢ়ুক আগে'। মায়ের অমত ঘটকের ফিবিবার পথেই নিমাই জানিতে পারিলেন এবং তখনি বাড়ী আসিয়া সেই প্রসঙ্গ তুলিলেন। পুত্রের লক্ষ্মীকে বিবাহের ইচ্ছা বুঝিয়া শচীমাতা ঠিক তার পরের দিন বনমালীকে পুনরায় ডাকিয়া আনিয়া শীঘ্র বিবাহ সম্পন্ন করিতে তাড়া দিলেন—'কালি যে কহিলা তুমি, শীঘ্র তাহা করাহ, বলিল এই আমি'। যেদিন নিমাই লক্ষ্মীকে দেখিল তার পরের দিনই বিবাহ স্থির হইয়া গেল। এই অত্যল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আবার মায়ের অমতরূপ বিঘ্নকেও অতিক্রম করিতে হইল। অবশ্য বিশেষ কোন বেগ পাইতে হইল না।

যদি নিমাই পিতৃহীন না হইত এবং পিতা অমত করিতেন, তবে হয়ত এত তাড়াতাড়ি বিবাহ হইতে পারিত না।

স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, লক্ষ্মীকে গঙ্গার ঘাটে দেখিয়া অবধি যুবক নিমাইয়ের সোয়াস্তি ছিল না। তখনই বনমালী ঘটকের বাড়ী ছুটিয়াছিলেন; বনমালী প্রথমে লক্ষ্মীর পিতার কাছে যান, পরে শচীমাতার কাছে আসেন। ফিরিবার পথে নিমাই ঘটকের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে দাঁড়াইয়াছিলেন, নিশ্চয়ই। এই প্রথম বিবাহ সম্পর্কে নিমাইয়ের আগ্রহ, ঘটকের বাড়ী ছুটাছুটি—চেষ্টার কৌশল সম্মুখে ছবির মত প্রত্যক্ষ করা যায়।

মনে পড়ে বিশ্বরূপের সন্ন্যাস। ঠিক এই বয়সেই মিশ্র বিশ্বরূপকে বিবাহ দিতে উদ্যোগ করায়, বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন; আর নিমাই ঠিক এই বয়সেই পিতৃহীন অবস্থায় লক্ষ্মীকে গঙ্গার ঘাটে দেখিয়া, মাতাকে নিজের ইচ্ছা জানাইয়া সম্মত করাইয়া বিবাহ করিলেন। উভয় ভ্রাতার সাদৃশ্য এবং স্বাতন্ত্র্য দুই-ই তুলনায় পাওয়া যায়। বিবাহের প্রস্তাব বিশ্বরূপকে বিক্ষিপ্ত করিল, আর নিমাইকে আকৃষ্ট করিল।

বল্লভাচার্য্য বনমালী ঘটককে বলিলেন যে, আমার কন্যার বহুভাগ্য যদি নিমাইয়ের মত পতি লাভ করে। তবে আমি নিতান্ত গরীব, কিছু দিতে পারিব না।

আমি সে নির্ধন কিছু দিতে শক্তি নাই
কন্যা মাত্র দিব পঞ্চ হরিতকী দিয়া।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৯ অঃ)

ইহা ভালবাসার বিবাহ, ইহাতে আবার যৌতুকের কথা কি ?

জয়ানন্দ ব্যাপারটাকে একটু বদলাইয়া অন্য রকমে বলিয়াছেন। গঙ্গার ঘাটে লক্ষ্মীকে দেখার পর নিমাই বনমালীকে গিয়া বলিল যে— আমার বাপ লক্ষ্মীর বাপকে প্রতিশ্রুতি দিয়া গিয়াছেন যে, লক্ষ্মীর সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। "অতএব ঘটক হৈয়া তুমি করহ সম্বন্ধ"। জয়ানন্দ স্পষ্ট বলিলেন যে, নিমাই নিজেই বনমালীর কাছে গিয়াছিলেন। বনমালী লক্ষ্মীর পিতার নিকট গেলেন। লক্ষ্মীর জননী শচীমাতার নিকট নিজে আসিলেন, বনমালী আসিলেন না। ইহা জয়ানন্দের নূতন কথা। জয়ানন্দ বনমালীকে শচীমাতার নিকট পাঠান নাই। কাজেই বৃন্দাবনদাস বর্ণিত শচীমাতার প্রথমে আপত্তি করা, পরে নিমাইয়ের সহিত শচীমাতার কথা—এ কিছুই জয়ানন্দ উল্লেখ করিলেন না।

তার পরিবর্ত্তে কন্যার দিকে একটা নূতন কথা আছে। লক্ষ্মীর মাতা শচীদেবীকে বলিলেন যে, আমার মেয়ে আগে তার বাপকে বলিত—

ওগো বাপু মোরে বিভা দিহ সেই বরে।
বকুল ফুলের মালা চাঁচর চুলে বান্ধে॥
কুঙ্কুমে মাজিয়া সরু পৈতা বাম কান্ধে।
এখন জিজ্ঞাসিলে লাজে করে হেট মাথা॥

(চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)

যুবক নিমাইয়ের কেশ ও বেশ বিন্যাসের একটি চিত্র আমরা পাইলাম। যদি কবিরাজ গোস্বামী বর্ণিত প্রথমবারের সাক্ষাৎ সত্যি ঘটনা হয়, তবে হয়ত লক্ষ্মী অতিবাল্যভাবে বাপকে ঐরূপ বলিয়া থাকিবে—'এখন জিজ্ঞাসিলে লাজে করে হেট মাথা'। এখন লক্ষ্মীর লজ্জা করিবার বয়স হইয়াছে।

লোচন বলিতেছেন, বনমালী আচার্য্য শচীমাতার কাছে গিয়া বিবাহের কথা পাড়িলেন—

তবে শচী দেবী শুনি কহিল বচন
এ অতি বালক মোর পঢ়ুক এখন।
পিতা শূন্য পুত্র মোর পঢ়ু কথোদিন।

(চৈঃ মঃ, আদি খণ্ড)

মায়ের অমতের কথা লোচনও বলিতেছেন, বনমালী ফিরিয়া যাইতেছেন—

হেনকালে বিশ্বম্ভর গুরু গৃহ হইতে
আসিতে হৈল দেখা আচার্য্য সহিতে।

লোচনের মতে লক্ষ্মীকে নিমাই ছাত্র অবস্থাতেই বিবাহ করিয়াছিলেন। শচীমাতার 'পড়ুক এখন' কথা হইতেও তা-ই প্রমাণ হয়। শচীমাতা বলিলেন, নিমাই এখন অতি বালক।

অবশ্য বৃন্দাবনদাসও শচীমাতার মুখে ঐ একি কথা বলাইয়াছেন, 'পড়ুক আগে'। কিন্তু বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় প্রমাণ হয় যে, নিমাই তখন অধ্যাপক এবং ১৬ বৎসর বয়সেই নিমাইয়ের প্রথম যৌবন প্রকাশ পাইয়াছে। অতি বাৎসল্যে শচীমাতা নিমাইকে বালক বলিয়া থাকিবেন।

বনমালীকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিমাই বলিলেন যে, এখন বিবাহ দিতে তার মায়ের মত নাই। নিমাই মুচকি হাসিয়া ঘরে করিলা গমন।

ঘরে আসি জননীরে বলে বিশ্বম্ভর।
বনমালী আচার্য্যের কি দিলা উত্তর॥
বিমনা দেখি যে আমি তারে পথে যাইতে।
সম্ভাষে না পাইল সুখ তাহার সহিতে॥
তারে অসন্তোষ কেন করিয়াছ তুমি।
বিমনা দেখিয়া চিত্তে দুঃখ পাইল আমি॥
শুনিয়া পুত্রের বাণী শচী সুচতুরা।
ইঙ্গিত জানিয়া কৈল হৃদয় সত্বরা॥

(চৈঃ মঃ, আদি খণ্ড)

বলাই বাহুল্য—

ত্বরায় মানুষ গেল আচার্য্য আনিবারে।

বনমালী আসিলেন। শচীমাতা আর কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া সোজা বলিলেন—

পূর্ব্বে যে কহিলে তার করহ উদ্যোগ

লোচনের নিমাই শচীমাতাকে বড় বেশী কথা বলিয়াছেন। ইহার প্রয়োজন ছিল না। কাব্যেও নয়, বাস্তবেও নয়। কেননা, শচী 'সুচতুরা' ছিলেন।

লোচন বৃন্দাবনদাসের স্পষ্ট অনুগমন করিয়াছেন। জয়ানন্দ তাহা আদৌ করেন নাই।

কবিরাজ গোস্বামী ঠিক পাঁচ ছত্রে কার্য্য সমাধা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার যাহা বলিবার তাহা প্রথমবারের সাক্ষাতেই বলিয়াছেন। এই প্রথমবারের সাক্ষাতেই সকল চরিত লেখক অপেক্ষা তাঁহার নূতন কথা।

দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে
বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে
দৈবে বনমালী ঘটক শচী স্থানে এলা।
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন
লক্ষ্মীরে বিবাহ কৈল শচীর নন্দন।

(চৈঃ চঃ, আদি—১৫পঃ)

এই পাঁচ ছত্রে না আছে ইতিহাস, না আছে কাব্য, না আছে প্রথম যৌবনের সে উদ্দাম গতিবেগ। মাথুর বিরহের বৃদ্ধ কবি জীবনের প্রথম যৌবন, যৌবনেব প্রথম প্রমত্ত তরঙ্গাভিনয় না পারিয়াছেন চক্ষু ভরিয়া দেখিতে, না পারিয়াছেন প্রাণ খুলিয়া লিখিতে।

বৃন্দাবনদাস ইহার পর বিবাহ যথারীতি সম্পন্ন করাইলেন।

তুলিলেন সভে প্রভুরে পৃথ্বী হইতে
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি সপ্তবার
জোড় হস্তে রহিলেন করি নমস্কার

দিব্য মালা দিয়া লক্ষ্মী প্রভুর চরণে
নমস্করি করিলেন আত্ম সমর্পণে

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৯অঃ)

তারপরে—

তবে যত কিছু কুল ব্যবহার আছে
পতিব্রতাগণে তাহা করিলেন পাছে।

এই পতিব্রতাগণকে যত সহজে বৃন্দাবনদাস ছাড়িয়া দিলেন, জয়ানন্দ ও লোচন এত সহজে তাহাদের ছাড়িয়া দিবেন না। না দিবার কারণ আছে। কেননা, গদাধরের প্রেরণায় জয়ানন্দ, আর নরহরির প্রেরণায় লোচন, নদীয়ানাগরী ভাবের ভজন পদ্ধতির প্রচারক। গদাধর ও নরহরি ইহার অন্যতম প্রবর্ত্তক।

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে, নিমাই গদাধরকে শচীমাতার নিকট এই বলিয়া পরিচয় করাইতেছেন—

শ্রীরামের সীতা জেন কৃষ্ণের রুক্মিণী
গৌরাঙ্গের গদাধর জানিহ জননী

(চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)

নবদ্বীপের কোন কোন আখড়া বাড়ীতে গৌর-গদাধর যুগল বিগ্রহের অদ্যাপি পূজা অর্চ্চনাদি হয়। গৌর-নরহরির যুগল বিগ্রহ দেখি নাই।

জয়ানন্দ বৃন্দাবনদাসের এই পতিব্রতাগণকে নিমাইয়ের বিবাহ দেখিবার জন্য আনিলেন ; গৌরাঙ্গ নাগর আর পতিব্রতারা নাগরী—

শতশত কুলবতী ধায় পতি ছাড়ি

*   *   *   *

এক রমণী বলে আমি অন্দরে জাব
আর রমণী বলে গঙ্গা সাগরে মরিব
আর রমণী বলে মোর কাঁপে সব গা,
আর রমণী বলে মুখে নাহি স্বরে রা
এক রমণী বলে মোর ননদিনী মরু
আর রমণী বলে স্বামী জে করু সে করু।

(চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)

আবার কোন যুবতী বলেন—

বিধিরে বলিব কি, কর‍্যাছে কুলের ঝি
আর তাহে নহি স্বতন্তরী
কহিতে সে লাজ ভয়ে, পরাণ রাখিল লয়ে
মদন আলসে পুড়্যা মরি
কহিব কাহার আগে, কহিলে পিরীতি ভাঙ্গে
জাতি কুল শীল নাহি থাকে।

(চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)

কুলবতীরা যে সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলেন, তাহাতেও যে সেদিন তাহাদের জাতি কুল শীল ছিল ইহাই যথেষ্ট।

লোচন বলিতেছেন, নিমাইয়ের অধিবাসে পাণি সহিবারে আসিয়া—

সভাকার কুলবতী ব্রত হৈল ভঙ্গ।
যুথে যুথে নাগরী চলিল বিপ্রবধু।

ইহারা সকলেই যুবতী এবং অতিশয় সুন্দরী। ইহাদের হাসিতে দামিনী কাঁপে, বচনে সুধা ক্ষরে। ইহারা হাস্যে পরিহাসে ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলিয়াছেন—

কেশ বেশ বসন ভূষণ অনুপম
হেরিলে হরিতে পারে মুনির পরাণ

সুন্দরীরা ভাবিতে লাগিলেন—

আসিতে যাইতে দাণ্ডাইব গোরা কাছে
গোরা অঙ্গ পরশ করিব সেই ছলে
কর্পূর তাম্বুল লহ যত্ন করি তাতে
কর করে ধরি গোরার দিব হাতে হাতে।

(চৈঃ মঃ, আদি খণ্ড)

কুলবতী পতিব্রতাদের আগে হইতেই এইরূপ মনের ভাব।

তারপর—

শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা করে কুল বধু মিলে
শ্রীঅঙ্গ পরশে সবে অবশ হইল

কেহ কেহ বাহু ধরি অবশ হইয়া
কেহ রহে উর্দ্ধতম শ্রীঅঙ্গ লেপিয়া
কেহ বুকে পদযুগ ধরিয়া আনন্দে
ভুজলতা বেঢ়য়া রাখিল পরবন্ধে
কেহ চিত্রার্পিত হৈয়া নেহারে গৌরাঙ্গে
কেহ জল দেই শিরে মদন তরঙ্গে
উন্মত্ত হৈয়া বহু হাসে ঘনে ঘন
সতীত্ব নাশিল হেরি গৌরাঙ্গ বদন।

মানসিক সতীত্ব নষ্টের কথাই লোচন বলিলেন।

তারপর—

বধূগণ বিকল হৈল রূপ দেখি
অস্থির নাগরীগণ শিথিল বসন
মথিল ভুজঙ্গকুল খগেন্দ্র যেমন,
চিত্ত হরি লইল সভার এক কালে
মানমীন ধরিয়া রাখিল রূপজালে
হরিণীনয়নীগণ গৌরাঙ্গ দেখিয়া
চলিতে না পারে সে ধরিতে নারে হিয়া
ভুরুভঙ্গী আকর্ষণে রঙ্গিনীর গণ
দুল্যমান হৃদয় করিছে অনুক্ষণ
পথ বিপথ কেহ না মানে রঙ্গিনী
অনঙ্গ তরঙ্গ রঙ্গে ধাইল অমনি।

(চৈঃ মঃ, আদি খণ্ড

তারপর বাসর ঘরে রাত্রি যাপন—

বসিল সুন্দরী সব প্রভুর সমীপে
অঙ্গের বাতাসে রঙ্গির অঙ্গ কাঁপে
কেহ অঙ্গ পরশে অনঙ্গ রঙ্গ ভরে
ঢলিয়া পড়িল রসে বিশ্বম্ভর ক্রোড়ে
নিজ দেহ পরশ লাগিয়া সবে যাচে।

(চৈঃ মঃ, আদি খণ্ড

লোচন একটা কৈফিয়ৎ দিতেছেন—

কোন সতী পতিব্রতা আছে পৃথিবীতে
বিশ্বম্ভর রূপ দেখি স্থির করে চিতে।

পতিব্রতারা এ পর্য্যন্ত চিন্তা করিলেন—

লক্ষ্মী এই সব অঙ্গ বিলাস করিব
আমরা ইহার কবে পরশ পাইব।
এই মনোরঙ্গে ঢঙ্গে প্রভাত হইল।

(চৈঃ মঃ, আদি খণ্ড)

শুধু নদীয়ানাগরী ভাব নয়, তখনকার সমাজের একখানি চিত্র জয়ানন্দ ও লোচন আঁকিয়াছেন। অঙ্কনপদ্ধতি তৎকালীন সাহিত্যের রুচি অনুসরণ করিয়াছে। জয়ানন্দ নাগরীদের মনের ভাব প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ভাল ফুটে নাই। লোচন এই সকল স্থানের বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বগামী। লোকে বিবাহে ভাড়াটিয়া বাইখেমটা নাচায়, লোচন কুলের বিপ্রবধূদের ধরিয়া নাচাইয়া দিলেন। লোচনের ছবি নির্জ্জলা আদিরস—নির্লজ্জ, কুরুচিপূর্ণ। কিন্তু লোচনে কবিত্ব আছে। লোচনের ছবি কাব্যে ফুটিয়াছে ভাল। লোচনের কবিত্ব সর্ব্বজনবিদিত।

বৃন্দাবনদাস নদীয়ানাগরী ভাবের সমর্থন ত করেনই নাই—স্পষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাসের সময় এই নাগরী ভাবের ভজন-পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল, নতুবা তিনি প্রতিবাদ করিবেন কেন? বৃন্দাবনদাস বলেন যে—যদিও সকল রকম স্তবই গৌরাঙ্গকে করা যায়, তথাপি তাঁহার স্বভাব অনুযায়ী স্তব করাই সঙ্গত। নিমাই 'সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোনে'। সুতরাং নাগর কল্পনা করিয়া তাঁহাকে স্তব করা, গৌরাঙ্গের স্বভাববিরুদ্ধ স্তব করা হয়।

অতএব যত মহামহিম সকলে
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে
যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে
তথাপিও স্বভাব সে গায় বুধজনে।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—১৩ অঃ)

লোচন লিখিয়াছেন—

গৌরাঙ্গের নয়ন সন্ধান শরাঘাতে
মানিনীর মানমৃগ পলায় বিপথে।

(চৈঃ মঃ, আদি খণ্ড)

ইহা বৃন্দাবনদাসের 'সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোনে'-র ইচ্ছা করিয়া প্রতিবাদ। 'অনঙ্গ রঙ্গভরে' কোন নাগরী 'ঢুলিয়া পড়িলা রসে বিশ্বম্ভর কোলে'—ইহাও বৃন্দাবনদাসের প্রতিবাদ। কেননা, বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

সবে পর স্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস।
স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন এক পাশ।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—১৩ অঃ)

কবিরাজ গোস্বামী কোন বর্ণনাই দেন নাই। তিনি গৌরাঙ্গ-নাগর ভাবের সমর্থক নহেন। কেননা, তিনি "রাধিকার ভাব কান্তি" গৌরাঙ্গকে দিয়া অঙ্গীকার করাইয়া "নিজ রস আস্বাদন" করাইবেন। গৌরাঙ্গনাগর ভাবের উহা বিরোধী। বৃন্দাবনদাস কোথায়ও কবিরাজ গোস্বামীর "রাধিকার ভাব কান্তি"-র সমর্থন ত দূরের কথা, উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। কবিরাজ গোস্বামী মাধুর্য্যের সবচেয়ে বড় কবি। কিন্তু প্রাকৃতের নয়, অপ্রাকৃতের। জীবনের নয়—তত্ত্বের। লোচন ও কবিরাজ গোস্বামীতে এই পার্থক্য দেখিতে পাই।

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্মীর সহিত দোলায় চড়িয়া সন্ধ্যাকালে নিমাই বাড়ী আসিলেন। শচীমাতা "পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন হৃষ্ট হঞা"। লক্ষ্মী ঘরে আসার পর "পূর্ব্ব প্রায় দারিদ্র্য দুঃখ তত নাই"।

এই লক্ষ্মী বধূ আসি গৃহে প্রবেশিলে
কোথা হৈতে না জানি আসিয়া সব মিলে।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৯ অঃ)

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে, শচী ঠাকুরাণী—

লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল পুত্রবধূ মুখে।

লোচন লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্মীর সহিত 'মনুষ্যের যানে' চড়িয়া নিমাই বাড়ী আসিলেন। শচীমাতা—

পুত্র মুখে চুম্ব দেই বধূ মুখ চাঞা।
বধূ মুখে চুম্ব দেই পুত্র নিরখিয়া ॥

(চৈঃ মঃ, আদি খণ্ড)

কবিরাজ গোস্বামী এসব কিছুই লেখেন নাই।

লক্ষ্মীকে বিবাহের পর বৃন্দাবনদাস যে সকল ঘটনা পর পর বর্ণনা করিয়াছেন প্রথমে তাহাই অনুসরণ করিয়া, পরে অপর চরিত লেখকদের সহিত মিলাইয়া দেখিব।

(১) নিমাই এখন তরুণ অধ্যাপক—

অধরে তাম্বুল দিব্য বাস পরিধান
সর্ব্বদায়ে পরিহাস মূর্ত্তি বিদ্যাবলে
সহস্র পঢ়ুয়া সঙ্গে যবে প্রভু চলে
পণ্ডিত সকল দেখে যেন বৃহস্পতি।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৯ অঃ)

(২) নবদ্বীপের কতিপয় কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবেরা আশা করিয়াছিলেন, কেন জানি না, নিমাই পণ্ডিত কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব হইবেন। তাঁহারা নিরাশ হইলেন। কেননা, নিমাই কেবল বিদ্যাচর্চ্চাই করেন, কৃষ্ণভক্তি তাহাতে দেখা যায় না।

বৈষ্ণবেরা—

হরিষ বিষাদ হই মনে ভাবে সব
হেন দিব্য শরীরে না হয় কৃষ্ণরস
কি করিব বিদ্যায় হৈলে কাল বশ
সাক্ষাতেও প্রভু দেখি কেহ কেহ বোলে
কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যাভোলে।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৯ অঃ)

বিকাল হইলে ভাগবতগণ অদ্বৈতের বাড়ীতে একত্র হন। মুকুন্দ সেখানে কৃষ্ণ বিষয়ে গান গায়। যেই মাত্র গান আরম্ভ হয়, আর "কেবা পড়ে কোন ভীত"।

(৩) নিমাই বৈষ্ণবদের দেখিলে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করেন। শাস্ত্রীয়

কূট তর্কের নাম ফাঁকি। বৈষ্ণবেরা তর্ক করেন না। ফাঁকিতে তাঁদের বড় ভয়। নিমাই পরিহাসপ্রিয়।

দেখিলেই মুকুন্দেরে ধরেন আপনে
প্রভু জিজ্ঞাসেন ফাঁকি, বাখানে মুকুন্দ
প্রভু বলে কিছু নহে, আর লাগে দ্বন্দ্ব
শ্রীবাসাদি দেখিলেও ফাঁকি জিজ্ঞাসেন
মিথ্যাবাক্য ব্যয় ভয়ে সভে পালায়েন
যদি কেহো দেখে প্রভু আইসেন দূরে
সভে পালায়েন ফাঁকি জিজ্ঞাসার ডরে
ফাঁকি বিনু প্রভু কৃষ্ণকথা না জিজ্ঞাসে।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৯ অঃ)

একদিন—

মুকুন্দ যায়েন গঙ্গাস্নান করিবারে
প্রভু দেখি আড়ে পলাইল কথোদূরে

নিমাই গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

এ ব্যাটা আমারে দেখি পালাইলা কেনে ?

তারপর নিজেই বলিলেন—

এ ব্যাটা পঢ়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র
পাঁজী বৃত্তি টীকা আমি বাখানিয়ে মাত্র
আমার সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন
অতএব আমা দেখি করে পলায়ন।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৯ অঃ)

অধ্যাপক নিমাইয়ের মানসিক বিকাশের পথে ইহা একটি অবস্থা। প্রথম হইতেই তিনি কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন না।

(৪) অপর বৈষ্ণবদের উপর পাষণ্ডীদের খুব উৎপীড়ন ও বাক্য-জ্বালা চলিতেছে।

শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস
কেহ বোলে সব পেট পুরিবার আশ

কেহ বোলে জ্ঞান যোগ এড়িয়া বিচার
উদ্ধতের প্রায় নৃত্য এ কোন ব্যাভার ?
কেহ বোলে কত বা পড়িলু ভাগবত
নাচিব কাঁদিব হেন না দেখিলুঁ পথ।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৯ অঃ)

বিশেষ করিয়া শ্রীবাসের উপর বাক্যজ্বালা—

শ্রীবাস পণ্ডিত চারি ভাইর লাগিয়া
নিদ্রা নাহি যাই ভাই ভোজন করিয়া
ধীরে ধীরে কৃষ্ণ বলিলে কি পুণ্য নহে
নাচিলে কাঁদিলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে ?

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৯ অঃ)

তারপর—

সকল বৈষ্ণব মিলি অদ্বৈতের স্থানে
পাষণ্ডীর বচন করেন নিবেদনে
শুনিয়া অদ্বৈত হয় ক্রোধ অবতার
'সংহারিমু সব' বলি করয়ে হুঙ্কার
আসিতেছে এই মোর প্রভু চক্রধর।
করাইমু কৃষ্ণ সর্ব্ব নয়ন গোচর।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৯ অঃ)

পূর্ব্বাপর অদ্বৈত সকল বৈষ্ণবদের আশ্বাস দিয়া আসিতেছেন যে, পাষণ্ডীদের সংহার করিবার জন্য হাতে চক্র লইয়া স্বয়ং কৃষ্ণ আসিতেছেন। বৈষ্ণবেরাও তাহা বিশ্বাস করিতেছেন। কিন্তু নিমাই পণ্ডিতই যে সেই চক্রধর কৃষ্ণ, একথা তখনো তাঁহারা ধারণা করিতে পারেন নাই।

(৫) ঠিক এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটিল, যাহা বৃন্দাবনদাস ছাড়া আর কেহ লেখেন নাই। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিয়া অদ্বৈতের বাড়ীতে উঠিলেন। ঈশ্বরপুরী অদ্বৈতের গুরুভ্রাতা, কেননা অদ্বৈতও মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। "মাধবেন্দ্রপুরীর কথা অকথ্য কথন, মেঘ দেখিলেই তিনি হ'ন অচেতন"। "যত প্রেম মাধবেন্দ্রপুরীর শরীরে, সন্তোষে দিলেন সব ঈশ্বরপুরীরে"। আবার 'নিত্যানন্দ মহাশয়'ও

মাধবেন্দ্রের প্রতি 'গুরু বুদ্ধি' করিতেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীগৌরচন্দ্র বারবার বলিয়াছেন—'ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার'। মাধবেন্দ্র শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হইলেও ভক্তিরসের আদি প্রবর্ত্তক।

একদিন পড়াইয়া আসিতে পথে ঈশ্বরপুরীর সহিত নিমাইয়ের সাক্ষাৎ হইল।

ভিক্ষা নিমন্ত্রণ প্রভু করিয়া তাঁহানে
মহাদরে গৃহে লই চলিল আঁপনে
মাস কত গোপীনাথ আচার্য্যের ঘরে
রহিলা ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ পুরে

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৯ অঃ)

ঈশ্বরপুরীকে দেখিবার জন্য অনেকেই যায়—

প্রভুও দেখিতে নিত্য চলেন আপনে।

এই ঈশ্বরপুরীকে 'নিত্য—মাস কত' ধরিয়া দেখিতে যাওয়ার গুরুত্ব খুব বেশী।

ঈশ্বরপুরী একদিন সুযোগ বুঝিয়া অধ্যাপক নিমাইকে বলিলেন যে, আমি 'কৃষ্ণের চরিত' পুঁথি করিয়াছি। তুমি যদি বইখানা একবার দেখিয়া দাও—'সকল বলিবা কোথা থাকে কোন দোষ'। নিমাই পুঁথি দেখিয়া বলিলেন, ভক্তের বর্ণনায় কোন দোষ থাকে না। কেননা, জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী। ঈশ্বরপুরীকে নিমাই ভক্ত মাত্র বলিলেন। পরে একদিন ব্যাকরণ শাস্ত্র লইয়া তর্ক হইল। তর্কের পরের দিন নিমাই আসিলে ঈশ্বরপুরী বলিলেন—

যে ধাতু পরস্মৈপদী বলি গেলা তুমি
তাহা এই সাধিল আত্মনেপদী আমি।

নিমায়ের হার হইল। নিমাই প্রতিবাদ করিলেন না। শাস্ত্রীয় তর্কে এই প্রথম নিমাইকে পরাজয় স্বীকার করিতে দেখা গেল।

প্রতিদিন দুইচারিদণ্ড নিমাই ঈশ্বরপুরীর সহিত শাস্ত্রালাপ করিতেন।

তারপর ঈশ্বরপুরী দেশান্তরে ভ্রমণে চলিয়া গেলেন। ঈশ্বরপুরী নিজেকে "শূদ্রাধম" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

বোলেন ঈশ্বরপুরী আমি শূদ্রাধম।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৯ অঃ)

ঈশ্বরপুরীর সহিত নবদ্বীপে সাক্ষাৎ, অধ্যাপক নিমাইয়ের জীবন ইতিহাসে পরিবর্ত্তন মুখে এক অতি বড় ঘটনা। অপর চরিত লেখকেরা ইহার যথাযথ উল্লেখ না করিয়া ভুল করিয়াছেন।

(৬) ঈশ্বরপুরী চলিয়া গেলে, মুকুন্দের সহিত অলঙ্কার ও গদাধরের সহিত ন্যায়ের তর্ক নিমাই আবার জুড়িয়া দিলেন। আবার ফাঁকি জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিলেন। আবার বৈষ্ণবেরা দুঃখ করিল।

মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাই
কৃষ্ণ না ভজেন সবে এই দুঃখ পাই।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—১০ অঃ)

শ্রীবাসাদিকে দেখা হইলে নিমাই নমস্কার করেন। তাঁহারাও কৃষ্ণে মতি হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। বস্তুতঃ এইকালে অ-বৈষ্ণব একটা মানসিক অবস্থা নিমাই পণ্ডিতের ছিল, এরূপ মনে করিবার প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখা যায়।

(৭) এই সময় একটা ব্যাধি আসিয়া নিমাইকে আক্রমণ করিল। ব্যাধিটি বায়ুরোগ। বৃন্দাবনদাস ইহাকে প্রভুর ছলনা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা নয়, ইহা সত্যিকার ব্যাধি। কেহ বলে 'দানব অধিষ্ঠান' হইয়াছে, কেহ বলে 'ডাকিনীতে' ধরিয়াছে—কেহ বলে সর্ব্বদাই অতিরিক্ত কথা বলেন কাজেই 'বায়ু' হইয়াছে। 'সদাই করেন বাক্যব্যয়, অতএব হৈল বায়ু জানিহ নিশ্চয়'।

বায়ুর কথা জয়ানন্দ সকলের আগে বলিয়াছেন। পৈতা হইবার কালে ৯ বৎসর বয়সের সময়েই বায়ু রোগ দেখা দিয়াছিল।

কেহ বলে হবিষ্যান্নে বায়ু জন্মিল
কেহ বলে পঢ়িতে পঢ়িতে বায়ু জন্মে।

(চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)

বৃন্দাবনদাস যে সময়কার কথা বলিতেছেন (১৫০২ খৃঃ) জয়ানন্দ তাহার ৮ বৎসর পূর্ব্বের (১৪৯৪ খৃঃ) কথা বলিতেছেন। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

বিষ্ণুতৈল নারায়ণতৈল দেন শিরে
বহুবিধ পাকতৈল সবে দেন শিরে

অধ্যাপনাও চলিতেছে—

পরম সুগন্ধি পাকতৈল প্রভু শিরে
কোন পুণ্যবন্ত দেয়, প্রভু ব্যাখ্যা করে।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—১০অঃ)

এই ব্যাধির আক্রমণ সময়ে—

ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি হয়
হেন মূর্চ্ছা হয়, লোক দেখি পায় ভয়

জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর কবিরাজ গোস্বামী বর্ণিত দিব্যোন্মাদের অবস্থাতেও দেহের এই রকম বিকৃত লক্ষণ আমরা দেখিতে পাইব।

বিশেষজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন, বায়ুরোগে অলৌকিক কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয়।

(৮) পণ্ডিত ব্যক্তিরা সাধারণতঃ কুনো হ'ন, ঘরের বাহির হন না। কিন্তু অধ্যাপক নিমায়ের স্বভাব ইহার বিপরীত। তিনি নবদ্বীপে সকল শ্রেণীর লোকের সহিত তাহাদের বাড়ীতে গিয়া অবাধে মিশিতেন। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—তন্তুবায়, গোপবৃন্দ, বণিক, মালাকার, তাম্বুলী, শঙ্খ বণিক—

এই মতে নবদ্বীপে যত নাগরীয়া
সবার মন্দিরে প্রভু বুলেন ভ্রমিয়া।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—১০অঃ)

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নেতাকে শুধু গ্রন্থকীট হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে চলে না। সকল শ্রেণীর লোককেই আকর্ষণ করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা নিমাই চরিত্রের বিশেষত্ব।

(৯) বৃন্দাবনদাস পুনরায় অধ্যাপনার কথা উল্লেখ করিয়া সেই সঙ্গে নিজের একটা আক্ষেপোক্তি জুড়িয়া দিয়াছেন।

অধ্যাপক প্রতি সব কটাক্ষ করিয়া
ব্যাখ্যা করে প্রভু গঙ্গা সমীপে বসিয়া।

প্রতিদিন দশবিশ নূতন ছাত্র নিমায়ের কাছে পড়িতে আসিতেছে—

কত বা মণ্ডলী হই পড়ে ঠাঞি ঠাঞি
প্রতিদিন দশ বিশ ব্রাহ্মণ কুমার
আসিয়া প্রভুর পায় করে নমস্কার
পণ্ডিত আমরা পড়িবাঙ তোমাস্থানে।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—১০অঃ)

এই কথা লিখিতে গিয়া বৃন্দাবনদাস দুঃখ করিতেছেন যে, যদি তিনি ঐ সময় জন্মিয়া নিমাই পণ্ডিতের ছাত্র হইয়া পড়িতে পাইতেন।

কিন্তু—

হইল পাপীষ্ঠ জন্ম না হইল তখনে
হইলাম বঞ্চিত সে সুখ দরশনে।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—১০অঃ)

ইহার অর্থ, ১৫০২ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবনদাসের জন্ম হয় নাই এবং ইহা নয় যে, প্রভুর তিরোধানের (১৫৩৩ খৃঃ) পর তাঁহার জন্ম হইয়াছে। বরং "না হইল তখনে"—এই কথা হইতে বুঝা যায় যে, ইহার কাছাকাছি অল্প কয়েক বৎসর পরেই বৃন্দাবনদাসের জন্ম হইয়াছে। যদি আর কয়েক বৎসর আগে জন্ম হইত—এই ত আক্ষেপের হেতু।

(১০) এই সময় নবদ্বীপে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিল। খুব বড় পণ্ডিত। "গৌড়, তিরহুত, দিল্লী, কাশী, গুজরাট, বিজয়নগর, কাঞ্চী, পুরী, হেলঙ্গ, তৈলঙ্গ, উড্র" দেশের পণ্ডিতদের তিনি পরাজিত করিয়াছেন। গঙ্গার ঘাটে নিমাইয়ের সঙ্গে তাঁহার শাস্ত্রবিচার হইল। দিগ্বিজয়ী গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করিয়া একটি স্তব রচনা করিয়া দ্রুত বলিয়া গেলেন। "প্রভু বলে এ সকল শব্দ অলঙ্কার,"—"দুষিলেন আদি মধ্য অন্তে তিন স্থানে"। দিগ্বিজয়ী ভাবিয়াছিলেন যে, নিমাই "শিশু শাস্ত্র ব্যাকরণ পড়ায়" মাত্র। কিন্তু নিমাই পণ্ডিত যে তাঁহার রচিত স্তবের এতগুলি আলঙ্কারিক দোষ উদ্ঘাটন করিবেন, ইহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। দিগ্বিজয়ীর পরাভব হইল। ইহা খুব কোন বড় শাস্ত্রীয় বিচার নয়। কিন্তু ইহাতে সাধারণের মধ্যে নিমাইয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আরো বাড়িয়া গেল।

শিষ্যগণ সহিত চলিল প্রভু ঘর
দিগ্বিজয়ী বড় হৈলা লজ্জিত অন্তর।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—১১ অঃ)

(১১) নিমাই অতিশয় দয়ালস্বভাব। দুঃখী দেখিলে "অন্ন বস্ত্র কড়ি পাতি দিয়া দেন"। নিমাই অতিথিসেবা ভালবাসিতেন। "কোন দিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ"। জননীরে বলিয়া পাঠান—"কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ঝাট করিবারে"।

তবে লক্ষ্মীদেবী গিয়া পরম সন্তোষে
রাঁধেন বিশেষ তবে প্রভু আসি বৈসে
সন্ন্যাসীগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া
তুষ্ট করি পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—১২ অঃ)

উষাকাল হইতেই লক্ষ্মী যত গৃহকর্ম্ম করেন—

দেবগৃহে করেন যত স্বস্তিক মণ্ডলী।
শঙ্খ চক্র লিখেন হইয়া কুতূহলী॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ সুবাসিত জল।
ঈশ্বর পূজার সজ্জা করেন সকল॥

(চৈঃ ভাঃ, আদি—১২ অঃ)

ইহা অপেক্ষাও "শচীর সেবায় তাঁর মন"। লক্ষ্মীর চরিত্র দেখিয়া নিমাই "মুখে কিছু না বলেন সন্তোষ অন্তর"। পরম আনন্দে লক্ষ্মীকে লইয়া নিমাইয়ের দিন কাটিতেছিল।

জয়ানন্দ নিমাইয়ের পিতার জীবিতকালেই যবন হরিদাসকে নবদ্বীপ আনিয়াছেন। মিশ্রের মৃত্যুর পরেই গয়াগমন করাইয়াছেন—তারপরে লক্ষ্মীর বিবাহ। অপর চরিত লেখকদের সহিত আদৌ মিল নাই।

লোচন অবশ্য জয়ানন্দের মত মিশ্রের মৃত্যুর পরেই এবং লক্ষ্মীর বিবাহের পূর্ব্বে নিমাইকে গয়া পাঠান নাই। কিন্তু বৃন্দাবনদাস লক্ষ্মীর বিবাহের পর এবং পূর্ব্ব বঙ্গ গমনের পূর্ব্বে দুই বৎসর কালের যে জীবন্ত ইতিহাস দিয়াছেন তাহা জয়ানন্দ বা লোচন কেহই দেন নাই। আর কবিরাজ গোস্বামী ত এসকল লীলা লিখিবার চেষ্টাই করেন নাই।

কবিরাজ গোস্বামী দিগ্বিজয়ীকে আনিয়াছেন বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিবাহের পরে।

তবে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী পরিণয়
তবে ত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ী জয়।

(চৈঃ চঃ, আদি—১৬ পঃ)

যেখানেই কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনদাসকে জ্ঞানতঃ অতিক্রম করিয়াছেন, সেখানে এমন কোন যুক্তি বা ইতিহাস দেন নাই যাহাতে প্রমাণ হয় যে, বৃন্দাবনদাসের ভ্রম তিনি সংশোধন করিতেছেন। অথচ বৃন্দাবনদাসকে তিন শুধু একস্থানে অতিক্রম করেন নাই; বহুস্থানে করিয়াছেন।

দিগ্বিজয়ী নিমাইকে প্রথমে মনে অবজ্ঞা করিয়াছিল। বলিল, তুমি অতি বাল্য-শাস্ত্র ব্যাকরণ পড়াও, তাও আবার কলাপ ব্যাকরণ। গঙ্গার স্তব দিগ্বিজয়ী করিয়া বলিল—

ব্যাকরণী তুমি নাহি পড় অলঙ্কার
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার।

(চৈঃ চঃ, আদি—১৬ পঃ)

নিমাই পাঁচটি অলঙ্কার দোষ দেখাইয়া দিলেন—"পঞ্চদোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার"। দিগ্বিজয়ী ভাবিয়াছিল যে—যেহেতু নিমাই ব্যাকরণী, সুতরাং অলঙ্কার জানেন না। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। বৃন্দাবন-দাস লিখিয়াছেন, মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি মুকুন্দের সহিত অলঙ্কার নিয়া আর গদাধরের অহিত ন্যায়শাস্ত্র নিয়া তর্ক করিয়াছিলেন। জয়ানন্দও লিখিয়াছেন—

চন্দ্র সারস্বত নব কাব্য নাটকে
স্মৃতি তর্ক সাহিত্য পঢ়িল একে একে

(চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)

বৃন্দাবনদাস ও জয়ানন্দ অযথা মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই।

এইবার অধ্যাপক শিরোমণি নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্ব বঙ্গে গমন করিতেছেন। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে, বঙ্গদেশ নিমাইয়ের দেখিতে

ইচ্ছা হইয়াছিল। "বঙ্গদেশ দেখিতে হৈল ইচ্ছা তান"। জননীরে বলিলেন, "কতদিন প্রবাস করিব মাতা আমি"; লক্ষ্মীকে বলিলেন, "মায়ের সেবন তুমি কর নিরন্তর"। নিমাই একাকী গেলেন না, সঙ্গে "শিষ্যবর্গ লৈয়া" চলিলেন।

কতদিনে আইলেন পদ্মাবতী তীরে

পদ্মার 'তরঙ্গ শোভা,' 'পুলিনে উপবন' দেখিয়া কৃতুহলে—"গণ সহ স্নান করিলেন সেই জলে"। তারপর "পদ্মাবতী তীরে রহিলেন গৌরচন্দ্র"।

নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি
আসিয়া আছেন সর্ব্বদিকে হৈল ধ্বনি।

পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা সকলে আসিয়া নিমাইকে নমস্কার করিয়া কহিলেন—

আমা সভাকার মহাভাগ্যোদয় হইতে।
তোমার বিজয় আসি হৈল এদেশেতে॥
মূর্ত্তিমন্ত তুমি বৃহস্পতি অবতার।
তোমার সদৃশ অধ্যাপক নাহি আর॥
সভে এক নিবেদন করিয়ে তোমারে।
বিদ্যা দান কর কিছু আমা সভাকারে॥

(চৈঃ ভাঃ, আদি—১২ অঃ)

উদ্দেশে আমরা সভে তোমার টিপ্পনী।
লই পড়ি, পড়াই শুনহ দ্বিজমনি॥

নিমাই পূর্ব্ব বঙ্গে অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন—

দুই মাসে সভেই হইলা বিদ্যাবান॥
কত শত শত জন পদবী লভিয়া।
ঘরে যায় আর কত আইসে শুনিয়া॥

(চৈঃ ভাঃ, আদি—১২ অঃ)

দুইটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার বিষয়—১ম, নিমাইয়ের ব্যাকরণের টীকা তাঁহার গমনের পূর্ব্বেই পূর্ব্ব বঙ্গের অধ্যাপকেরা পাইয়া পড়িতেছেন ও ছাত্রদের পড়াইতেছেন। ইহা হইতে হুসেন সাহের রাজত্বকালে পশ্চিম

বঙ্গ হইতে পূর্ব্ব বঙ্গে বিদ্যাচলাচলের একটা ধারণা হয়। নূতন ব্যাখ্যা বাহির হইবামাত্র উহা গৌড় বঙ্গের প্রসিদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্রে ছড়াইয়া পড়িত। ২য়, নিমাই পণ্ডিত পদ্মাতীরের বিদ্যাকেন্দ্রে পুরা দুই মাস থাকিয়া ছাত্রদের পড়াইয়া উপাধি দিয়া আসিলেন। তাঁহার অধ্যাপক জীবনের ইতিহাসে দিগ্বিজয়ী জয় অপেক্ষা ইহা আরো অনেক বেশী স্মরনীয় ঘটনা।

নিমাই পদ্মাতীর হইতে শ্রীহট্টে গেলেন, সেখান হইতে নবদ্বীপ ফিরিলেন। পণ্ডিত ও ছাত্রেরা—

সুবর্ণ, রজত, জলপাত্র, দিব্যাসন
সুরঙ্গ কম্বল বহু প্রকার বসন।

অধ্যাপক নিমাইকে উপঢৌকন দিলেন। তিনিও উহা গ্রহণ করিয়া সঙ্গে আনিলেন।

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, পূর্ব্ব বঙ্গে যাইবার পূর্ব্বে নিমাই লক্ষ্মীকে বাপের বাড়ী যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী "না গেলা বাপের বাড়ী শ্বাশুড়ী ছাড়িয়া"। নিমাই বলিয়া গেলেন—

আমার মায়েরে সেবা করিও নিরবধি
কাঁধের যজ্ঞসূত্র তাঁরে দিল দয়ানিধি।

ইহাতেই বুঝা যায়, যুবক নিমাই লক্ষ্মীকে কি পরিমাণ ভালবাসিতেন।

শ্রীবাস পণ্ডিতকে, মা ও স্ত্রীকে দেখিতে অনুরোধ করিয়া গেলেন। "অর্থ উপার্জ্জন বিনু সংসার না চলে—বঙ্গদেশে যাব আমি অর্থের ছলে"। গমনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। "অশেষ অমূল্য ধন বঙ্গেতে অর্জ্জিল"।

এদিকে লক্ষ্মী—

গৌরাঙ্গের পৈতা পূজে মাল্য চন্দনে
প্রভুর চরণধূলি তিলক ললাটে।
দুগাছি পাদুকা না দেখিলে প্রাণ ফাটে
গৌরাঙ্গ বিগ্রহ চিত্র কাঠনেতে লেখি
হরিদ্রা বসন করি নিত্য রূপ দেখি।

(চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)

লক্ষ্মীই গৌরাঙ্গের বিগ্রহ চিত্রের সর্ব্বপ্রথম পূজারিণী। বিরহিণী প্রেমময়ী কিশোরী ভার্য্যা, প্রিয়তমের রূপ প্রতিদিন দেখিবার জন্য স্বামীর বিগ্রহচিত্র কাঠনেতে লেখিয়া, হরিদ্রাবসনে আবৃত করিয়া যে খেলার আরম্ভ সেদিন করিয়াছিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়াও সেই খেলারই অনুকরণ করিয়াছেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ "ঘরে ঘরে শ্রীমূর্ত্তির" প্রচারের আজ্ঞা দিয়া সেই খেলাকেই বাঙ্গালীর ইতিহাসপথে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

লোচনও পূর্ব্ব বঙ্গে গমনের উদ্দেশ্য বলিলেন—"ধন উপার্জ্জন"। "মায়েরে কহিল যাব ধন উপার্জ্জনে"। জয়ানন্দ ও লোচন এক কথাই বলিলেন। গৃহী নিমাই ধন উপার্জ্জনে উদাসীন হইতে পারেন না।

লক্ষ্মীরে কহিলা প্রভু হাসিয়া উত্তর
মাতার সেবায় তুমি হইবে তৎপর।

(চৈঃ মঃ, আদি খণ্ড)

নিমাই কি ভাবিয়াছিলেন যে ফিরিয়া আসিয়া আর তিনি লক্ষ্মীকে দেখিতে পাইবেন না—এই দেখাই শেষ দেখা? "রজত কাঞ্চন বস্ত্র মুকুতা প্রবাল", এসকল উপঢৌকন নিমাই নবদ্বীপ ফিরিয়া "মাতৃস্থানে দিল ধন হরষিত হৈয়া"।

কবিরাজ গোস্বামী মাত্র এই কয় ছত্র লিখিয়াছেন—

কতদিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন
যাঁহা যায় তাঁহা লওয়ায় নাম সংকীর্ত্তন
নাম দিয়া ভক্ত কৈল, পড়াঞা পণ্ডিত।

(চৈঃ চঃ, আদি—১৬ পঃ)

ঘরে এলা প্রভু লঞা বহু ধন জন।

'পড়াঞা পণ্ডিত' করিলেন, 'বহু ধন লঞা ঘরে' আসিলেন—এ'সবি ঠিক। কিন্তু পূর্ব্ব বঙ্গে তিনি 'নাম সংকীর্ত্তন' করিয়া বেড়াইয়াছেন—এ কথা ঠিক নয়।

লোচনও লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্ব বঙ্গে "নীচ অপবিত্র যত চণ্ডাল দুর্জ্জন" তাহাদিগকে হরিনাম দিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। অধ্যাপক শিরোমণি নাম সংকীর্ত্তন বা হরিনাম বিলাইতে পূর্ব্ব বঙ্গে গমন করেন নাই। ইহা পরবর্ত্তী ইতিহাসকে কল্পনায় আগে আনা হইয়াছে।

নিমাই যখন পূর্ব্ব বঙ্গে, নবদ্বীপে তখন নিমাইয়ের বাড়ীতে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। হঠাৎ লক্ষ্মীর মৃত্যু হইল। সর্প দংশনের কথা বৃন্দাবনদাস লেখেন নাই, অপর সকলে লিখিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—"ধ্যানে গঙ্গাতীরে দেবী করিলা বিজয়"। গঙ্গায় মৃত্যু সময়ে লক্ষ্মীর অন্তর্জলীর কথাই বুঝা যাইতেছে। "সে সকল দুঃখ রসনা না পারে বর্ণিতে"। অতএব সূত্রমতে কিছু লিখিয়াই বৃন্দাবনদাস ক্ষান্ত হইয়াছেন। কেবল লিখিয়াছেন—"কাষ্ঠ দ্রবে আইর (শচীমাতার) সে ক্রন্দন শুনিতে"। এই এক ছত্রে করুণ রসের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়।

জয়ানন্দ লক্ষ্মীর মৃত্যু সকলের অপেক্ষা বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন। একদিন রাত্রে শচীমাতার সঙ্গে লক্ষ্মী শুইয়া আছেন—রাত্রি শেষে লক্ষ্মীকে সর্পে দংশন করিল। "কাল সর্প"—"দংশিল দক্ষিণ পদে কনিষ্ঠ অঙ্গুলি"। লক্ষ্মী বিষের জ্বালায় অস্থির হইলেন—"বিষ জ্বালায় মরি মা চক্ষে নাহি দেখি"। কিছুতেই বিষ নামিল না। লক্ষ্মীর পিতা-মাতা আরো সব আপ্ত বন্ধুলোক আসিয়া জড় হইলেন। "আকাশ ভাঙ্গিয়া সভার মস্তকে পড়িল"। "লক্ষ্মী মুখে চুম্ব দিয়া বলে শচীমাতা, অনাথিনী লক্ষ্মী মা ছাড়িঞা জাহ কোথা"। মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া লক্ষ্মী বলিলেন—

যখন ঠাকুর আমার গেল বঙ্গদেশে
কাঁধের পৈতা মোরে দিলেন সন্দেশে
সেই পৈতা আমার গলায় দেহ আনি
প্রবোধিঞা ঘরে নেহ মাতা ঠাকুরাণী
আমা অন্তর্জলে নেহ বিলম্বে কি কাজ
গঙ্গা ছাড়ি ঘরে মরিবা ও বড় লাজ।

(চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)

মৃত্যু সম্মুখে করিয়া লক্ষ্মীর এই কয়টি কথার মধ্যে জয়ানন্দ লক্ষ্মী চরিত্র যেভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা আর কেহ পারেন নাই। জয়ানন্দ লক্ষ্মীকে দিয়া আর একটি কথাও বলাইলেন—"হরিদাস ঠাকুর অন্ন দিল একবার"। জয়ানন্দ নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে পুনঃপুনঃ লিখিতেছেন যে, হরিদাস ঠাকুর নিমাইয়ের বাল্যকালেই নবদ্বীপে আসিয়া এক বটবৃক্ষের

কোটরে রহিলেন—“হরিদাস রহিলেন বটবৃক্ষের কোটরে”। গদাধর পণ্ডিত নিমাই অপেক্ষা বয়সে মাত্র ১৫ মাসের ছোট। তিনি লক্ষ্মীর মৃত্যু সময়ে উপস্থিত ছিলেন, এবং বিস্তর কাঁদিয়াছিলেন। গদাধরের নিকট শুনিয়া জয়ানন্দ লিখিয়াছেন। অতএব, জয়ানন্দের বর্ণনা এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বলিয়াই মনে হয়।

লোচন লিখিয়াছেন—নিমাইয়ের বিরহ সর্পের আকার ধারণ করিয়া লক্ষ্মীকে দংশন করিল। লোচন সর্ব্বদাই অলৌকিকতার পক্ষপাতী।

দংশিলেক মহাসর্প লক্ষ্মীর চরণে।

(চৈঃ মঃ,—আদি খণ্ড)

ওঝা ডাকিয়া আনা হইল, নানা ঔষধের তন্ত্র নানা মন্ত্রে ওঝা ঝাড়িতে লাগিল। কিন্তু এত চেষ্টাতেও বিষ নামিল না—‘না লেউটে বিষ’। ‘প্রাপ্তিকাল দেখি সভে ছাড়িল যতন’। শেষে লক্ষ্মীকে গঙ্গাজলে নিয়া গেল—আকাশ পথে রথ আসিলে লক্ষ্মী স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, “প্রভুর বিরহসর্প লক্ষ্মীরে দংশিল”। লোচন লিখিয়াছেন—“বিরহ হইল মূর্ত্তি সর্পের আকার”। সাপটা যে বিরহ মাত্র, একথা কে আগে লিখিলেন? লোচন—না কবিরাজ গোস্বামী? অথবা উভয়েই স্বাধীনভাবে বিরহকেই সর্পের আকার দিয়াছেন? জয়ানন্দ লিখিয়াছেন ‘কালসর্প’—বিরহ সর্প লেখেন নাই। বৃন্দাবনদাসে সর্পের উল্লেখ মাত্র নাই। তবে লক্ষ্মী যে প্রভুর ‘বিরহ’ ‘বিচ্ছেদ’ সহ্য করিতে না পারিয়াই দেহত্যাগ করিয়া ‘অতি অলক্ষিতে চলিলেন প্রভু পাশে’—একথা আছে।

নিমাই বাড়ীতে আসিয়া প্রথমে লক্ষ্মীর মৃত্যু বুঝিতে পারেন নাই। স্নান ও ভোজনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শচীমাতা পুত্রকে এ দুঃসংবাদ দিতে সাহস করেন নাই। পরিহাসপ্রিয় নিমাই—

বঙ্গদেশী বাক্য অনুকরণ করিয়া
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া।
কহিলেন যেমত আছিলা বঙ্গে রঙ্গে।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—১২ অঃ)

শচীমাতা ঘরের মধ্যে আছেন—"না আইসেন পুত্রের গোচরে"। নিমাই মায়ের নিকটে গিয়া বলিলেন—"দুঃখিত তোমারে মাতা দেখি কি কারণ"? শচীমাতা নিরুত্তর, কিছুই কথা বলেন না। যাহারা উপস্থিত ছিলেন অবশেষে তাঁহারাই কহিলেন—

তবে সবে কহিলেন, শুনহ পণ্ডিত
তোমার ব্রাহ্মণী গঙ্গা পাইল নিশ্চিত।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—১২ অঃ)

লক্ষ্মীর মৃত্যু অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতরূপে প্রবাসাগত বিরহী যুবককে অতি নির্ম্মমভাবে আঘাত করিয়াছিল। লক্ষ্মীকে যুবক নিমাই কত আগ্রহে বিবাহ করিয়াছিলেন, প্রথম যৌবনের শ্রেষ্ঠ ভালবাসা দিয়া তিনি লক্ষ্মীকে গৃহে ও হৃদয়ে বরণ করিয়াছিলেন। নিমাই "ক্ষণেক রহিলা প্রভু মাথা হেট করি," পরে মাতাকে প্রবোধ দিলেন এই বলিয়া যে—

ভবিতব্য যা আছে তা খণ্ডিবে কেমনে
এই মত কাল গতি কেহ কার নহে,
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—১২ অঃ)

ইহা ১৫০১ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। ১৫১০ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণের পর যে মায়াবাদের বক্তৃতা দিয়াছিলেন ইহা তাহারি পূর্ব্বাভাষ—সংসার অনিত্য কেহ কার নহে, ইহাই কাল গতি। 'বেদে কহে' বলিতে অদ্বৈত বেদান্তের মায়াবাদ বুঝিতে হইবে।

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—লক্ষ্মীর বিয়োগের কথা শুনিয়া নিমাই শচীমাতাকে বলিলেন, "সংসার অনিত্য মা—সবে কৃষ্ণ সত্য"।

কোথা লক্ষ্মী কোথা আমি কোথা এই অর্থ
জত দেখ অর্থ আদি সকল অনর্থ।

পদ্মপত্রের জল যেমন স্থির থাকে না, তেমনি চঞ্চল জীব একত্র না রহে।

না কান্দ না কান্দ মাতা না কর অঙ্কে মা
গদাধরে জগদানন্দে সমর্পিলা তোমা।

(চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)

একথা এত আগেই আসে কেন? নিমাইয়ের অজ্ঞাতসারে ইহা কি ভবিষ্যৎ সন্ন্যাসের পূর্ব্বাভাষ?

লোচন শচীমাতাকে দিয়াই বলাইলেন—'আমার বধু গেলাত বৈকুণ্ঠ'। নিমাই বলিলেন, লক্ষ্মী ইন্দ্রের অপ্সরা ছিল, নৃত্যে তাল ভঙ্গ হওয়াতে অভিশপ্ত হইয়া পৃথিবীতে জন্ম নিয়াছিল, কাল পূর্ণ হওয়াতে এখন আবার স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মা তুমি দুঃখ করিও না। লোচন ছাড়া এ গল্প আর কেহ বলেন নাই। নিয়তির কথা ও নিমাই বলিলেন—

নির্ব্বন্ধ না ঘুচে যেই লেখেন বিধাতা
এ বোল বলিয়া বিশ্বম্ভর পাইলা চিন্তা
আত্ম সঙ্গোপন করে কহে নানা কথা!

(চৈঃ মঃ, আদিখণ্ড)

লোচনের নিমাই মাতাকে প্রবোধ দিলেন, কিন্তু নিজে প্রবোধ পান নাই। তাঁহাকে "আত্ম সঙ্গোপন করিয়া" "নানা কথা" লোকের সঙ্গে কহিতে হইয়াছে। তবে তিনি ধৈর্য্যের সহিত শোককে গ্রহণ করিলেন।

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন মাত্র দুই ছত্র—

ঘরে এলা প্রভু লয়া বহু ধন জন
তত্ত্বজ্ঞানে কৈলা শচী দুঃখ বিমোচন।

(চৈঃ চঃ, আদি—১৬ পঃ)

তত্ত্বজ্ঞান অর্থ অদ্বৈত বেদান্তের মায়াবাদ, যাহাতে এই প্রত্যক্ষ জগৎকে মিথ্যা জ্ঞান হয়। লক্ষ্মীর মৃত্যুর আঘাতে অধ্যাপক নিমাই বৈদান্তিক মায়াবাদের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আমরা দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিলাম—১ম, ঈশ্বরপুরীর সহিত মিলনে নিমাইয়ের মধ্যে কৃষ্ণ ভক্তির সূত্রপাত হয়। ২য়, লক্ষ্মীর মৃত্যুতে 'সংসার অনিত্য, কেহ কার নহে' এই 'তত্ত্বজ্ঞানে'-র উদয়ে ভবিষ্যৎ সন্ন্যাসের বীজ উপ্ত হয়। ইহা অনুমান নয়, ইহা প্রত্যক্ষ।

চতুর্থ বক্তৃতা

[নিমাইয়ের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়ার দ্বিতীয়বার বিবাহ। হরিদাসের নবদ্বীপ আগমন, বিভিন্ন চরিত গ্রন্থের মতবিরোধ ও তাহার সামঞ্জস্য বিধান। গয়া গমন। গয়া হইতে ফিরিয়া নিমাইয়ের মানসিক পরিবর্ত্তন বৃদ্ধি। ১ম স্তর। ইহার পাঁচটি কারণ নির্দ্দেশ। পণ্ডিত গঙ্গাদাস নিমায়ের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে কোন ধারণায় আসিতে পারেন নাই কেন ? অধ্যাপক জীবনের পর্য্যাবসান কেন এবং কবে হইল ? বায়ুব্যাধি অথবা কৃষ্ণপ্রেমের উন্মত্ততা। শেষ ১২ বৎসর দিব্যোন্মাদের অঙ্কুর নিমাইয়ের মানসিক পরিবর্ত্তনের এই অবস্থায় পাওয়া যায় কি না ?]

অধ্যাপক নিমাই লক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়া মাত্র দুই বৎসর গার্হস্থ্য করিয়াছিলেন। ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মীর মৃত্যু হয়। নবদ্বীপলীলার দীর্ঘ ৬ বৎসর এখনো সম্মুখে বিস্তৃত।

(১) বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর নিমাই পণ্ডিত পুনরায় ছাত্র পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। বায়ুব্যাধির জন্য মাথায় বিষ্ণুতৈল একজন চাকর মাখিয়া দেয়—নিমাই তদবস্থায় ছাত্র পড়ান।

বিষ্ণুতৈল শিরে দিতে আছে কোন দাসে
অশেষ প্রকারে ব্যাখ্যা করে নিজ রসে।

নিমাই ছাত্রদের ললাটে তিলক ধারণ, আর সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে অনুরোধ করিলেন। এইরূপ বিপত্নীক অবস্থায় ১৫০৪ খৃষ্টাব্দ কাটিয়া গেল।

(২) তারপর ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধিমন্ত খান, মুকুন্দ, সঞ্জয় প্রভৃতি মিলিয়া রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত নিমাই পণ্ডিতের দ্বিতীয়বার বিবাহ দেওয়াইলেন। বুদ্ধিমন্ত খান বলিলেন—

মোর ভার এ বিবাহে যত লাগে ব্যয়
বামনিঞা সজ্জ এ বিবাহে কিছু নাঞি
রাজ কুমারের মত লোকে দেখে যেন।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—১৩ অঃ)

বিবাহের সময় বিষ্ণুপ্রিয়ার বয়স ১০ বৎসর ছিল, কিন্তু জয়ানন্দ

বলিতেছেন—"বিষ্ণুপ্রিয়া কন্যা দেখি প্রথম যৌবন"। নদীয়ানাগরী ভজনের প্রচারক লোচন এ বিবাহেও নাগরীদের আনিলেন—

পাটশাড়ী পরে, নেতের কাচুলী
কানড় ছান্দে বান্ধে খোঁপা,
মুকুতা গাঁথিয়া, সোনায়ে বাঁধিয়া
পিঠে ফেলে রাঙ্গা থোপা।

(চৈঃ মঃ, আদি খণ্ড)

বাসর ঘরে—

পরম সুন্দরী যত, সভে হৈল উনমত
বেকত মনের নাহি কথা
রসে রসে আবেশে, লোলি পড়ে গোরাপাশে
গরগর কামে উনমতা।

(চৈঃ মঃ, আদি খণ্ড)

'কামগন্ধ নাহি তায়'—একথা লোচন বলিলেন না।

করিরাজ গোস্বামী দুই ছত্র লিখিয়াছেন—

তবে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী পরিণয়
তবে ত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ী জয়।

(চৈঃ চঃ, আদি—১৬ পঃ)

বৃন্দাবনদাস লক্ষ্মীর সহিত বিবাহের পর (১৫০২ খৃঃ) দিগ্বিজয়ী জয় করাইয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিবাহের পর (১৫০৬ খৃঃ) দিগ্বিজয়ী জয় করাইলেন।

(৩) পুনরায় বৈষ্ণবদের উপর পাষণ্ডীদের অত্যাচার আরম্ভ হইল। ইহা ১৫০৬ খৃষ্টাব্দের ঘটনা বলিলে ভুল হইবে না।

ইহারা কি কার্য্যে ডাকছারে উচ্চৈঃস্বরে।
আমি ব্রাহ্মণ আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন॥
দাস প্রভু ভেদ বা করেন কি কারণ।
সংসারে সকল বোলে মাগিয়া খাইতে॥
ডাকিয়া বোলয়ে হরি লোক জানাইতে।

এগুলার ঘরদ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।
এই যুক্তি করে সব-নদীয়া মিলিয়া॥
এ বামনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সভা হৈতে হৈব দুর্ভিক্ষ প্রকাশ॥
যদি ধান্যে কিছু মূল্য চড়ে।—
তবে এগুলার ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥

(চৈঃ ভাঃ, আদি—১৪ অঃ)

(৪) তারপর আসিলেন যবনরাজ অত্যাচারের প্রথম শহীদ, বাইশ বাজারের বেত্রাঘাত জয়ী, অহিংসার পূর্ণ অবতার যবন হরিদাস।

বৃন্দাবনদাস নিমাইয়ের গয়াগমনের কিছু পূর্ব্বে হরিদাসকে নবদ্বীপ আনিলেন। নিমাই ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে, অক্টোবর (আশ্বিন) মাসে গয়াগমন করেন ; চার মাস পর ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে, জানুয়ারী মাসে (পৌষ) নবদ্বীপে ফিরিয়া আসেন। সুতরাং, ১৫০৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরের পূর্ব্বে যেকোন সময়ে হরিদাস নবদ্বীপ আসিলেন। পাষণ্ডীদের বাক্যজ্বালা, আর যবনরাজ অত্যাচার হরিদাসের উপরেই সকলের আগে পতিত হইয়াছে। হরিনদী গ্রামের এক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ হরিদাসের বৈষ্ণবতা দেখিয়া মহা দুর্বচন বলিয়াছিল—

দরশন কর্ত্তা এবে হৈল হরিদাস
যুগ শেষে শূদ্রে বেদ করিবে বাখানে
এখনই তাহা দেখি, শেষে আর কেনে।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—১৪ পঃ)

বৃন্দাবনদাস বরাহপুরাণ উল্লেখ করিয়া, এই ব্রাহ্মণকে রাক্ষস বলিয়াছেন।

রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোণিষু
উৎপন্না ব্রহ্মকুলেষু বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কুলান।

কলিযুগে সকল রাক্ষস বিপ্র ঘরে
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে

হরিদাসকে উপলক্ষ্য করিয়া পাষণ্ডী ব্রাহ্মণদের সহিত বৈষ্ণবদের সংঘর্ষের একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল।

আবার অন্যদিকে, হরিদাসের বৈষ্ণবতা দেখিয়া মুসলমান মুলুক-পতি বলিলেন—

আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত
তাহা ছাড় হই তুমি মহাবংশ জাত।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—১৪ পঃ)

অতএব—

কাজি বলে বাইশ বাজারে বেড়ি মারি
প্রাণ লহ, আর কিছু বিচার না করি।

মুসলমানের পক্ষে বৈষ্ণব হওয়ার শাস্তি "প্রাণ লহ"। পাঠান রাজত্বের পটভূমিকার উপর হরিদাসকে বাইশ বাজারে চাবুক মারিয়া এই "প্রাণ লহ" শাস্তি যেমন দেখিলাম, তেমনি পাষণ্ডী বা রাক্ষস ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক হরিদাসের উপর বাক্যযন্ত্রণা, লাঞ্ছনা ও উপহাসও দেখিলাম—"বৈষ্ণবেরে সবেই করয়ে পরিহাস" 'পাষণ্ডান পরিচূর্ণয়ন' আর 'যবনরাজভীতি দূরীকরণ' এই দুই সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে গয়া হইতে ফিরিরা নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপনা ছাড়িয়া দিয়া বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন। অতএব, নিপুণ শিল্পীর মত বৃন্দাবন-দাস নিমাইয়ের গয়াগমনের প্রাক্কালে হরিদাসকে নবদ্বীপ আনিয়াছেন। নিমাই প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব আন্দোলন ইতিহাসপথে পা বাড়াইবার প্রথম মুহূর্ত্তে হরিদাস আগমন করিলেন, কেননা আমরা দেখিব তিনি এই আন্দোলনের এক অপরিহার্য্য অঙ্গ। যে দুইটি কারণের জন্য এই আন্দোলনের জন্ম সেই দুইটি কারণ যবন হরিদাসকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের সম্মুখে প্রকট হইয়াছে। যবন হরিদাস লীলার সহচর ব্রহ্মার অবতার। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

কতদিনে বৈষ্ণব দেখিতে ইচ্ছা করি
আইলেন হরিদাস নবদ্বীপ পুরী।

আচার্য্য অদ্বৈত প্রাণ হৈতে অধিক করিয়া হরিদাসকে রাখিলেন। অদ্বৈত নবদ্বীপেই ছিলেন, হরিদাস আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত

হইলেন। কিন্তু বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে, বূঢ়ন গ্রামে হরিদাস অবতীর্ণ হইয়া পরে গঙ্গাতীরে ফুলিয়ায় শান্তিপুরে আসিয়া আচার্য্য অদ্বৈতের সহিত মিলিত হন এবং তাঁহার সহিত "গোবিন্দ-রস-সমুদ্র-তরঙ্গে" ভাসিতে থাকেন। শান্তিপুর ও নবদ্বীপ ইহার মধ্যে অনেক বৎসরের ব্যবধান। এতদিন হরিদাস কোথায় ছিলেন?

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে, নিমাইয়ের পিতার যখন মৃত্যু হয় (১৪৯৬ খৃঃ) তখন হরিদাস নবদ্বীপে। নিমাই গুরুগৃহে পুঁথি লিখিতে গিয়াছেন, হরিদাস রড় দিয়া তথায় গিয়া বলিলেন—"কি পুঁথি লেখ, তোমার পিতা অন্তর্জলে ঝাট গিয়া দেখ"। তারপর লক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়া (১৫০১ খৃঃ) হরিদাসকে মিমন্ত্রণ করিয়া লক্ষ্মীর রন্ধনে ভোজন করাইলেন। "আজি হৈতে লক্ষ্মী বহু রন্ধনের ভার"। "ভোজন করাহ কালি শ্রীহরিদাসে" (চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)। লক্ষ্মীও মৃত্যু সময়ে স্পষ্ট বলিয়াছেন—"হরিদাস ঠাকুরে অন্ন দিল একবার।"

সুতরাং, বৃন্দাবনদাস যদি ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে হরিদাসকে নবদ্বীপ আনিয়া থাকেন, তবে বুঝিতে হইবে ইহা হরিদাসের নবদ্বীপে প্রথম আগমন নয়। তিনি ফুলিয়া শান্তিপুর ও নবদ্বীপে যাতায়াতের মধ্যে ছিলেন, ইহাই সম্ভব। বিশেষতঃ বৃন্দাবনদাসের কথা হইতে বুঝাও যায় না, আর প্রমাণও হয়না, যে নিমাইয়েঁর গয়াগমনেব পূর্ব্বে হরিদাস আর কখনও নবদ্বীপে আসেন নাই। জয়ানন্দের কথা মিথ্যা মনে করিবার হেতু দেখি না। জয়ানন্দ হরিদাসের জন্মস্থান ভাট কলাগাছি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অবশ্য বূঢ়নের কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ বৃন্দাবনদাস অপেক্ষা জয়ানন্দ একটু বেশী খবর হরিদাস সম্পর্কে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন; কেননা বৃন্দাবনদাস হরিদাসের পিতামাতার নাম দেন নাই, জয়ানন্দ দিয়াছেন—"উজ্জ্বলা মায়ের নাম, বাপ মনোহর"।

লোচন নিমাইয়ের গয়া হইতে ফিরিবার পরে, এমনকি নিত্যানন্দের আগমনেরও পরে, "হরিদাস মহাশয়"-কে একদিন "আচম্বিতে" নবদ্বীপে আনিয়াই নিমাইয়ের সঙ্গে মিলিত করিলেন। ইহার আগে বা পরে আর কিছুই লোচন লেখেন নাই। লোচনের ঠাকুর হরিদাস প্রসঙ্গের কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। হরিদাস মিলন যে

কত বড় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, নদীয়ানাগরী ভাব প্রচার করিতে গিয়া লোচন তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর হরিদাসকে ফুলিয়ায় শান্তিপুরে আনিবার পূর্ব্বের ইতিহাস (চৈঃ চঃ, অন্ত্য —৩য় পঃ) স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছেন, বৃন্দাবনদাস এই ইতিহাস দেন নাই। কবিরাজ গোস্বামী তাহা পূরণ করিয়াছেন। হরিদাস সোজা বূঢ়ন হইতেই শান্তিপুরে আসেন নাই। তিনি গৃহত্যাগ করিয়া কিছুদিন বেনাপোলের বনের মধ্যে ছিলেন। সেখানে রামচন্দ্র খানের সহিত তাঁহার একটা সংঘর্ষ হয়। তিনি একজন বেশ্যাকে উদ্ধার করিয়া "পরম মহান্তি" রূপে খ্যাত করান। তারপর তিনি হিরণ্য গোবর্দ্ধনের পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের ঘরে চান্দপুরে কিছুদিন থাকেন। সেখানে হিরণ্য গোবর্দ্ধনের সভায় নামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে হরিদাস নূতন কথা বলেন। তারপরে ফুলিয়ায় শান্তিপুরে আসিয়া আচার্য্য অদ্বৈতের সহিত মিলিত হন। অদ্বৈত হরিদাসকে গীতা ও ভাগবতের অর্থ বুঝাইয়া দেন। এখান হইতেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া নিয়া বিচার করিয়া শাস্তি দেওয়া হয়। পরে তিনি শান্তিপুর ফিরিয়া এখন নিমাইয়ের গয়াগমনের পূর্ব্বে আবার নবদ্বীপে আসিয়াছেন। হরিদাস নবদ্বীপ আসিবার অল্প পরেই নিমাই পণ্ডিত গয়া গেলেন। হুঁসেন সাহ'র রাজত্বের সময়েই হরিদাসের বিচার, বাইশ বাজারে চাবুক ও "প্রাণ-লহ" শাস্তি হইয়াছিল। নিমাই এসকল ইতিহাস নিশ্চয়ই বিদিত ছিলেন। ইহা ভবিষ্যৎ নেতার মনকে অতি প্রবল ভাবেই আলোড়িত করিতেছিল।

(৫) বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—"চতুর্দ্দিকে পাষণ্ড বাড়য়ে গুরুতর"। তাহারা "নিরবধি বৈষ্ণবেরে নিন্দা করে"। নিমাই "তাহা শুনেন আপনে"।

চিত্তে ইচ্ছা হৈল আত্ম প্রকাশ করিতে
ভাবিলেন আগে আসি গিয়া গয়া হইতে

(চৈঃ ভাঃ, আদি—১৫ পঃ)

"আগে আসি গিয়া গয়া হইতে" কথাটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। গয়া যাইবার পূর্ব্বেই, গয়া হইতে ফিরিয়া তিনি যাহা করিবেন তাহা স্থির

করিয়া ফেলিয়াছেন। এই সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়াই তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের স্রষ্টা, এবং সেই জন্যই তিনি নবদ্বীপে কৃষ্ণের অবতার।

গয়া যাইবার উদ্দেশ্য, পিতাকে পিণ্ড প্রদান। পিতার মৃত্যুর ১৩ বৎসর পর তিনি পিতৃপিণ্ড প্রদানের জন্য গয়া গমন করিলেন। যথারীতি নিমাই পিণ্ড দিলেন। "সেইক্ষণে, দৈব যোগে, ঈশ্বর ইচ্ছায়, সেইস্থানে" ঈশ্বরপুরী আসিয়া মিলিত হইলেন। ইহা দৈবযোগে অথবা পূর্ব্বপরিকল্পিত—বুঝা কঠিন। পুরীকে নিমাই বলিলেন—"যদবধি তোমায় দেখিয়াছি নদীয়ায়", "তদবধি চিত্তে আর কিছু নাহি ভায়"। ঈশ্বরপুরীর সহিত ৬ বৎসর আগে (১৫০২ খৃঃ) নবদ্বীপে নিমাইয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। নিমাই পুরীকে বলিলেন—তুমি আমাকে "কৃষ্ণ পাদপদ্মের অমৃত রস পান করাও—এই চাহি দান"। পুরী বলিলেন—"যে তোমার পাণ্ডিত্য, যে চরিত্র তোমার—সেহো কি ঈশ্বর অংশ বই হয় আর"।

নিমাইকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া এখনি ঈশ্বরপুরী অনুমান করিতেছেন। তারপর নিমাই ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা চাহিলেন, এবং "করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ"। মন্ত্র গ্রহণের পর—"যে প্রভু আছিলা অতি পরম গম্ভীর—সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির"। নিমাই গয়াতে কিছু দিন বাস করিলেন। তারপর ভাবাবেশে দীক্ষিত নিমাই, নবদ্বীপ না ফিরিয়া মথুরায় যাইবার সংকল্প করিলেন—

—তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুঞি আর না যাইমু সংসার ভিতরে।
মথুরা দেখিতে মুঞি চলিব সর্ব্বথা
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা।

(চৈঃ ভাঃ, আদি—১৫ পঃ)

এই প্রথম বিরহিনী রাধিকার ভাবের আবেশ দেখিতে পাই। তারপর দৈববাণী হইল যে 'লোক নিস্তারিতে' তুমি অবতীর্ণ—অতএব মথুরায় না গিয়া তুমি নবদ্বীপে ফিরিয়া যাও। অতএব "গৃহে আইলেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়"।

গয়ায় বাপের পিণ্ড দেওয়ার কথাই ছিল, মন্ত্র দীক্ষার কথা ছিল না। ইহা যেন অকস্মাৎ ঘটিয়া গেল। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে, অক্টোবর মাসে প্রভু গয়া গিয়াছিলেন ; ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে, জানুয়ারীতে নবদ্বীপ ফিরিলেন।

জয়ানন্দ নিমাইকে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরের বৎসরেই (১৪৯৭ খৃঃ) গয়া লইয়া যান। সঙ্গে মুরারি, শ্রীবাস, গদাধর আদি ছিলেন। এক্ষেত্রে জয়ানন্দ পর পর ঘটনার ক্রম ঠিক রাখিতে পারেন নাই। গয়াগমন পথে মগধে প্রবেশ করিয়া রাজগিরি গেলেন, সেখানে ঈশ্বরপুরী ছিলেন, "রাজগিরি ঈশ্বরপুরী বৈসে"—তাঁ'র নিকট দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন। সুতরাং জয়ানন্দের মতে দীক্ষা গয়াতে হয় নাই, রাজগৃহে হইয়াছে। ফিরিবার পথে নিমাই হড়িরাজুড়ি ও বৈদ্যনাথ শিবকে স্তুতি করিয়া নবদ্বীপে ফিরিলেন। অবশ্য "মথুরা জাইব আমি না জাইব দেশ"—একথাও তিনি বলিলেন ; কিন্তু ইহা শুনি —"গদাধর পণ্ডিত কান্দে ছাড়িয়া নিশ্বাস"—সুতরাং নিমাইয়ের মথুরা যাওয়া হইল না। জয়ানন্দ দৈববাণীর কথা বলিলেন না, ক্রন্দনের কথা বলিলেন—"সভার ক্রন্দন শুনি না গেলা মথুরা"।

গয়ার এক বৎসর পরে কাটোয়ায় সন্ন্যাস লওয়ার অব্যবহিত পরেও এই বৃন্দাবন যাওয়ার মনোভাবের পুনরাবৃত্তি দেখা যাইবে।

লোচন, বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিবাহের পরে গয়া গমন লিখিয়াছেন। ঠিকই লিখিয়াছেন। শচীমাতা বলিলেন, "গয়া যদি যাবি বাপ শুনরে নিমাই—মোর নামে এক পিণ্ড দিসরে তথাই"। হয়ত স্বামীশোকে বিহ্বলা হইয়া নিজের মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া তাঁহার নামেও একটি পিণ্ড দিবার কথা বলিয়া থাকিবেন। বেচারী শচীমাতা! নিমাইয়ের হাতে পিণ্ড তিনি আর পান নাই। নিমাইয়ের তিরোভাবের পরেও (১৫৩৩খৃঃ) তিনি বাঁচিয়াছিলেন।

নিমাই গয়ার পথে চলিলেন, এখানেও লোচন কুলবধুদের না আনিয়া ছাড়িবেন না। নিমাইকে পথে দেখিয়া—"কুলবধু ধায় সব কুল ত্যাগ করি"। ইহাই নদীয়া-নাগরী ভাব। লোচন যেখানে সেখানে এই ভাব ছড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

"পথে" যাইতে ঈশ্বরপুরীর সহিত দেখা। পুরীকে নিমাই

বলিলেন—"কৃষ্ণ পদাম্বুজ ভক্তি দেহত আমারে"। পুরী "গোপীনাথ মহামন্ত্র" নিমাইকে দিলেন। জয়ানন্দের "গোপালমন্ত্র দশাক্ষর", লোচনে "গোপীনাথ মহামন্ত্র" হইল। গোপাল আর গোপীনাথ, বাৎসল্য আর মাধুর্য্য—পার্থক্য আছে বৈ-কি।

"গোপীনাথ মহামন্ত্র পাঞা বিশ্বম্ভর"—"ব্রজের যতেক ভাব সব মনে হৈল—বিশেষ মাধুর্য্য রসে মন ডুবাইল"।

রাধা রাধা বলি প্রেম বাঢ়িল তরঙ্গ

*　　　*　　　*

রাধা ভাবে আবেশ হইয়া কলেবর
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি উচ্চৈস্বর।

(চৈঃ মঃ, আদি খণ্ড)

একবার কৃষ্ণ হইয়া রাধাকে ডাকিলেন। আবার রাধা হইয়া কৃষ্ণকে ডাকিলেন। নরহরির সেই "ক্ষণে কৃষ্ণ, ক্ষণে রাধা" লোচন ঠিক আঁকিয়াছেন। ভবিষ্যতের পুরীলীলার অঙ্কুরোদ্গম এই বিরহী যুবকের মনে গয়াতীর্থে ই দেখা গেল। প্রাকৃতে ইহা লক্ষ্মীর জন্য বিরহ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। অপ্রাকৃতে ইহা কৃষ্ণ হইয়া রাধার জন্য বিরহ, আবার রাধা হইয়া কৃষ্ণের জন্য বিরহ। প্রাকৃত হইতেই ইহা অপ্রাকৃতে রূপান্তরিত হইয়াছে। কৃষ্ণ ভক্তি প্রথম দিনেই একেবারে মাথুর বিরহ হইতে আরম্ভ হইল। "প্রাকৃত আর অপ্রাকৃতের সৃষ্টি একই ক্ষণে" (চৈঃ চঃ, মধ্য—২১পঃ)—"প্রপঞ্চ যে দেখ সব সেহ আমি হইয়ে" (চৈঃ চঃ, মধ্য—২৫পঃ)

একদিন সত্যি তিনি "মধুপুরী যাত্রা প্রভু কৈল আচম্বিতে", কিন্তু "হেনকালে উঠি গেল আকাশের বাণী"—তীর্থ পর্য্যটন সন্ন্যাসের পরে, এখন নয়। এখন বাড়ী যাও। লোচন গদাধর আদির ক্রন্দনের কথা বলিলেন না। বৃন্দাবনদাসের "দিব্য-বাণী"-কেই "আকাশের বাণীতে" নামান্তর করিলেন।

গয়া প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাসের আরেকটি কথা এখানে বলা দরকার। গয়া হইতে নবদ্বীপ ফিরিয়া নিমাই এই বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন—"পাইয়াও হারাইনু জীবনকানাই"। সকলের নিকটেই ইহা অতিশয়

অদ্ভুত শুনিতে লাগিল, ইহার "রহস্য শুনিতে" সকলেই উৎকণ্ঠিত হইল। নিমাই রহস্য বলিলেন—গয়া হতে কানাইয়ের নাট্যশালা গ্রামে আসিয়া দেখিলেন—

তমাল-শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জা সহিত কুণ্ডল মনোহর॥
বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ শোভে তদুপরি।
ঝলমল মনিগণ লখিতে না পারি॥
হাতেতে মোহন বাঁশী পরম সুন্দর।

(চৈঃ ভাঃ মধ্য—২য় অঃ)

আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন ভিতে॥

সুতরাং "পাইয়াও হারাইনু জীবনকানাই" বুঝিতে এখন আর কোনই অসুবিধা নাই, হওয়া উচিত নয়।

নিমাই যাহা দেখিয়াছিলেন সম্পূর্ণ সত্য, তিনি মিথ্যা দেখেনও নাই এবং মিথ্যা বলেনও নাই। ইহা নিমাইয়ের পক্ষে এতদুর সত্য যে, তাঁহার শেষ জীবনের দীর্ঘ বৎসরগুলি "পাইয়াও হারাইনু জীবনকানাই" বলিয়া কান্দিয়া কাটিয়াছে। তবে নিমাই যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা যে তাঁহার সঙ্গীরা ও দেখিবে এমন কথা নয়। ইহা সর্ব্বসাধারণের জন্য সত্য নয়, শুধু নিমাইয়ের পক্ষে সত্য। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর" (চৈঃ চঃ)।

কবিরাজ গোস্বামীর গয়ার বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—

তবেত করিল প্রভু গয়াতে গমন
ঈশ্বর পুরীর সহিত তথায় মিলন,
দীক্ষা অনন্তরে কৈল প্রেম প্রকাশ
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস।

(চৈঃ চঃ, আদি—১৭ পঃ)

আমরা পূর্ব্ব বঙ্গে অধ্যাপক নিমাইকে দেখিয়াছি। ছয় বৎসর পরে আবার গয়াতীর্থে তাঁহাকে দেখিলাম। তাঁহার জীবনের

গতি কোন্ দিকে, কিরূপে, কেন পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহাও প্রত্যক্ষ করিলাম। তাঁহার জীবনের গতিবেগ দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছে, ইহাও লক্ষ্য করা যায়।

নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে চারি মাস পরে নবদ্বীপ ফিরিয়া আসিয়াছেন (১৫০৯ খৃঃ—জানুয়ারী)। যে মানুষ নবদ্বীপ হইতে গয়ায় গিয়াছিলেন, সে মানুষ আর ফিরেন নাই। নিমাই এক নূতন মানুষ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। সকলেই দেখিলেন নিমাইয়ের এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

(১) প্রথম পরিবর্ত্তন—নিমাইয়ের বিনীত ব্যবহার। ইহা তাঁহার পূর্ব্ব স্বভাবের বিপরীত। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—"পরম সুনম্র হই প্রভু কথা কহে—সভে তুষ্ট হৈলা দেখি প্রভুর বিনয়ে"। গয়া প্রত্যাগত নিমাইয়ের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সকলের আগে শ্রীমান পণ্ডিত শ্রীবাসের বাড়ীতে গিয়া অন্যান্য বৈষ্ণবদের এইরূপ সংবাদ দিল। বৈষ্ণবেরা তখন বৃক্ষ হইতে পূজার জন্য কুন্দকুসুম তুলিতেছিলেন। নিমাই "পরম বিরক্ত রূপ সকল সম্ভাষ—তিলার্দ্ধেক ঔদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ", ইহা খুব আশ্বাসের কথা। উদ্ধত নিমায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে পলায়নপর বৈষ্ণবদের নিকট এই পরিবর্ত্তন যেমন অকস্মাৎ তেমনি অভাবনীয়। বৈষ্ণবেরা সন্তুষ্ট হইলেন। গয়া যাইবার পূর্ব্বে নবদ্বীপে ঈশ্বরপুরীর সহিত যখন নিমাই পণ্ডিতের প্রথম পরিচয় হয়, তখন হইতেই পুরী প্রণীত কৃষ্ণামৃত গ্রন্থের আলোচনা উপলক্ষে নিমাই চরিত্রে অল্প বিনয় দেখা দিয়াছিল।

(২) দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন—অসম্ভব রকমের কৃষ্ণ ভক্তি। নিমাই শ্রীমান পণ্ডিতকে বলিলেন—

কালিসভে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ঘরে।
তুমি আর সদাশিব চলিবে সত্বরে॥
তোমা সভা সহিত নির্জ্জন একস্থানে।
মোর দুঃখ সকল করিব নিবেদন॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১অঃ)

দেখা যায় গয়া হইতে ফিরিয়া তিনি নবদ্বীপের প্রধান প্রধান

বৈষ্ণবদের সহিত নির্জ্জনে একস্থানে মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাও নিমাইয়ের একটা মানসিক বিকাশ।

গয়া গমনের পূর্ব্বে নিমাই পণ্ডিতের অধ্যাপক লীলায় এই সমস্ত বৈষ্ণবগণ উদ্ধত অধ্যাপকের মধ্যে 'কৃষ্ণ রসের' অভাব দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ চিত্তে বারংবার বলিয়াছেন—

হেন দিব্য শরীরে না হয় কৃষ্ণরস
কি করিব বিদ্যায় হইলে কালবশ

(চৈঃ ভাঃ, আদি—৯ অঃ)

কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যা ভোলে ?

নিমাইয়ের অনুরোধে শ্রীমান পণ্ডিত যখন শুক্লাম্বরের গৃহে মিলিত হইবার জন্য গদাধর, গোপীনাথ, রামাই, শ্রীবাস, সদাশিব, মুরারি প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগকে বলিতে গেলেন তখন এই সকল বৈষ্ণবেরা শ্রীমানকে হাসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

আজি বড় দেখি হাস্য।
শ্রীমান বলেন 'আছে কারণ অবশ্য' ॥
'কহ দেখি' বোলে সব ভাগবতগণ।
শ্রীমান পণ্ডিত বলে শুনহ কারণ ॥
পরম অদ্ভুতকথা মহা অসম্ভব।
নিমাই পণ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব ॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—৬অঃ)

ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের যিনি সর্ব্বপ্রধান নেতা, কৃষ্ণের অবতারত্ব যাঁহার উপর বৈষ্ণবেরা আরোপ করিয়াছেন, সেই নিমাই পণ্ডিতের বৈষ্ণব হওয়া পরম অদ্ভুত কথা—মহা অসম্ভব বলিয়া একদিন নবদ্বীপের বৈষ্ণবেরা মনে করিয়াছিলেন। ইহা ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ঘটনা !

নিমাই পণ্ডিত যে গয়া হইতে কৃষ্ণ-ভক্ত বৈষ্ণব হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, এ পরিবর্ত্তন তাঁহার পরিচিত বন্ধুদের নিকটেই অদ্ভুত, অসম্ভব বোধ হইল। কাজেই অপরের আর কথা কি ? বৈষ্ণববিদ্বেষী পাষণ্ডীরা ইহা দেখিয়া কি পর্য্যন্ত যে বলিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান

করা যায়। সুতরাং প্রমাণ হয় যে, ইহাও তাঁহার পূর্ব্ব-স্বভাবের বিপরীত দিকে পরিবর্ত্তন।

(৩) তৃতীয় পরিবর্ত্তন—বায়ু ব্যাধির বৃদ্ধি। শ্রীমান পণ্ডিতই ইহা সকলের আগে দেখিলেন। এবং সকলকেই বলিলেন। নিমাই "হা কৃষ্ণ বলিয়া পড়িলা ভূমিতে—সর্ব্ব অঙ্গে ধাতু নাই হইলা মূর্চ্ছিত"। গ্রন্থে 'বায়ু ব্যাধি' বলিয়া আছে। ফল দেখা যায় মূর্চ্ছা ও বাহ্যজ্ঞান লোপ।

নবদ্বীপের সকল বৈষ্ণব শ্রীমান পণ্ডিতের নিকট গয়া প্রত্যাগত নিমাইয়ের এই সকল পরিবর্ত্তনের কথা শুনিলেন। তাঁহারা আনন্দিত হইলেন। সকলের আগে শ্রীবাস বলিলেন—"গোত্র বাড়াউক কৃষ্ণ আমা সভাকার"।

বৈষ্ণবেরা পাষণ্ডী পর্য্যুদস্ত ও যবনরাজভয়ে সন্ত্রস্ত। শ্রীবাসের ভয়ই সবচেয়ে বেশী। কেননা, ত'ার বাড়ীতেই বৈষ্ণবদের মিলন ও কীর্ত্তন হইয়া থাকে। পাষণ্ডীরা ত'ার ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। সুতরাং, দলপুষ্টি অর্থাৎ গোত্র বাড়াইবার জন্য শ্রীবাসের আগ্রহ সকলের অপেক্ষা অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ, নিমাই পণ্ডিতের মত দশজনের-একজন যদি তাহাদের দলভুক্ত হন তবে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য ও আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে? নিমাইয়ের অনুরোধমত শুক্লাম্বরের গৃহে পরের দিন সকল বৈষ্ণবেই মিলিত হইলেন।

সদাশিব মুরারি শ্রীমান শুক্লাম্বর।
মিলিলা সকল যত প্রেম অনুচর॥
হেনই সময়ে বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
আসিয়া মিলিলা যথা বৈষ্ণব সমাজ॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১ অঃ)

নিমাই পণ্ডিত বৈষ্ণব হওয়ার পূর্ব্বেই নবদ্বীপে একটি "বৈষ্ণব সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, পরস্পর স্বাভাবিক সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ, ভক্তিপক্ষে শাস্ত্র ব্যাখ্যাকারী পণ্ডিতদিগের এই ক্ষুদ্র দলটিই "বৈষ্ণব সমাজ"। পাষণ্ডীদের বাক্যযন্ত্রনা ও অন্যান্য উপদ্রব এই ক্ষুদ্র দলটির উপরেই নিক্ষিপ্ত হইতেছে। কাজেই

পাষণ্ডীদের উপর ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতেই এই বৈষ্ণব সমাজের মনোভাব্ অহিংস ছিল না, ছিল প্রতিহিংসামূলক। বৃন্দাবনদাসে এই সত্য ইতিহাসের ছবিই আমরা দেখিতে পাই।

শুক্লাম্বরের গৃহে নিমাই পণ্ডিত প্রধান প্রধান বৈষ্ণবদের সহিত মিলিত হইয়া "পরম আদরে সভে করেন সম্ভাষ"। ইহা বিনয়ের লক্ষণ, এবং পরিবর্ত্তন।

নিমাই পণ্ডিত ভাবাবেশে আবিষ্ট—"প্রভুর নাহিক বাহ্য দৃষ্টির প্রকাশ"। পণ্ডিত বৈষ্ণবেরা "পঢ়িতে লাগিলা শ্লোক ভক্তির লক্ষণ"। শুনিয়া নিমাই পণ্ডিত—

কৃষ্ণরে প্রভুরে মোর কোন দিকে গেলা
এত বলি প্রভু পুন ভূমিতে পড়িলা

* * *

পুনঃ পুনঃ হয় বাহ্য, পুনঃ পুনঃ পড়ে
দৈবে রক্ষা পায় নাকমুখ সে আছাড়ে।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১ অঃ)

ইহা কৃষ্ণ বিরহ—কৃষ্ণ পাইয়া পুনরায় হারাইলে যে বিরহ; এবং বায়ু জনিত মূর্চ্ছা রোগ; একসঙ্গে দুইয়েরই প্রকাশ বৈষ্ণবগণ দেখিলেন। বৈষ্ণবেরা এই অবস্থা দেখিয়া "নানা জনে নানা মতে করেন কথন"। কেহ বলিলেন "ঈশ্বর বা হৈল বিদিত"; নিমাইয়ের ভিতর হয়ত বা ঈশ্বর প্রকাশিত হইলেন। অপর এক বৈষ্ণব—সম্ভবতঃ পাষণ্ডী দ্বারা একটু বেশী আহত—তিনি বলিলেন—

—নিমাই পণ্ডিত ভাল হৈলে,
পাষণ্ডীর মুণ্ড ছিণ্ডিবারে পারি হেলে।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১ অঃ)

নিমাই পণ্ডিত দলে আসিলে অনায়াসে পাষণ্ডীর মুণ্ড ছিঁড়া যায়, কিন্তু তাঁ'র ভাল হওয়া দরকার। মূর্চ্ছা'র আক্রমণ হইতে এই বৈষ্ণব নিমাইকে মুক্ত দেখিতে চান। নতুবা পাষণ্ডীর মুণ্ড ছিঁড়া হেলায় হইবে না। কেহ বলে "হইবেক কৃষ্ণের রহস্য", ইহাতে কৃষ্ণের কোন গোপন অভিপ্রায় আছে—ক্রমে প্রকাশ হইবে। আবার কেহ বলেন ঈশ্বরপুরীর

সঙ্গই ইহার কারণ। সেই সঙ্গগুণে নিমাই গয়াতে সাক্ষাৎ কৃষ্ণের প্রকাশ দেখিয়াছেন। "ঈশ্বরপুরীর সঙ্গ হৈতে, কিবা দেখিলেন কৃষ্ণ প্রকাশ গয়াতে"। শেষ পর্য্যন্ত সমবেত বৈষ্ণবেরা নিমাই পণ্ডিতের উপর কৃষ্ণের অনুগ্রহ সত্য হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন। বুঝা যায় নিমাইয়ের প্রতি কৃষ্ণানুগ্রহে বৈষ্ণবেরা তখনো নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই। তাই তাঁহারা বলিলেন—"হউক হউক সত্য কৃষ্ণের প্রসাদ"—ইহা যেন মিথ্যা না হয়। কৃষ্ণের প্রসাদ সত্য হউক।

আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার বিষয়, বৈষ্ণবেরা নিমাই পণ্ডিতকে "সভে মিলি করিতে লাগিলা আশীর্ব্বাদ"। কৃষ্ণের অবতারত্ব নিমাইয়ের উপর তখনও আরোপিত হয় নাই। এবং তৎপূর্ব্বে নবদ্বীপের অপরাপর বৈষ্ণবদিগের নিকট তিনি পরম স্নেহভাজন আশীর্ব্বাদের পাত্র। অপর বৈষ্ণবদের বয়োজ্যেষ্ঠতা ইহার একটি কারণ।

এক বৎসরের মধ্যেই এমন অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আসিতেছে যে, বয়োকনিষ্ঠ এই সর্ব্ব বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদভাজন যুবক বৃদ্ধ আচার্য্য অদ্বৈতের মাথায়ও নিঃসঙ্কোচে পা তুলিয়া দিবেন। অদ্বৈত তাহাতে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিবেন। কারণ? তখন নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপনা ছাড়িয়া কৃষ্ণের অবতার হইয়া নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া, পাষণ্ডীদলন ও যবনরাজভীতি দূরীকরণ কার্য্যে বৈষ্ণব সমাজকে পরিচালিত করিবেন।

ভক্তিপক্ষে শাস্ত্র ব্যাখ্যা, অদ্বৈত নিমাইয়ের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই করিয়া আসিতেছেন। শ্রীবাসেরা চারি ভাই, নিমাই জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই কীর্ত্তন উপদ্রবে পাষণ্ডীদের জিঘাংসাকে পরিপুষ্ট করিতেছেন। পাষণ্ডীরা নিজেরা বাক্যজ্বালা যেপর্য্যন্ত পারে দিতেছে. আর যবন রাজার নিকট লাগানি করিয়া বৈষ্ণবদের উপলক্ষে নিতান্ত কাপুরুষ ও স্বজাতিদ্রোহী আহাম্মকের মত সমস্ত গ্রামের উপর যবন অত্যাচার বারবার ডাকিয়া আনিতেছে। বৈষ্ণব সমাজের সম্মুখে বিপদ দুইটি। প্রথম —পাষণ্ডী, দ্বিতীয়—যবনরাজভীতি। এই দুই সঙ্কটসমস্যা পূরণের ভার যে বীর যুবক গ্রহণ করিলেন তিনি বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও, নবদ্বীপের সকল. বৈষ্ণব শ্রীবাসের বাড়ীতে অভিষেক করিয়া তাহাকে অবিসংবাদি-

রূপে বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব ছাড়িয়া দিলেন। সেকথা পরে আসিতেছে।

শুক্লাম্বরের গৃহ হইতে সকল বৈষ্ণবদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, আপন কৃষ্ণভক্তি দেখাইয়া নিমাই পণ্ডিত গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু তাহার আবেশের ভাব গেল না—"ঠাকুর আবিষ্ট হই আছেন স্ববাসে"।

(৪) গয়া প্রত্যাগত নিমাইয়ের চতুর্থ পরিবর্ত্তন—তাঁহার গার্হস্থ্য জীবন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিলে পর নিমাই পিতামাতাকে বলিয়াছিলেন —"গৃহস্থ হইয়া করি পিতৃমাতৃ সেবন"। প্রথম যৌবনে ১৬ বৎসর বয়সে লক্ষ্মীকে বিবাহের পূর্ব্বেই তিনি ভাবিয়াছিলেন "গৃহস্থ হৈলাম এবে চাহি গৃহধর্ম্ম" (চৈঃ চঃ, আদি—১৫ পঃ), এবং এইরূপ ভাবিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয়বার বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়াছেন সত্য; সুন্দরী পতিগতপ্রাণা উদ্ভিন্নযৌবনা ভার্য্যা বিষ্ণুপ্রিয়া এখন নিমাইয়ের গৃহ শোভা করিতেছেন সত্য, কিন্তু যে কারণেই হউক গার্হস্থ্য হইতে নিমাইয়ের মন উঠিয়া গিয়াছে। "পূর্ব্ব বিদ্যা ঔদ্ধত্য না দেখে কোনজন—পরম বিরক্ত প্রায় থাকে সর্ব্বক্ষণ"—তখনকার মানসিক অবস্থার একখানি চিত্র। শচীমাতা—

> লক্ষ্মীরে (বিষ্ণুপ্রিয়া) আনিয়া পুত্র সমীপে বসায়
> দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়
> কখনো কখনো যে হুঙ্কার করয়ে
> ডরে পলায়েন লক্ষ্মী, শচী পায় ভয়ে
> রাত্রে নিদ্রা নাহি যান প্রভু কৃষ্ণ রসে
> বিরহে না পায় স্বাস্থ্য, উঠে পড়ে বৈসে।
>
> (চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১ অঃ)

স্তব্ধ নিশীথিনী। বিষ্ণুপ্রিয়াও হয়ত নিদ্রা যাইতে পারিতেছেন না। নিমাই বিরহে স্বাস্থ্য না পাইয়া উঠে, পড়ে, বৈসে। এ বিরহ কার জন্য? বিষ্ণুপ্রিয়া শয্যায়। বিষ্ণুপ্রিয়া ত এবিরহের পাত্রী নহেন। শুধু তাই নয়, স্বামীর এ বিরহে তিনি কোন শান্তিই দিতে পারিতেছেন না। কি দুর্ভাগ্য! লক্ষ্মীর মৃত্যুর দীর্ঘ ৬ বৎসর পর এই ঘটনা।

প্রাকৃতে ইহা লক্ষ্মীর জন্য বিরহ। অতিপ্রাকৃতে বা অপ্রাকৃতে রূপান্তরে ইহা কৃষ্ণের জন্য বিরহ। লক্ষ্মীর বিরহের কথা গ্রন্থ লেখে না, কোন গ্রন্থই না। সব গ্রন্থই বলে কৃষ্ণ-বিরহ।

প্রশ্ন প্রাকৃতে ইহার অঙ্কুর কোথায়? কোন অপ্রাকৃতই প্রাকৃত ছাড়া হইতে পারে না। কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত একত্রে শৃঙ্খলিত। অপ্রাকৃতের অঙ্কুর প্রথমে প্রাকৃতেই থাকিবে। মানব মনই অপ্রাকৃতের জন্মভূমি। মনের বাহির হইতে কিছু আসিলেও, আসামাত্রই তাহা মনেরি হইয়া গেল। প্রাকৃতে ও অপ্রাকৃতে এ বিরহ যুবক নিমাইয়ের মন হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। অন্য কোথা হইতে ইহা উদ্ভূত হয় নাই। ইহা এমন কিছু অলৌকিকও নয়। মনোবিজ্ঞান সম্মত ইহার সঙ্গত ব্যাখ্যা আছে। প্রথম ভালবাসার উপর অকস্মাৎ সর্পদংশনরূপ দুর্দ্দৈবের আঘাতপ্রসূত বিরহ নিমাইয়ের জাগ্রত সুষুপ্তি ও নিদ্রায় মনের গভীরতম প্রদেশে এমন নিবিড়ভাবে শিকড় গাড়িয়াছে যে, বিষ্ণুপ্রিয়া আর তাহার মূলচ্ছেদ করিতে পারিলেন না প্রথম ভালবাসার নিরাশ প্রেমিক সংসারকে অনিত্য বলিয়া সন্ন্যাস নিলেন, আর প্রিয়বিরহকেই ধর্ম্ম বলিয়া সুস্থ ও দিব্য-উন্মাদ দুই অবস্থাতেই জগতে প্রচার করিয়া গেলেন। এ ব্যাখ্যা চরিত গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া না থাকিলেও অসঙ্গত ত মনে হয় না। নিমাইয়ের এই মানসিক পরিবর্ত্তনের অবস্থার মধ্যেই শেষ ১২ বৎসরের দিব্যোন্মাদের অঙ্কুর আমরা দেখিতে পাই।

গয়া হইতে ফিরিয়া নিমাই পুরা এক বৎসর মাত্র গৃহে ছিলেন (১৫০৯-জানুয়ারী হইতে ১৫১০-জানুয়ারী)। কিন্তু গৃহী হইয়া ছিলেন কি-না সন্দেহ। গয়া হইতে ফিরিয়া নিমাই "ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়—লক্ষ্মীরে (বিষ্ণুপ্রিয়া) দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায়"। সুস্থ অবস্থায়, স্বজ্ঞানে নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে মারিতে ধাবিত হন নাই। ইহা তাঁহার মনে দ্বিতীয় স্তরে মগ্ন চৈতন্যের যে রাজ্য, তাহারই ক্রিয়া। মগ্ন চৈতন্যে ইহা আসিল কোথা হইতে? কিসের অভাব, কিসের আঘাত এই প্রতিভাবান যুবকের মনকে উত্তেজনায় বিকৃত উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে? সমগ্র মনোরাজ্যের ক্রিয়াকলাপ বিচারবিশ্লেষণের পথে এমন সকল নব আবিষ্কৃত তথ্যের সন্ধান দিতেছে, যাহা অন্ধকার পথে

হঠাৎ দামিনী ঝলকে সর্প দর্শনের মত বিভীষিকার সৃষ্টি করে। মনের মগ্ন চৈতন্য এখন আবিষ্কার ও বিশ্লেষণ হইতেছে।

(৫) পঞ্চম পরিবর্ত্তন—নিমাইয়ের অধ্যাপকলীলার অবসান। গয়া হইতে ফিরিয়া নিমাই পণ্ডিত তাঁহার বিদ্যাগুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কথায় ছাত্র পড়াইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পারিলেন না।

তিনি ইচ্ছা করিয়া অধ্যাপনা পরিত্যাগ করেন নাই। অধ্যাপনাই তাহাকে পরিত্যাগ করিল। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় মনে হয় তিনি খুব দুঃখিত মনে অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই দৃশ্যটি বড়ই করুণ।

গয়া হইতে ফিরিয়া শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের সহিত মিলিত হইয়া, পরে তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। তীর্থ হইতে ফিরিয়া গুরুকে প্রণাম করা নিমাই কর্ত্তব্য মনে করিলেন।

গুরুর করিলা প্রভু চরণ বন্দন
সম্ভ্রমে উঠিয়া গুরু কৈলা আলিঙ্গন।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১ অঃ)

গুরু-শিষ্য মিলনের কি মহিমাময় চিত্র!

গঙ্গাদাস বলিলেন, গয়ায় পিণ্ড দিয়া তুমি পিতৃমাতৃকুল উদ্ধার করিলে, তুমি ধন্য। এখন আজ বাড়ী যাও, কাল হইতে তোমার ছাত্রদের আবার পড়াও। তারা তোমাকে ছাড়া আর কাহারও নিকট পড়িবে না—"পুঁথি কেহ নাহি মেলে ব্রহ্মা বলে যদি"।

নিমাইয়ের ছাত্রদের অধ্যাপকপ্রীতি এই এক কথায় প্রকাশ পাইতেছে।

নিমাই উদীয়মান, প্রতিভাবান অধ্যাপক। ছাত্র অবস্থায় মুরারি, মুকুন্দ ও গদাধরের প্রতিদ্বন্দী; দিগ্বিজয়ী জয়ী; ব্যাকরণের স্বাধীন টীকাকার। ন্যায়, স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার ও ব্যাকরণ তিনি শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। পূর্ব্ব বঙ্গের বিদ্যাকেন্দ্রে দুই মাস ছাত্র পড়াইয়া ছাত্রদের উপাধি দিয়া আসিয়াছেন। সেখানে তাঁহার ব্যাকরণের টীকা অধ্যাপকেরা

পড়াইতেছেন। তাহার পাণ্ডিত্যপ্রতিভায় পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের বিদ্যাকেন্দ্র সমুজ্জল। সমস্ত চরিত গ্রন্থেই ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথম যৌবনে যেমন তিনি প্রেমিক ছিলেন, তেমনি ছিলেন বিদ্যাবিলাসী—পাণ্ডিত্যগর্ব্বে অসাধারণ দাম্ভিক। নিমাইয়ের পক্ষে অধ্যাপনা পরিত্যাগ খুব সহজ ব্যাপার নয়।

প্রথমদিন অনুরোধে প্রভু বসিলেন পড়াইতে।

কিন্তু পড়াইতে বসিয়া সকল শাস্ত্রে হইতেই তিনি ঐ এক কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখা করিলেন। ইহা অবশ্য প্রচলিত শাস্ত্র ব্যাখ্যা নয়।

তিনিও পূর্ব্বে এরূপ ব্যাখা করিতেন না। গয়া হইতে আসিয়া ইহা তাহার মানসিক পরিবর্ত্তন। ছাত্রেরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিল, তাহারা নির্বোধ নয়।

তারপর, তিনি নবদ্বীপের অধ্যাপকদের গালি দিতে আরম্ভ করিলেন।

মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি, যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্র মর্ম্ম নাহি জানে॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় মাত্র শাস্ত্র বহি' মরে॥
(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১ অঃ)

তারপরে—

পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারখারে।

যে যুগসমস্যা সম্পূরণের জন্য বৈষ্ণব সমাজের নেতারূপে তাঁহার নিকট আহ্বান আসিয়াছে, ভবিষ্যতের সেই সিংহদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি পাষণ্ডীপূর্ণ, যবনরাজভীতি আচ্ছন্ন নবদ্বীপের টোলের অসার শাস্ত্রীয় তর্কবিচারকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর মনে করিলেন। যুগপ্লাবনের কর্ণধারেরা সকল দেশে সকল যুগেই এরূপ মনে করিয়া থাকেন।

এতক্ষণ ছাত্রদের যাহা বলিলেন, তাহা আবিষ্ট হইয়া বলিলেন। বাহ্য পাইয়া 'লজ্জিত হইয়া' ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করিলেন—

আজ আমি কোনরূপ সূত্র বাখানিল ?
পড়ুয়া সকল বলে "কিছু না বুঝিল" ॥

ষোড়শ শতাব্দীর টোলের ছাত্রেরা বাঙ্গালীর ভাবী ভারতব্যাপী বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতাকে বুঝিল না। ইহা সত্য কথা এবং বড় দুঃখের কথা।

বাড়ীতে আসিলে শচীমাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—

মায়ে বলে—"আজি বাপ কি পুঁথি পড়িলা"।
কাহার সহিত কিবা কন্দল করিলা।

পুত্রের স্বভাব শচীমাতা জানিতেন কিনা! প্রভু বলে—"আজি পড়িলাম কৃষ্ণনাম"।

তারপর তিনি মাতাকে ভাবী বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে নীতিবাদ ও সামাজিক সাম্যবাদ, তার পূর্ব্বাভাষ দিলেন—

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে—যদি কৃষ্ণ বোলে
বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎ পথে চলে ॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১ অঃ)

অসৎ পথে চলিলে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ নয় আর সৎপথে চলিলে চণ্ডালও চণ্ডাল নয়—ইহা প্রচলিত হিন্দু সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহ। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম, প্রচলিত ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ ভাঙ্গিয়া দিয়া এক কৃষ্ণ ভজনের উপর ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের সমান অধিকার ঘোষণা করিয়া সাম্যবাদী এক নূতন সমাজবিন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। অভ্যুত্থানকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইহা খুব বড় বিশেষত্ব।

প্রচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই শচীমাতার নিকট নিমাই তাঁহার ভাবী সমাজসংস্কারের আদর্শ স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন। কোন অস্পষ্টতা নাই।

ছাত্রেরা নিমাইয়ের কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যা বুঝিতে না পারিয়া নিমাইয়ের অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট প্রভাতে গিয়া সমস্ত কথা বলিল। ছাত্রেরা পরামর্শ চাহিল—"কি করিব আমি সব বোলহ পণ্ডিত।"

গঙ্গাদাস পণ্ডিত বিকালে নিমাইকে সঙ্গে লইয়া আসিতে বলিলেন। নিমাই আসিলেন। গঙ্গাদাস নিমাইয়ের পাণ্ডিত্যের অশেষ প্রশংসা

করিলেন—"তুমিহ পরম যোগ্য ব্যাখ্যাতে টীকার" এবং শেষে দিব্য দিয়া বলিলেন—

ভালমতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পড়াও
ব্যতিরিক্ত অর্থ কর মোর মাথা খাও ॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১ অঃ)

নিমাই তাঁহার অভিনব কৃষ্ণতত্ত্বমূলক শাস্ত্র ব্যাখ্যার ভ্রম স্বীকার করিলেন না।

আমি যে বাখানি সূত্র করিয়া খণ্ডন
নবদ্বীপে ইহা স্থাপিবেক কোনজন ?
নগরে বসিয়া এই পঁড়াই গিয়া।
দেখি কার শক্তি আছে দূষুক আসিয়া ॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১ অঃ)

সেই দম্ভ সেই তেজ। কৃষ্ণপ্রেম বা বায়ুরোগ কিছুতেই তাহাকে ম্লান করিতে পারে নাই।

গঙ্গার ঘাটে বসিয়া সেই দিনই চারি দণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত ছাত্রদের "সন্ধিকার্য্য" অর্থাৎ ব্যাকরণ আর "শব্দজ্ঞান" অর্থাৎ ন্যায়দর্শন বিধিমত পড়াইলেন। রত্নগর্ভ আচার্য্য "প্রভুর বাপের সঙ্গী, জন্ম এক গ্রাম" অদূরে উচ্চৈঃস্বরে ভাগবতের শ্লোক পড়িতেছিলেন। হঠাৎ দৈবে "প্রভুর কর্ণেতে আসি করিল প্রবেশে"! আর যাবে কোথায়! "সেইক্ষণে পড়িলেন মূর্চ্ছিত হইয়া"। রত্নগর্ভ ছুটিয়া আসিলেন। নিমাই তাঁহাকে ঐ শ্লোক পুনরায় পড়িতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তারপর গদাধর আসিয়া পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন; "না পড়িহ আর, বলিলেন গদাধর"। নিমাইয়ের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাঞ্চল্য করিলাঙ আমি?" ছাত্রেরা স্তব্ধ বিস্ময়ে প্রশংসা করিতে উদ্যত দেখিয়া "আপ্তগণে নিবারিল—না করিহ স্তুতি"। কেননা, স্তুতি শুনিয়া আবার মূর্চ্ছা হইতে পারে।

তিনটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১ম, ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রের বিধিমত ব্যাখ্যা তিনি ভুলিয়া যান নাই। ২য়, রত্নগর্ভের ভাগবতের শ্লোক শুনিয়া নিমাই মূর্চ্ছা গেলেন। ৩য়, মূর্চ্ছাকালের ব্যাপার তাঁহার স্মরণে

থাকে না। আগে ভাবের আবেশ হয়, পরে তিনি মূর্চ্ছা যান। বাহির হইতে ভাবের প্রেরণা আসিলে তিনি আর তাহার গতিবেগ রোধ করিতে পারেন না। কৃষ্ণপ্রেম ও বায়ুরোগের একত্র মিশ্রণ দেখা যায়। বিশ্লেষণে কারণ ও কার্য্য সম্পর্ক লক্ষ্য হয়। বাহিরের প্রেরণায় কৃষ্ণপ্রেম মনে উদয় হয়। উদয় হওয়া মাত্রই বায়ুজনিত মূর্চ্ছা আসিয়া পড়ে। মানসিক অবস্থার এই বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রয়োজন। কেননা দিব্যোন্মাদের শেষ দ্বাদশ বৎসর এইরূপ মানসিক অবস্থারই পূর্ণ পরিণতি ভিন্ন আর কিছু নহে। দিব্যোন্মাদ একদিনে হয় নাই।

পরের দিন ভোরে গঙ্গাস্নান করিয়া নিমাই তৃতীয়বার ছাত্র পড়াইতে বসিলেন। "পঢ়ুয়া সকল বোলে ধাতু সংজ্ঞা কর"। ইহা ব্যাকরণের প্রশ্ন। নিমাই উত্তর দিলেন—দার্শনিক তত্ত্বের দিক হইতে। "সর্ব্বদেহে ধাতুরূপে বৈসে কৃষ্ণশক্তি"। "হয়-নয়" ছাত্রদের বুঝিয়া দেখিতে বলিলেন। 'দৃষ্টান্ত দিলেন—

এবে যারে নমস্করি কর মান্যজ্ঞান
ধাতু গেলে তারে পরশিলে করিস্নান
যে বাপের কোলে পুত্র থাকে মহাসুখে
ধাতু গেলে সেই পুত্র অগ্নি দেই মুখে।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১ অঃ)

পরমার্থতত্ত্বে জীব-চৈতন্যে কৃষ্ণের অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তির সর্ব্বব্যাপীত্ব তিনি বুঝাইলেন। তবে ইহা ব্যাকরণগত অর্থ নয়। ছাত্রেরা বলিল—

যতেক বাখান তুমি সব সত্য হয়
সভে যে উদ্দেশে পড়ি, তার অর্থ নয়।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১ অঃ)

ছাত্রেরা ঠিকই বলিল। ব্যাখ্যার কোনই ভুল নাই। তবে অন্যান্য টোলে অধ্যাপকেরা যে অর্থে "ধাতু" ব্যাখ্যা করেন, ইহা তা নয়। নিমাইও তো একথা স্বীকার করেন। নিমাই বলেন, অন্য অধ্যাপকেরা "গর্দ্দভ"। তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারে না। "ভ্রমবশে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা"। নিমাই নিঃসন্দেহ হইতে পারিলেন না। ছাত্রদের কাছে

নিজেই স্পষ্ট স্বীকার করিলেন যে, বায়ুরোগে তিনি বিহ্বল। কি ব্যাখ্যা করেন, তা তিনি নিজেই ভুলিয়া যান। "বায়ু বা আমারে করিয়াছে বিহ্বল"।

ছাত্রদের তিনি দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ১ম, কি তিনি ব্যাখ্যা করেন? ২য়, "কোনরূপ দেখহ আমারে"? ছাত্রেরা বলিলেন, সবতাতেই কৃষ্ণ ব্যাখ্যা কর, আর দেখি তোমার মূর্চ্ছা, কম্প, অশ্রু! "লালা, ঘর্ম্ম, ধূলায় ব্যাপিত গৌর জ্যোতি"! প্রকৃত কথা আজ দশ দিন আমাদের পড়া হইতেছে না। তবে "মূলে যে বাখান তুমি জ্ঞাতব্য সেই সে"।

ছাত্রেরা উপাধির জন্য আসিয়াছেন। বিশ্বের চরমতত্ত্বে যা 'জ্ঞাতব্য', তা জানিতে আসেন নাই। নিমাই বুঝিলেন—"আমার এ সব কথা অন্যত্র অকথ্য"। তারপরের দৃশ্য বড়ই করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। ছাত্রদের তিনি এই বলিয়া বিদায় সম্ভাষণ দিলেন—

তোমা সভা স্থানে মোর এই পরিহার
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার
তোমা সভাকার যার স্থানে চিত্তলয়
তার ঠাঞি পড়, আমি দিলাম নির্ভয়।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১ অঃ)

আশীর্ব্বাদ করিলেন—

দিবোসেকো যদি আমি হই কৃষ্ণদাস
তবে সিদ্ধ হউ তোমা সভা অভিলাষ
তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১ অঃ)

সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায়, স্বাভাবিক ভাবে অতি সুন্দর কথা। তার পর বলিলেন, তোমরা সকলে মিলিয়া একত্রে কৃষ্ণ বলিবা এই আমার অনুরোধ।

সভে মিলি কৃষ্ণ বলিবাঙ এক ঠাঞি
এই বোল মহাপ্রভু সভারে কহিয়া
দিলেন পুঁথিতে ডোর অশ্রুযুক্ত হৈয়া।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১ অঃ)

অশ্রুযুক্ত হৈয়া—দিগ্বিজয়ী জয়ী, পূর্ব্ববঙ্গের বিদ্যাকেন্দ্রের সম্মানিত অধ্যাপক ব্যাকরণের মৌলিক টীকাকার, বিদ্যাবিলাসে অপরিমেয় দাম্ভিক যুবা—পুঁথিতে ডোর দিলেন! শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ অপেক্ষা ইহা কম ত্যাগ নয়। নিমাই পণ্ডিতকে কাঁদিতে কাঁদিতে অধ্যাপকলীলা ছাড়িতে হইয়াছিল। গয়া হইতে ফিরিয়া নিমাই চারি মাস ছাত্রদের পড়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারিলেন না।

একটা কথা মনে হয়। টোলের ছাত্রদের কি তিনি বৈষ্ণব করিয়া দলে আনিবার জন্য এই চারি মাস কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছিলেন? ভবিষ্যতের ইতিহাস নিশ্চয়ই তিনি মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন। "এক ঠাঞি" দলবদ্ধ হইয়া, একা একা নয়, কৃষ্ণ নাম করিবার অনুরোধই ত ছাত্রদের প্রতি নিমাইয়ের শেষ অনুরোধ। তিনি দেখিলেন ছাত্রেরা সম্মত হইল না। প্রচলিত পথ ছাড়িতে ছাত্রদের ভরসা হইল না। ষোড়শ শতাব্দীর টোলের ছাত্রদের নিকট নিমাই যদি কিছু আশা করিয়া থাকেন তবে তরুণ ছাত্রেরা তাঁহাকে সেদিন নিরাশ করিয়াছিল। তরুণেরা ঠিক তরুণ ছিল না। তাহারা নিতান্তই গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছিল। নিমাইয়ের আহ্বানে নবদ্বীপের টুলো ছাত্রেরা সেদিন সাড়া দেয় নাই—দিয়াছিল বয়োবৃদ্ধ নবদ্বীপের বৈষ্ণবেরা, আর দিয়াছিল "মূর্খ নীচ দরিদ্র আচণ্ডাল" বিরাট জনসংঘ। ইহা খুব লক্ষ্য করিবার বিষয়। অথচ তরুণ ছাত্রদেরি আগে সাড়া দেওয়ার কথা ছিল। হিন্দু সমাজে গতানুগতিকতা অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল। সমাজে নূতন কিছু করিবার দুঃসাহস ও ক্ষমতার একান্ত অভাব ছাত্রদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাইতেছে।

এই অভাব মোচনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার। এবং তাঁহার যুগের অভাব মোচন করাতে তিনি এক নব-যুগ প্রবর্ত্তক যুগ অবতার। "সম্ভবামি যুগে যুগে" যাঁহারা, তিনি তাঁহাদেরি একজন।

বৃন্দাবনদাস নিমাইয়ের বিদ্যাবিলাসের উপসংহারে আক্ষেপ করিতেছেন এই বলিয়া যে, তিনি ইহা চক্ষে দেখিতে পাইলেন না। কেন না তখন (১৫০৯ খৃঃ, মে মাস) তিনি জন্মেন নাই।

হইল পাপীষ্ঠ—জন্ম নহিল তখনে।
হইলাঙ বঞ্চিত—সে সুখদরশনে।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১ অঃ)

মাতা নারায়ণীর নিকট এই সমস্ত আখ্যান তিনি শুনিয়া লিখিয়া থাকিবেন। নারায়ণী সম্ভবতঃ কথাপ্রসঙ্গে পুত্রকে বলিয়াছিলেন যে, তখনও তিনি জন্মেন নাই। ইহা ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসের ঘটনা।

নিমাই অধ্যাপনা ছাড়িয়া দিলে শচীদেবী মহাভীতা হইলেন। বৈষ্ণবেরা নিমাইয়ের কৃষ্ণপ্রেমের আবেশ দেখিলেও, শচীমাতার তাহা বিশ্বাস হইল না। তিনি লোক ডাকিয়া পুত্রকে দেখাইতে লাগিলেন। সকলেই বলিলেন, বায়ুরোগ—দুই পায়ে বাধিয়া রাখ—শিবাঘৃত প্রয়োগ কর—পাকতৈল শিরে দাও—ডাবু নারিকেলের জল খাওয়াও।

শচীমুখে শুনি যায় যে যে দেখিবারে।
বায়ুজ্ঞান করি সভে বোলে বাধিবারে॥
পাষণ্ডী দেখিয়া প্রভু খেদারিয়া যায়।
বায়ুজ্ঞান করি লোক হাসিয়া পলায়॥
আস্তে ব্যাস্তে মায়ে গিয়া আনয়ে ধরিয়া।
লোকে বলে পূর্ব্ব বায়ু জন্মিল আসিয়া॥
লোকে বলে তুমিত অবোধ ঠাকুরাণী।
আর বা ইহার বার্ত্তা জিজ্ঞাসহ কেনি॥
পূর্ব্বকার বায়ু আসি জন্মিল শরীরে।
দুইপায়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে॥
খাইবার দেহ ডাবু নারিকেল জল।
যাবৎ উন্মাদ বায়ু নাহি করে বল॥
কেহ বলে ইথে অল্প ঔষধে কি করে।
শিবাঘৃত প্রয়োগে সে এ বায়ু নিস্তরে॥
পাকতৈল শিরে দিয়া করাইবা স্নান।
যাবত প্রবল নাহি হইয়াছে জ্ঞান॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২ অঃ)

শচীদেবী পুত্রের অবস্থা দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।

শ্রীবাসাদি বৈষ্ণব—সভার স্থানে স্থানে।
লোকদ্বারে শচী করিলেন নিবেদন॥

শ্রীবাস আসিয়া দেখিয়া বলিল—

মহা ভক্তিযোগ—বায়ু বলে কোনজনে।

নিমাই বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীবাসকে বলিলেন যে, সকলেই ত আমাকে পাগল সাব্যস্ত করিয়া বাধিতে বলিতেছে। যদি তুমিও তাই বলিতে তবে আমি গঙ্গায় আজ ডুবিয়া মরিতাম।

যদি তুমি বায়ু হেন বলিতা আমারে।
প্রবেশিতোঁ আজি আমি গঙ্গার ভিতরে॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২ অঃ)

শচীমাতাকে শ্রীবাস আশ্বাস দিয়া বলিয়া গেলেন যে, "বায়ু নহে কৃষ্ণভক্তি বলিল তোমারে"। "এতেক কহিয়া শ্রীবাস গেলা ঘর—বায়ু জ্ঞান দূর হৈল শচীর অন্তর"। তথাপি শচীমাতা অন্তরে ভীতা— "বাহিরায় পুত্র পাছে এই মনে ভয়"। বিশ্বরূপের সন্ন্যাস তাঁহার মনে একটা স্থায়ী আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে।

নিমাই দেহ ও মনে সাধরণ মানুষের মত সুস্থ ছিলেন না, ইহা নিশ্চয়। যে কারণেই হউক বায়ু রোগের ক্রিয়া যে তাঁহার কার্য্যকলাপে দেখা গিয়াছে—ইহাও নিশ্চয়। বায়ুরোগ একটা মানসিক ব্যাধি। নিমাইয়ের মন ত সুস্থ ছিলই না। কৃষ্ণ বিরহে তিনি উন্মাদ। বায়ুব্যাধি যদি কৃষ্ণ বিরহের কারণ না হয়, কৃষ্ণ-বিরহও ত বায়ুব্যাধির কারণ হইতে পারে। বায়ু বা ব্যাধি ছিল না, ইহা বলা সত্যের অপলাপ। জীবনের বাস্তব ঘটনা অস্বীকার করিয়া জীবনলীলার ব্যাখ্যা সত্য ব্যাখ্যা নয়। কেবল তত্ত্ব দিয়া জীবন ব্যাখ্যা চলে না, জীবন হইতেই তত্ত্বের উদ্ভব। কল্পিত আদর্শ বা তত্ত্ব হইতে জীবন জটিল, জীবন বড়। ইতিহাসের যাঁহারা নিয়ামক, তাঁহাদের চরিত ব্যাখ্যায় তত্ত্ব বা আদর্শবাদী হওয়া অপেক্ষা জীবনবাদী হওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

আর নিমাইয়ের বায়ু ব্যাধি স্বীকার করাতে সঙ্কোচের কথাই বা কি? ইতিহাসের কোন বড় প্রতিভাই ত চিকিৎসকের পরীক্ষায়, কি দেহে কি মনে, সাধারণ মানুষের মত সুস্থ দেখা যায় না। উত্তেজনা মাত্রই

অসুস্থতা। প্রতিভার মধ্যে সর্ব্বদাই একটা অসাধারণ উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়। নিমাইয়ের মনে এই উত্তেজনা প্রবল ও প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়া করিতেছিল। তাহাতে বায়ুর সঞ্চার হইতে পারে ইহা আশ্চর্য্য নয়, বরং স্বাভাবিক। বংশানুক্রমেও ইহা জন্মিতে পারে। কত কারণ আছে, আমরা কি সব জানি? ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে মথুরার পথে পাঠান সৈন্যদের প্রভু নিজমুখে বলিয়াছিলেন—"মৃগী ব্যাধিতে আমি হই অচেতন" (চৈঃ চঃ, মধ্য—১৮ পঃ)। বায়ু বা মৃগী এইরূপ একটা ব্যাধির কথা বৃন্দাবনদাস, কবিরাজ গোস্বামী আদি চরিত লেখকেরা সকলেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা মিছা কথার এত উল্লেখ করিবেন কেন?

অধ্যাপকের কার্য্য ছাড়িয়া এইবার নিমাই পণ্ডিত বৈষ্ণবদের সহিত মিলিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিবেন। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—"বৎসরেক কীর্ত্তন করিলা যেন মতে"। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"রাত্রে সংকীর্ত্তন কৈল এক সংবৎসর"। এই উপলক্ষে তিনি 'বৈষ্ণব সমাজ'-কে আরো ব্যাপকভাবে সংঘবদ্ধ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতের অনুরোধে এবং সকল বৈষ্ণবের সম্মতিক্রমে ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন আর ইতিহাসের এক গৌরব উজ্জ্বল পথে ইহাকে চলিতে শিখাইবেন। ইহাই ষষ্ঠ পরিবর্ত্তন।

কিন্তু এই বৎসরেক কীর্ত্তনের ভিতর প্রবেশের পূর্ব্বে গয়া হইতে ফিরিয়া নিমাইয়ের যে ছয়টি পরিবর্ত্তনের কথা বৃন্দাবনদাসের মুখে শুনিলাম, সেই সকল আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অপর চরিত লেখকেরা কে কি বলেন তাহাও আমাদের শুনা কর্ত্তব্য।

জয়ানন্দ গয়া প্রত্যাগত নিমাইয়ের স্পষ্ট বায়ুরোগের উল্লেখ করেন নাই। তবে বর্ণনায় তা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

১। মহানৃত্য দেখি সভার লাগে ডর॥
হাড়মাস চূর্ণ হয় আছারের ঘাএ।
দন্ত কড়মড় শব্দে শুনি ত্রাস পাএ॥

(চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)

২। তারপর শচীমাতা প্রবোধ দিলেন—
শচী বলে গয়া গেলা বাপ উদ্ধারিতে
এমন রোদন নাই—কীর্ত্তনে নাচিতে॥

দিনে দিনে ভাল হবে মায়ের মনে সুখ।
সকল লোক পাসরিল দেখি চাঁদমুখ ॥
অল্পকালে বাপছোড় হইলে তুমি বাছা।
পড়িশুনি ভাল হইলা মায়ের মনের ইৎসা ॥
সভারে পুষিবে তুমি সভার ঈশ্বর।
নানা সুখ করি গৃহে বাপ বিশ্বম্ভর ॥
খাও বিলাহ রাখ সে তোমার ইৎসা।
উদ্ধত হইলে বাপু আমি যাই মুৎসা ॥

(চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)

জয়ানন্দের শচীমাতার প্রবোধটী বড় সুন্দর। ইহাতে বাৎসল্য-মাখা সামান্য ভর্ৎসনাও আছে। ইহা খাঁটি এবং জীবন্ত। কাব্যে ভাল ফুটিয়াছে। লোচনে ইহা নাই।

বৃন্দাবনদাসে যে শচীমাতা আছেন, তিনি বাৎসল্যে পূর্ণ, কিন্তু বড় ভীরু এবং শঙ্কিতা। এতটুকুও শক্তি তাঁর নাই। জয়ানন্দের শচীমাতায় মায়ের বাৎসল্য আছে, আবার মায়ের অভিমানগর্ব্বও অছে।

নিমাই মায়ের কথায় কিঞ্চিৎ সুস্থ বা সায়েস্তা হইলেন—"মায়ের করুণা শুনি ভাব সম্বরিল"।

(৩) জয়ানন্দের গয়াপ্রত্যাগত নিমাইয়ের মধ্যে পুনরায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা আরম্ভের একটা চেষ্টা দেখা যায়। "কথোদিন পরিব পরাব নিরন্তর—এই যুক্তি দিল আচার্য্য রত্ন বিদ্যাধর ॥" ইনিই সম্ভবতঃ বৃন্দাবনদাসের গঙ্গাদাস পণ্ডিত।

নিত্য বলি বৈশ্য শ্রাদ্ধ স্নানতিনবার।
ত্রি সন্ধ্যা আরম্ভিল ব্রহ্মকুলের আচার ॥

(চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)

বুঝা যায় কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদ নিমাই এই সমস্ত ব্রহ্মকুলের আচার কিছুদিন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

মন্ত্র জাপ্য স্তবপাঠ ধ্যান ধারনা।
ক্ষনে অধ্যয়ন ক্ষনে ধ্যান পরায়না ॥

(চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)

"ধ্যানপরায়ণ" নিমাইকে জয়ানন্দ ছাড়া আর কেহ দেখান নাই।

লীলার এই অংশের বর্ণনায় জয়ানন্দও লোচনের মতই অসম্পূর্ণ, তবে যেটুকু আছে তা খাঁটি। রাধা-ভাবের মাথুর বিরহের উল্লেখও জয়ানন্দে নাই। এইখানে লোচন হইতে জয়ানন্দ স্বতন্ত্র। উভয়েই বৃন্দাবনদাস হইতে নিম্নশ্রেণীর কবি।

লোচন বলেন—(১) অধ্যাপকের কার্য্য ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে নিমাই ছাত্রদের বলিতেছেন—

পড় এক সত্যবস্তু কৃষ্ণের চরণ।
সেই বিদ্যা যাহে হরি ভক্তির লক্ষণ॥
বিদ্যাধন কুলমদে কৃষ্ণে নাহি পায়।
ভক্তিতে সে অনায়াসে পাই যদুরায়।

(চৈঃ মঃ, মধ্য খণ্ড)

ইহা বৃন্দাবন দাসের অনুরূপ।

(২) নিমাইয়ের কৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ততায়, লোচনে রাধিকার ভাব বৃন্দাবনদাস অপেক্ষা বেশী ফুটিয়াছে।

রাধাভাবে বিহ্বল হইয়া কাঁদে ডাকে।
মাথুর বিরহে নিজ হাত মারে বুকে॥

(চৈঃ মঃ, মধ্য খণ্ড)

লোচন মাথুর বিরহের রাধিকার কুব্জার প্রতি ঈর্ষার কথাও বলিয়াছেন—"কুব্জা কুৎসিৎ মতি কৃষ্ণ নিলিমোর"। কৃষ্ণকে নিমাই গালাগালিও দিতেছেন—"শঠ অতি লম্পট যুবতী মনচোর"।

(৩) নিমাইয়ের গর্জ্জন ও হুঙ্কারের কথাও আছে—"ইহা বলি কাঁন্দে ডাকে গরজ হুঙ্কার"। শচীমাতা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন —"কি লাগিয়া কাঁদ বাপু তোর দুঃখ কিসে॥"

নিমাই উত্তর দিলেন না—"মায়ের বচন শুনি না দিলা উত্তর॥"

(৪) বায়ুরোগের উল্লেখ লোচন করেন নাই। তবে বৃন্দাবন-দাসের অনুরূপ বর্ণনা আছে।

(ক) সন্ধ্যার সময় প্রশ্ন করয়ে দিবস
দিবসে পুছয়ে প্রভু কত রাত্রি যায়।

(খ) কৃষ্ণ নাম গুণ যশ কেহ যদি গায়
শুনিয়া তখন কাঁদে ভূমিতে লোটায় ॥

(গ) ক্ষণে দণ্ডবৎ করি করে প্রণাম
ক্ষণে উচ্চৈঃস্বর করি করে কৃষ্ণনাম ॥
সকরুণ কণ্ঠ ক্ষণে কম্প কলেবর।
পুলকিত অঙ্গ জিনি কদম্ব কেশর ॥

(চৈঃ মঃ, মধ্য খণ্ড)

(৫) যে সকল ভক্তেরা আসিয়া তখন মিলিত হইল তা'দের নামের একটি দীর্ঘ তালিকা লোচন দিয়াছেন। তা'র মধ্যে নরহরির নামও আছে।

মিলিলেন গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি
নরহরি মিলিয়া রহিল তাঁর ঠাঞি।

(চৈঃ মঃ, মধ্য খণ্ড)

নরহরির নাম গোবিন্দের করচাতেও আছে। সুতরাং বৃন্দাবনদাস ইচ্ছা করিয়াই নরহরির নামোল্লেখ করেন নাই। ইহার কারণ কি ?

এক অনুমান ভিন্ন আর ত কোন প্রমান পাওয়া যায় না। নরহরি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, বিশিষ্ট পূজ্যপাদ ভক্ত। শ্রীচৈতন্য নরহরিকে "প্রাণের নরহরি" বলিয়াছেন। নরহরি নদীয়ানাগরী ভাবের প্রবর্ত্তক। বৃন্দাবন-দাস স্পষ্ট এই নদীয়ানাগরী ভাবের বিরোধী। নরহরি শ্রীচৈতন্যকে ভাবিতেন কৃষ্ণ, আর নিজেকে ভাবিতেন রাধা। কিন্তু নরহরির রাধা-ভাবের জন্য বৃন্দাবনদাস তাঁহাকে উপেক্ষা করেন নাই—ইহা নিশ্চয়। কেননা, রাধাভাব ত গদাধরেও ছিল। গদাধরের নাম ত বৃন্দাবনদাস উল্লেখ করিয়াছেন। তবে লীলার সাহচর্য্যে নরহরি অপেক্ষা গদাধরের প্রয়োজন বেশী। গদাধর অপরিহার্য্য, গদাধরের নাম উল্লেখ না করিয়া উপায় নাই, এই যা বলা যাইতে পারে।

অন্য গুরুতর কারণ থাকা সম্ভব। তবে তাহাও অনুমান মাত্র। ১ম, কোন কারণে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সহিত নরহরির বিরোধ ছিল। বৃন্দাবনদাস নিজেই লিখিয়াছেন যে, একদল লোক নিত্যানন্দের বিরোধী

ছিল। বৃন্দাবনদাস তাহাদের মাথায় লাথি মারিতে চাহিয়াছিলেন—'তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে'। নরহরি নিত্যানন্দ-বিরোধী হইয়া বৃন্দাবনদাসের অবজ্ঞার পাত্র হইতে পারেন। যেখানে লাথির কথা আছে সেখানে গ্রন্থে নামোল্লেখ না করা এমন বেশী কি! ২য়, যদি বৃন্দাবনদাসের অলৌকিক জন্মের জন্য নরহরি শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রতি কোন কুৎসিৎ ইঙ্গিত করিয়া থাকেন। কেননা নিত্যানন্দ শ্রীবাসের বাড়ীতে থাকাকালেই নিমাই নারায়ণীকে ভোজনাবশেষ দেন। নারায়ণীও তখন শ্রীবাসের বাড়ীতেই ছিলেন। পরে মামগাছীতে অতি বাল্যকাল হইতেই বৃন্দাবনদাস শ্রীপাদ নিত্যানন্দের কৃপাপাত্র ছিলেন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন।

নিমাইয়ের গয়া হইতে ফিরিয়া প্রথম কৃষ্ণ প্রেমের উন্মেষে লোচন রাধার ভাবে মাথুর বিরহের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, ময় কুব্জার প্রতি ঈর্ষা ও তজ্জনিত কৃষ্ণকে শঠ, লম্পট বলিয়া গালাগালি দেওয়া পর্য্যন্ত—তা একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। গম্ভীরার লীলাখেলা আগে হইতেই নবদ্বীপে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে মনে হয়। এবং ইহাতে নরহরির অনুপ্রেরণা কতটা কিভাবে আছে বলা কঠিন।

তারপর কবিরাজ গোস্বামী—

গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিমাই পণ্ডিত "বিপরীত" চালায় একথা তিনি স্পষ্ট লিখিয়াও সবিস্তারে বর্ণনা করেন নাই।

পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত
গয়া হইতে আসিয়া চালায় বিপরীত।

(চৈঃ চঃ, আদি—১৭পঃ)

(১) "বায়ু ব্যাধির" কথা কবিরাজ গোস্বামী উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা নিমাইয়ের স্বেচ্ছাকৃত "ছলনা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা নিমাইয়ের স্বেচ্ছাকৃতও নয়, আর ছলনাও নয়। ইহার বিরুদ্ধে নিমাই পণ্ডিত চেষ্টা করিয়া হার মানিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের প্রতি কবিরাজ গোস্বামীর ঈশ্বর বুদ্ধি এত বেশী আর মানুষ বুদ্ধি এত অল্প যে, এই কারণে এত বড় কবি হইয়াও কাব্যের রূপান্তরে খাঁটি নবদ্বীপ-

লীলা তিনি ফুটাইতে পারেন নাই। প্রাকৃতের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে নাই, আছে কেবল অপ্রাকৃতের শ্রীচৈতন্য।

অন্যান্য পরিবর্ত্তনের কোন কথাই কবিরাজ গোস্বামী উল্লেখ করিলেন না।

গম্ভীরার দিব্যোন্মাদের কবি গয়া প্রত্যাগত নিমাইয়ের মানসিক পরিবর্ত্তন বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইতেন যে, মানসিক বিকাশের পথে এই স্তরে পরিণত অবস্থার সমস্ত লীলারই অঙ্কুর নিমাইয়ের চিত্তে উদ্গম হইয়াছে।

বৃন্দাবনদাসের উপর বরাত দিয়া কবিরাজ গোস্বামী লীলার এই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তনমুখী অংশটুকু নিঃশব্দে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।

বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্য মঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিলা নিত্যানন্দ আজ্ঞাবলে।

(চৈঃ চঃ, আদি —১৭পঃ)

পঞ্চম বক্তৃতা

[নিমাইয়ের মানসিক পরিবর্ত্তনের ২য় স্তর। অদ্বৈত নিমাইয়ের পরবর্ত্তী জীবন সম্পর্কে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, গদাধর নহেন। নিমাইয়ের বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ। কীর্ত্তনারম্ভ। কাজীর অত্যাচার। পাষণ্ডীর দৌরাত্ম্য। রাষ্ট্র ও সমাজের আবেষ্টন। (নিত্যানন্দের নবদ্বীপ আগমনের হেতু কি?) শ্রীবাস ভবনে নিমাইয়ের অভিষেকের অর্থ কি? অভিষেকের সময় অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের সহিত নিমাইয়ের কথোপকথন—ভবিষ্যৎ প্রচারের উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ। যবন হরিদাসের উপর রাজ অত্যাচারের দরুণ নিমাইয়ের অবতার হইবার কারণ উল্লেখ।]

নিমাই গয়া হইতে নবদ্বীপ ফিরিবার পর তাঁহার পরিবর্ত্তনের প্রথম স্তর আমরা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। এইবার পরিবর্ত্তনের দ্বিতীয় স্তরে আমরা প্রবেশ করিতেছি।

আচার্য্য অদ্বৈত নবদ্বীপ বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব করিতেছেন। সুতরাং সকল বৈষ্ণব মিলিয়া আগে অদ্বৈতের কাছে গিয়া নিমাইয়ের বৈষ্ণব হওয়ার অদ্ভুত কথা জ্ঞাপন করিলেন। অদ্বৈত বলিলেন—

ইহার অগ্রজ পূর্ব্ব বিশ্বরূপ নাম
আমা সঙ্গে আসি গীতা করিত ব্যাখ্যান
এই শিশু পরম মধুর রূপবান
ভাইকে ডাকিতে আইসে মোর স্থান
চিত্তবৃত্তি হরে শিশু সুন্দর দেখিয়া
আশীর্ব্বাদ করি 'ভক্তি হউক' বলিয়া
আভিজাত্য আছে বড় মানুষের পুত্র
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, তাঁহার দৌহিত্র।
আপনেও সর্ব্বগুণে উত্তম পণ্ডিত
তাঁহার কৃষ্ণেতে ভক্তি হইতে উচিত।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২অঃ)

অদ্বৈত বিশ্বরূপকে গীতা পড়াইয়াছেন। সেই কালে নিমাই উলঙ্গ শিশু মাত্র। শিশুর সুন্দর রূপে আচার্য্যের মন আকৃষ্ট

হইয়াছিল। শিশুকে ভক্ত হইবার জন্য তিনি আশীর্ব্বাদও করিয়াছিলেন। সেই শিশু এখন বড় হইয়া উত্তম পণ্ডিত হইয়াছে। অভিজাত অধ্যাপক-বংশের ছেলে, তাঁহার কৃষ্ণে ভক্তি হইয়াছে; অদ্বৈত বলিলেন—"বড় সুখী হইলাম এ কথা শুনিয়া"। অন্যান্য বৈষ্ণবদের মত অদ্বৈতও শুনিবামাত্র একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে পারিলেন না। বলিলেন, "যদি সত্যবস্তু হয় তবে এইখানে—সভে আসিবেন এই বামনার স্থানে"।

অদ্বৈতের কথায় তিনটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১ম, নিমাইয়ের উপর কৃষ্ণের অবতারত্ব তখনও অদ্বৈত আরোপ করেন নাই। ২য়, নিমাইয়ের কৃষ্ণভক্তির সত্যতা সম্বন্ধে তখনো তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ হন নাই। ৩য়, বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্বের গৌরব ও গর্ব্ব অদ্বৈত তখনো নিজের মনে পোষণ করিতেছেন—"সভে আসিবেন এই বামনার স্থানে" —কেননা তিনিই ত নেতা।

বৃন্দাবনদাসকে অনুসরণ করিয়াই পরিবর্ত্তনের দ্বিতীয় স্তর আমরা প্রথমে বর্ণনা করিতেছি।

এদিকে নিমাই পণ্ডিত পরম বৈষ্ণব হইয়া বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন।

নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সকলেই সেকালে প্রাতে গঙ্গাস্নান ও তদঙ্গীয় পূজা আহ্নিক করিতেন, প্রথা ছিল। নিমাইয়ের সঙ্গে সকল বৈষ্ণবেরই প্রাতে গঙ্গার ঘাটে দেখা হয়। "শ্রীবাসাদি দেখিলে ঠাকুর নমস্করে—প্রীত হইয়া ভক্তগণ আশীর্ব্বাদ করে।" নিমাই তখন শ্রীবাসাদির আশীর্ব্বাদভাজন। 'আশীর্ব্বাদ শুনিয়া প্রভুর বড় সুখ।' নিমাই বৈষ্ণবদের বলিলেন—

তোমা সভা সেবিলে সে কৃষ্ণ ভক্তিপাই
এত বলি কারো পায়ে ধরে সেই ঠাঞি।
নিঙ্গারয়ো বস্ত্র কারো করিয়া যতনে
ধুতিবস্ত্র তুলি কারো দেন ত আপনে।
কুশ গঙ্গামৃত্তিকা কাহারো দেন করে
সাজি বহি কোনদিন চলে কারো ঘরে।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২ অঃ)

নিমাইয়ের আজিকার এই ব্যবহারের সঙ্গে মনেপড়ে কয়েক বৎসর আগে গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থী পুরুষ ও বালিকাদের প্রতি তাঁহার অসহনীয় বাল্য উপদ্রব।

বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে
সাজি বহে, ধুতি বহে, লজ্জা নাহি করে।

বিদ্যাবিলাসে অপরিমেয় দাম্ভিক ছিল যে যুবক, বহু সম্মানিত অধ্যাপনা ছিল যার কার্য্য, সেই উদ্ধত পণ্ডিতের পক্ষে গঙ্গার ঘাটে সহস্রবিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে এতখানি বিনয় বড় কম কথা নয়। শ্রীবাসাদি নিমাইকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—

কৃষ্ণ ভজিলে সে বাপ সব সত্য হয়
না ভজিলে কৃষ্ণ, রূপ বিদ্যা কিছু নয়।

* * *

যেন তুমি শাস্ত্রে সব জিনিলে সংসার
তেন কৃষ্ণ ভজি, কর পাষণ্ডী সংহার।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২অঃ)

আশীর্ব্বাদের মধ্যে অস্পষ্টতার কিছুই নাই। কৃষ্ণ ভজিয়া পাষণ্ডী সংহার কর। পাষণ্ডীর উপদ্রবে বৈষ্ণবেরা তখন অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। কৃষ্ণ ভজার সঙ্গে পাষণ্ডী সংহারক একজন নেতার অভাব বৈষ্ণবেরা খুব বেশী অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহারা নিমাইকে বলিলেন—

এই নবদ্বীপে বাপ যত অধ্যাপক
কৃষ্ণ ভক্তি বাখানিতে সবে হয় বক
কি সন্ন্যাসী কি তপস্বী কিবা জ্ঞানী যত
বড় বড় এই নবদ্বীপে আছে কত
কেহ না বাখানে বাপ কৃষ্ণের কীর্ত্তন
না করুক ব্যাখ্যা আর নিন্দে সর্ব্বক্ষণ
যতেক পাপীষ্ঠ শ্রোতা সেই বাক্য ধরে
তৃণ জ্ঞান কেহ আমা সবারে না করে

এখন প্রসন্ন কৃষ্ণ হইল সবারে
এ পথে প্রবিষ্ট করি দিলেন তোমারে
তোমা হৈতে হইবেক পাষণ্ডীর ক্ষয়
মনেতে আমরা ইহা বুঝিনু নিশ্চয়।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২অঃ)

বড় বড় অধ্যাপকেরা কৃষ্ণ ভক্তি ব্যাখ্যা দূরের কথা—"না করুক ব্যাখ্যা আর নিন্দে সর্ব্বক্ষণ"। বৈষ্ণবেরা কোন একজন নেতা খুঁজিতেছেন, নিমাই পণ্ডিত তাহা ভাল করিয়াই হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

নিমাই বয়োজ্যেষ্ঠ পূজ্যপাদ বৈষ্ণবদের আশীর্ব্বাদের অতি সুন্দর প্রতিউত্তর দিলেন—

তোমরা যে বোল সেই হইব নিশ্চিত
কোন ছার হয় পাপ পাষণ্ডীর গণ
সুখে গিয়া কর কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তন
তোমা সভা হৈতে হৈবে জগৎ উদ্ধার
করাইবা তোমরা কৃষ্ণের অবতার
সেবক করিয়া মোরে সভেই জানিবা
এই বর—মোরে কভু না পরিহরিবা।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২য় অঃ)

(বিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্রযুগে পৃথিবীর যেকোন স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের নির্ব্বাচিত নেতা তাঁহার অনুচরদিগকে, নিমাই যে কথা আজ বলিলেন, তাহা অপেক্ষা উদার ও বড় কথা বলিতে পারেন নাই।)

১৫০৯ খৃষ্টাব্দের সম্ভবতঃ মে মাসের কোন এক উজ্জ্বল প্রভাতে, গঙ্গার ওপারে তরুবীথির উপর দিয়া রক্তিমচ্ছটায় সূর্য্য যখন নব গরিমায় উদিত হইয়া বাঙ্গালীকে ডাকিতেছিল—জাগ, জাগ, আমি উঠিয়াছি, আমি আসিয়াছি—তখন নবদ্বীপে গঙ্গার ঘাটে নিমাই সেই জবাকুসুম সঙ্কাশং মহাদ্যুতির দিকে চাহিয়া, পাষণ্ডীপর্য্যুদস্ত, যবনরাজভীতি-সন্ত্রস্ত, বাঙ্গালীর বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব মনে মনে গ্রহণ করিয়া বাড়ী

ফিরিলেন। নিমাই বৈষ্ণবদের বলিলেন—১ম, আমি পাষণ্ডী সংহার করিব। ২য়, কৃষ্ণের অবতার, তোমরাই আমাকে করাইবা,—'করাইবা তোমরা কৃষ্ণের অবতার'। ৩য়, আমি নেতা হইলেও আমাকে সেবক করিয়াই জানিবা। কত বড় কথা। ৪র্থ, কেবল দেখিও আমাকে কখনো পরিত্যাগ করিও না।

বৈষ্ণবদের দুঃখের কথা শুনিয়া নিমাইয়ের পরিকল্পনা—

পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর
সংহারিমু বলি সব, করয়ে হুঙ্কার
'মুঞি সেই মুঞি সেই'—বলে বার বার।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২অঃ)

'মুঞিসেই মুঞিসেই' কথাটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। পাষণ্ডী সংহারের নিমিত্ত নিমাই নিজেকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া উপলব্ধি করিবার এই প্রথম চেষ্টা করিতেছেন।

নিশ্চিন্ত আলস্যে বেকার বসিয়া থাকিবার জন্য যুবক নিমাই অধ্যাপকের কার্য্য ছাড়িয়া দেন নাই। তিনি গদাধরকে সঙ্গে লইয়া নিজেই সেই 'বামনার স্থানে' গেলেন। সম্ভবতঃ অদ্বৈতের অভিপ্রায় নিমাই শুনিয়া থাকিবেন। অদ্বৈত তখন কৃষ্ণ অবতরিবার জন্য—"বসিয়া করয়ে জল তুলসী সেবন"। তখনকার অদ্বৈতের বর্ণনা এইরূপ—

মহামত্ত সিংহ যেন করয়ে হুঙ্কার
ক্রোধ দেখি যেন মহারুদ্র অবতার

এই মহারুদ্র অবতার নিমাইকে দেখিবামাত্র—

পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী লই সেই ঠাঞি
চৈতন্য চরণ পূজে আচার্য্য গোসাঞি
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ চরণ উপরে
পুনঃ পুনঃ এই শ্লোক পড়ি নমস্করে।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২অঃ)

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়

গোবিন্দায় নমো নমঃ" ॥ বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষারই একটা ইঙ্গিৎ আমরা পাইতেছি। আর তার সঙ্গে—জগদ্ধিতায় জগতাং হিত সাধকায় নমো নমঃ। বৈদিক ধর্ম্মরক্ষাকারী ব্রাহ্মণ এখন জীব উদ্ধার করুন।

ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর অথচ অকস্মাৎ ইহা ঘটিয়া গেল। গদাধর বড়ই কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। 'জিহ্বা কামড়াইয়া' আচার্য্যকে বলিলেন—"বালকেরে গোঁসাঞি এমত না জুয়ায়"। অদ্বৈতের কাছে নিমাই ত বালক মাত্র। আচার্য্য বলিলেন—

গদাধর! বালক জানিবা কথোদিনে।

জানিবার জন্য আর বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হইবে না। অদ্বৈত ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। গদাধর তা নহেন। এইখানে উভয়ের পার্থক্য।

তারপর নিমাই দুইকর জুড়িয়া অদ্বৈতকে নমস্কার করিয়া পদধূলি লইলেন ও কহিলেন—

অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়
তোমার আমি সে হেন জানিহ নিশ্চয়।
ধন্য হইলাম আমি দেখিয়া তোমারে
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণ নাম স্ফুরে।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২অঃ)

অদ্বৈত বলিলেন—"সভা হইতে তুমি মোর বড় বিশ্বম্ভর"। আরো বলিলেন, "সর্ব্ব বৈষ্ণবের ইচ্ছা তোমারে দেখিতে—তোমার সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে"। নিমাই স্বীকার করিয়া 'চলিলেন নিজ বাসে'।

ইহার ঠিক পরেই অদ্বৈত নবদ্বীপ ছাড়িয়া শান্তিপুর চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার পর হঠাৎ তাঁ'র নবদ্বীপ ছাড়ার কারণ, বৃন্দাবনদাস বলেন—"পরীক্ষিতে চলিলেন শান্তিপুর বাস"। অদ্বৈতের শান্তিপুর গমন নিমাইকে পরীক্ষা করিবার জন্য। ভূতপূর্ব্ব নেতা পরবর্ত্তী নেতাকে বিনা পরীক্ষায় কেবল ধূপদীপে আরতি করিয়া নেতৃত্ব ছাড়িয়া দেন নাই। অদ্বৈতের ইহাও অভিপ্রায়—নিমাই যে বৈষ্ণবসমাজের নেতা হইতে যাইতেছেন, আগে কিছুদিন কীর্ত্তন উপলক্ষে তাঁহাদের সহিত মেলা-মেশা করুন। তাঁহারাও নিমাইকে দেখুক; নিমাই ও তাঁহাদের দেখুক। ইহা ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসের ঘটনা।

এতবড় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অথচ জয়ানন্দ এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র বাঙনিষ্পত্তি করিলেন না, কিছুই লিখিলেন না।

লোচন যাহা লিখিয়াছেন তাহা বৃন্দাবনদাসের অনুগামী নয়, তবে মূল কথা ঠিকই আছে। নিমাই অদ্বৈতকে বলিতেছেন—"মোর পাদপদ্ম নিজ মস্তকে ধরিয়া ; তুলসী মঞ্জরী দিয়া পূজিলি কান্দিয়া"। শ্রীবাস নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি ভক্ত এই অদ্বৈত আচার্য্য"? নিমাই ক্রোধমুখে বলিলেন—উদ্ধব ও অক্রুর অপেক্ষা অদ্বৈত ন্যূন নহেন। তারপরে বলিলেন—"ভারতবরষে নাহি আচার্য্য সমান"। প্রথম দিনের সাক্ষাতেই নিমাই অদ্বৈতের সম্মুখে নাচিতে আরম্ভ করিলেন—

শ্রীনিবাস ভূজে এক ভূজ আরোপিয়া
গদাধর করে ধরি বাম কর দিয়া
নরহরি অঙ্গে প্রভু শ্রীঅঙ্গ হেলিয়া।
যেন রাস মহোৎসবে বেঢ়ি গোপীগণ।

(চৈঃ মঃ, মধ্য খণ্ড)

লোচন সর্ব্বদাই নদীয়ানাগর ভাব প্রকাশের সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ান ; এখানেও তাই। বৃন্দাবনদাস নরহরির নাম করেন নাই, কুত্রাপি নয়। লোচন এখানে নরহরিকে আনয়ন করিলেন। কিন্তু অদ্বৈতের সহিত প্রথম দিনের সাক্ষাতেই নিমাইয়ের রাসনৃত্য ইতিহাসসম্মত নয়। প্রথম দিনের সাক্ষাতে অদ্বৈত "পাষণ্ডীকে গালি দিতে রাঙা দু লোচন"। তার ফলে নিমাই শ্রীবাসের বাড়ী গিয়া গদাপূজা করিলেন—

গদাপূজা কৈল এই দুষ্ট নাশিবারে,
আমার গদায় সব নাশিব পাষণ্ড।

(চৈঃ মঃ, মধ্য খণ্ড)

লোচন গদাপূজার সঙ্গে রাসনৃত্যও জুড়িয়া দিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস সম্ভবতঃ তাঁহার মাতা নারায়ণীর মুখে শুনিয়া এই অদ্বৈতমিলন চিত্রটি যেরূপ নিপুনতার সহিত জীবন্তভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, লোচন তাহা পারেন নাই।

কবিরাজ গোস্বামী "তবে অদ্বৈত মিলন" (চৈঃ চঃ, আদি—১৭পঃ)

বলিয়া শেষ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি একটি কথা লিখিয়াছেন যা আর কেহ লেখেন নাই। ইহা শান্তিপুরের ঘটনা।

কৃষ্ণ অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিল
জল তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল।
হরিদাস করে গোফায় নাম্ সংকীর্ত্তন
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন—এই তাঁর মন।
দুই জনের ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার।

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—৩পঃ)

শুধু অদ্বৈতের একার ভক্তিতে নয়, হরিদাসের ভক্তিও শ্রীচৈতন্যকে অবতার করিয়াছে। শ্রীবাসের বাড়ীতে হরিদাসকে বর দিবার সময় নিমাইয়ের নিজের মুখে আমরা ইহার আরো বিশদ প্রমাণ পাইব।

আবার আমরা বৃন্দাবনদাসকে অনুগমন করিয়া চলিতে আরম্ভ করি। অদ্বৈত শান্তিপুর চলিয়া গেলে নিমাই অদ্বৈতের কথামত নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের সহিত কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—"কীর্ত্তন করেন সর্ব্ব বৈষ্ণবের সনে"। কীর্ত্তন করিতে গিয়া নিমাইয়ের "আবেশ" হইতে লাগিল। আবেশের সময় "কম্প" ও "মূর্চ্ছা" হয়। সকলের মনে ইহাতে "সন্দেহ" আসিল। কেহ বলিল "এ পুরুষ অংশ অবতার", কেহ বলে "এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার"। নানা রকম কথা নানা জনে বলিতে লাগিল। বৈষ্ণবদের গৃহিনীরা পুরাপুরি স্থির করিলেন, "কৃষ্ণ জন্মিলা আপনি"।

নিমাই গয়া হইতে ফিরিবার পথে কানাইয়ের নাটশালাতে দেখিয়াছিলেন—"তমাল শ্যামল এক বালক সুন্দর" হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া 'পালাইলা কোনভিতে'। সেই হইতে আবেশের ভাবে তিনি নবদ্বীপ ফিরিয়া প্রায়ই বলিতেন—"পাইয়াও হারাইনু জীবন-কানাই"। নিমাইয়ের চিত্তে রাধিকাভাবের উদ্ভব, এই ঘটনা হইতেই সূত্রপাত হয়। অথচ নবদ্বীপের বৈষ্ণবেরা কেহই তাঁহাকে রাধিকার অবতার করিতে বা দেখিতে চান না।

এই সময় হইতেই নানা ভাবের আবেশ নিমাইয়ের মধ্যে দেখা যাইবে। কাজেই কেবল এক রাধিকার ভাব স্থায়ী হইতে পারে নাই।

আর তা ছাড়া অদ্বৈত "যাঁর শক্তি কারণে চৈতন্য অবতার", তিনি ত রাধিকাকে চান নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন চক্রধারী কৃষ্ণকে। চক্রের প্রয়োজন খুব বেশী ছিল। পাষণ্ডী ও যবনরাজ ভীতির জন্যই চক্রের প্রয়োজন। লোচন পর্য্যন্ত নিমাইকে দিয়া শ্রীবাসের বাড়ীতে কিছুক্ষণ আগে গদা পূজা করাইলেন। সুতরাং রাধাভাবের বিকাশের পথে নবদ্বীপের বৈষ্ণববেষ্টনী নিমাইয়ের পক্ষে অনুকূল ছিলনা। বরং ছিল প্রতিকূল। রাধাভাবের বিকাশ নবদ্বীপে হয় নাই, হইতে পারে নাই।

অদ্বৈত শান্তিপুরেই আছেন, এখনো ফিরেন নাই। নিমাইকে তাঁহার পরীক্ষা চলিতেছে। সেই সময়ে, অদ্বৈতের অনুপস্থিতকালেই নবদ্বীপের বৈষ্ণবেরা নিমাইকে বলিলেন--

অনুপাল্য তোমার আমরা সর্ব্বজন
সভার নায়ক হই করহ কীর্ত্তন।
পাষণ্ডীর বাক্যে দগ্ধ শরীর সকল
এ তোমার প্রেমজলে করহ শীতল।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২অঃ)

বৈষ্ণবদের অপেক্ষা পাষণ্ডীরাই বেশী নিমাইকে অবতার হইতে বাধ্য করিয়াছে। আর দেখা যাইতেছে অদ্বৈতের অপেক্ষা না করিয়াই নবদ্বীপের বৈষ্ণবেরা নিমাইকে "নায়ক" হইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। পাষণ্ডীর যন্ত্রনায় বৈষ্ণবদের একজন নায়কের বড়ই প্রয়োজন।

নিমাই আবেশের ভাবেই আছেন। একদিন গদাধর তাম্বুল হস্তে উপস্থিত। নিমাই গদাধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীতবাসা"? গদাধর বলিল—কৃষ্ণ সর্ব্বদাই তোমার হৃদয়ে আছেন।

হৃদয়ে আছেন কৃষ্ণ বচন শুনিয়া
আপন হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২অঃ)

এ আর্ত্তি অরন্তুদ! ইহার তুলনা নাই। যত বড় পাণ্ডিত্যই থাকুক না কেন, মনের এইরূপ অবস্থা লইয়া অধ্যাপকের কার্য্য করা যায় না।

শচীমাতা এঅবস্থা দেখিয়া খুব ভয় পাইয়াছেন—পাইবার কথাও। নিমাইয়ের সম্মুখেই তিনি বাহির হন না। শচীমাতা গদাধরকে বলিলেন, "বাবা তুমি সর্ব্বদা নিমাইয়ের সঙ্গে থাকিবা"।

প্রথমে কীর্ত্তন নিমাই নিজের বাড়ীতেই আরম্ভ করিলেন, শ্রীবাসের বাড়ীতে নয়। রাত্রিভোর কীর্ত্তন চলিতে লাগিল, "সর্ব্বনিশা যায় যেন মুহূর্ত্তেক প্রায়—প্রভাতে বা কথঞ্চিৎ প্রভু বাহ্য পায়"। অদ্বৈত শান্তিপুরে থাকিয়া নিমাইকে যখন পরীক্ষা করিতেছেন, তখন নিমাই তাঁর যুগযুগান্তরব্যাপি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সংকীর্ত্তনের জন্ম দিলেন নিজগৃহে। অদ্বৈত অনুপস্থিত। নিত্যানন্দ রওনা হইয়াছেন, এখনো আসিয়া পৌঁছেন নাই। "সর্ব্ব ভক্তগণ সন্ধ্যা সময় হইলে—আসিয়া প্রভুর গৃহে অল্পে অল্পে মিলে।" এই সময় মুকুন্দ কীর্ত্তনের পূর্ব্বে "ভক্তিযোগ সম্মত" "যে সব শ্লোক"—তা পাঠ করিতেন। মুকুন্দের পাঠ শুনিবামাত্রই নিমাইয়ের আবেশ হইত।

ইহার পরে—"আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন প্রকাশ"। কীর্ত্তন সম্ভবতঃ এখন হইতে শ্রীবাসের বাড়ীতে উঠিয়া আসিল। প্রকাশের অর্থ তাই। এবং নিমাই খুব জাঁক করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রকাশ অর্থে নগর সংকীর্ত্তন নয়। কেননা কীর্ত্তন এখনো ভ্রমনের স্তরে আসিয়া পৌঁছে নাই। বৈষ্ণবেরা বসিয়া বসিয়াই কীর্ত্তন করিতেছেন। তবে খুব চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন। রাত্রি ভোর কীর্ত্তনের চীৎকার চলিতেছে।

ফল ভাল হইল না। একে পাষণ্ডীরা বৈষ্ণবদের উপর বিরক্ত, তার উপরে কীর্ত্তনের চীৎকারে সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে না পারিয়া তাহারা যারপর নাই চটিয়া গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদ রটিল যে, বৈষ্ণবদের ধরিয়া নিবার জন্য যবনরাজের নৌকা আসিতেছে। পাষণ্ডীরাই 'দেয়ানে' খবর দিয়া রাজার নৌকা আনাইতেছে। এবং রাজার লোক আসিলে সকলের আগে শ্রীবাসকে ধরিয়া বাধিয়া দিবে, এইরূপ মন্ত্রনা করিতেছে। কি অধঃপতিত কলুষ পঙ্কিল এই সমাজ চিত্র!

পরাধীন জাতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে স্বজাতিবিদ্বেষ খুব প্রবল থাকে। স্বজাতিবিদ্বেষ না থাকিলে জাতি পরাধীন থাকিতে পারে না। এক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ব্যাতিরেকে পরাধীন জাতি আর কোনরূপ

প্রচেষ্টার মধ্যে এই আত্মঘাতী স্বজাতিবিদ্বেষ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

পাষণ্ডীরা কীর্ত্তনের চীৎকারে 'নিদ্রাসুখ ভঙ্গে' ক্রুদ্ধ হইল। কেহ বলে "এগুলার হইল কি বাই"। ইহারা ক্ষেপিয়া গিয়াছে। একদিকে বিবেচনা করিলে কথাটা মিথ্যা নয়। কেহ বলে "জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার"—অশাস্ত্রীয়। পাষণ্ডীদের মধ্যেও পণ্ডিত ছিল। কেহ বলে—

মনে মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয়।
বড় করি ডাকিলে কি পুণ্য জনময়॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২অঃ)

তারপর একজন পাষণ্ডী প্রকৃত খবরের কথা প্রকাশ করিল। এ ব্যক্তি আমাদের পরিচিত। শ্রীবাসের ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া গঙ্গায় নিয়া ফেলিবার প্রস্তাব প্রথমে ইনিই করেন। এবং অপর পাষণ্ডীরা নির্ব্বোধের মত তখন ইহার কথায় কান দেয় নাই। ইনিই খবর দিলেন—

আরে ভাই পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের বাদে হইল দেশের উৎসাদ॥
আজি মুঁই দেয়ানে শুনিল সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা॥
শুনিলেক নদীয়ায় কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ॥
যেতে দিগে পালাইব শ্রীবাস পণ্ডিত।
আমা সভা লইয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত॥
তখনে বলিল মুঁই হইয়া মুখর।
শ্রীবাসের ঘর ফেলি গঙ্গার ভিতর॥
তখনে না কৈলে ইহা পরিহাস জ্ঞানে।
সর্ব্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২অঃ)

পাষণ্ডীদের মধ্যে এ ব্যক্তি শুধু মুখর নয়—ভয়ও ইহার সবচেয়ে বেশী। যারা স্বভাবতঃ ভীরু তারাই সাধারণতঃ ষড়যন্ত্রকারী হইয়া থাকে। পাষণ্ডীরা অত্যাচারী—ভীরু—ষড়যন্ত্রকারী। আর একজন

পাষণ্ডী একটু শান্তিপ্রিয়। তিনি কোন ঝঞ্ঝাট পোহাইতে চান না। এই শ্রেণীর কাপুরুষেরাই আবার স্বদেশ ও স্বজাতিদ্রোহী বেশী হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহারা অপেক্ষাকৃত অর্থশালী লোক। ইনি বলিলেন—

আমরা সভের কোন দায়।
শ্রীবাসে বাঁধি দিব যেবা আসি চায়॥
এই মত কথা হইল নগরে নগরে।
রাজ নৌকা আসে বৈষ্ণব ধরিবারে॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২অঃ)

নিমাইয়ের কীর্ত্তন প্রকাশের প্রথম ফল "রাজনৌকা আইসে বৈষ্ণব ধরিবারে"। বৈষ্ণবেরা বড় কেহই বেশী সাহসী দেখা যায় না। বখতিয়ার খিলজী হইতে তিনশ বৎসরের যবনরাজভীতি নবদ্বীপবাসীর অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। সকলেই গোবিন্দ স্মরণ করিয়া ভয় নিবারিল—এই মাত্র। শ্রীবাসের স্পষ্টই "যবনের রাজ্য দেখি মনে হৈল ভয়"। বৈষ্ণবেরা যে খুব ভয় পাইয়াছে, নিমাই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। রাজভয়েভীত নবদ্বীপবাসীর মধ্যে সেদিন একমাত্র নির্ভীক পুরুষসিংহ নিমাই পণ্ডিত।

কীর্ত্তনে নিমাইয়ের আবেশ দেখিয়া বৈষ্ণবেরা যে যাহাই মনে করিয়া থাকুন না কেন, সে সকল অপ্রাকৃতের ব্যাপার। কিন্তু প্রাকৃতের এই উপস্থিত বিষম সঙ্কটে তাঁহারা এখনো নিমাইয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিতেছেন না। নতুবা স্বয়ং কৃষ্ণ অবতার হইয়া তাঁহাদের নেতৃত্ব করিতেছেন—তবে তাঁহারা ভীত হইবেন কেন? বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন, এবং ঠিকই বলিতেছেন, যে—প্রভু যে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন, বৈষ্ণবেরা তখনও তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

প্রভু অবতীর্ণ নাহি জানে ভক্তগণ
জানাইতে আরম্ভিলা শ্রীশচী নন্দন॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২অঃ)

খুব সত্যিকথা। অবতারের প্রকাশও ক্রমশঃ হইয়া থাকে। একদিনে অবতার হওয়া যায় না। অবতার হওয়ার পরে শ্রীবাসের বাড়ীতে নিমাই একদিন নিজেই অদ্বৈতকে বলিলেন—"যখন আমার নাহি

হয় অবতার—আমারে আনিতে শ্রম করিলা অপার" (চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১০অঃ)।

নিমাই এইবার পাষণ্ডী ও যবনরাজ ভয়ে মুহ্যমান নবদ্বীপের বৈষ্ণবদিগকে তাঁহার অবতারত্ব জানাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নেতৃত্বের যোগ্যতার পরিচয় দিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সমস্ত নবদ্বীপব্যাপি এই বিষম ভয়ের মধ্যে তিনি কি করিলেন?

নির্ভয়ে বেড়ায় মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়াছেন সুগন্ধি চন্দন।
স্কন্ধে উপবীত শোভে মনোহর রূপ
দিব্যবস্ত্র পরিধান, অধরে তাম্বুল
কৌতুকে কৌতুকে গেলা ভাগীরথী কূল।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২অঃ)

পাষণ্ডীরা নিমাইকে এইরূপ নির্ভয়ে বেড়াইতে দেখিয়া অতিশয় বিমর্ষ হইয়া পড়িল। কেননা ধরিয়া নিবার জন্য রাজার নৌকা আসিতেছে—তবু ভয় পায় না, কি আশ্চর্য্য! "এত ভয় শুনিয়াও ভয় নাহি পায়—রাজার কুমার যেন নগরে বেড়ায়।"

আর এক পাষণ্ডী এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন যে, নিমাইয়ের নির্ভীকতা একটা ছলনা মাত্র—"যত দেখ এসব পালাবার পাক"।

এদিকে ভীত বৈষ্ণব সমাজের উদীয়মান নেতা চলিতে চলিতে গঙ্গাতীরে আসিলেন—

নির্ভয়ে চাহেন চারিদিকে বিশ্বম্ভর
গঙ্গার সুন্দর স্রোত পুলিন সুন্দর।

সেখানে একটি দৃশ্য দেখিলেন—

গরু এক যূথ দেখে পুলিনেতে চরে
হাম্বা রব করি আইসে জল খাইবারে।
উর্দ্ধ পুচ্ছ করি কেহ চতুর্দ্দিগে ধায়
কেহ যুঝে, কেহ শোয়, কেহ জল খায়।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২অঃ)

কোন বিশেষ দৃশ্যে বা শব্দে নিমাইয়ের আবেশ হয়। গঙ্গাপুলিনে যমুনাপুলিন মনে হইতে পারে। বৃন্দাবনের ধেনু চড়ার কথাও সহজেই মনে হইতে পারে। কেননা এই দৃশ্য দেখিয়াই তিনি ভাবাবেশে উন্মত্ত হইয়া হুঙ্কার দিলেন—

দেখিয়া গর্জ্জয়ে প্রভু করয়ে হুঙ্কার
"মুঞি সেই মুঞি সেই" বোলে বার বার।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২অঃ)

"মুঞি সেই"—অর্থ কি? বৈষ্ণবেরা যাঁহাকে চাহিতেছে, আমি সেই। অদ্বৈত শান্তিপুরে থাকিয়া আমাকে পরীক্ষা করিতেছে, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেছে না, কিন্তু আমি সেই। অদ্বৈত ও বৈষ্ণবেরা যদি কৃষ্ণকেই চায়, তবে তাঁহারা জানুক—আমিই সেই কৃষ্ণ—"মুঞি সেই"।

(এই আবেশের ভাবেই তিনি গঙ্গাতীর হইতে সোজা শ্রীবাসের বাড়ীতে গেলেন। শ্রীবাস তখন ঘরে দুয়ার দিয়া "নৃসিংহ" পূজা করিতেছিলেন। আবিষ্ট নিমাই—

এই মতে ধ্যায়া গেল শ্রীবাসের ঘরে
"কি করিস শ্রীবাসিয়া" বোলে অহঙ্কারে
নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে
পুনঃ পুনঃ লাথি মারে তাহার দুয়ারে
"কাহারে বা পূজিস করিস কার ধ্যান
যাহারে পূজিস,—তাঁরে দেখ বিদ্যমান।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২অঃ)

কয়েকদিন আগে মাত্র এই শ্রীবাসের সাজি ধুতি তিনি বহন করিয়াছেন—পায়ের ধূলি লইয়াছেন। পরম আশ্চর্য্য ঘটনা!

শ্রীবাস দেখিলেন নিমাই বীরাসনে বসিয়া আছেন—"চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর"। শ্রীবাস স্তব্ধ! নিমাই অভিযোগ করিলেন যে—আমাকে বৈকুণ্ঠ হইতে আনিয়া অর্থাৎ অবতার করিয়া তুমি আছ নিশ্চিন্তে, আর নাঢ়া অর্থাৎ অদ্বৈত আছেন শান্তিপুরে। এ ভাল নয়। আমি দুষ্ট বিনাশ করিব, তোমার কোন চিন্তা নাই, আমার স্তব পড়। শ্রীবাস স্তব পড়িলেন—

নৌমীড্য তেহব ভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংস পরিপিচ্ছল সম্মুখায়।
বন্যস্রজে কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু
লক্ষশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গ জায়।

শ্রীবাসের স্তব পাঠ হইয়া গেলে নিমাই আসল কথা পাড়িলেন।

অয়ে, শ্রীনিবাস কিছু মনে ভয় পাও
শুনি তোমা ধরিতে আইসে রাজনাও?

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২অঃ)

তারপরে দুইটি কথা বলিলেন—

মুঞি যদি বোলাঙ সেই রাজার শরীরে
তবে সে বলিব সেহ ধরিবার তরে।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২অঃ)

আর যদি "স্বতন্ত্র" হইয়া অর্থাৎ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরিতে পাঠায় তবে—

মুঞি গিয়া সর্ব্ব আগে নৌকায় চড়িমু
এই মত গিয়া রাজগোচর হইমু।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২অঃ)

অপ্রাকৃতে এবং প্রাকৃতে, এ দুই স্তরেই নেতা কি করিবেন তা শ্রীবাসকে স্পষ্ট খুলিয়া বলিলেন। শিরদার ত সরদার—"মুঞি গিয়া সর্ব্ব আগে নৌকায় চড়িমু"। নেতা পলায়ন করিবেন না। রাজদ্বারে সকলের আগে গিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাড়াইবেন। অদ্বৈতের পরীক্ষায় নিমাই সগৌরবে উত্তীর্ণ হইলেন। শ্রীবাসের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য তখনি তিনি তাঁহার ভ্রাতৃসূতা নারায়ণীকে কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতে বলিলেন। নারায়ণী হা কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিল। শ্রীগৌরাঙ্গ চান্দ—

আজ্ঞাকৈল নারায়ণী কৃষ্ণ বলি কান্দ
চারি বৎসরের সেই উন্নত চরিত
হা কৃষ্ণ বলিয়া মাত্র পড়িল ভূমিত।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২পঃ)

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, তখন তাঁ'র মাতা নারায়ণী মাত্র ৪ বৎসরের

বালিকা। বৃন্দাবনদাসকে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই লিখিয়াছেন। এই প্রথমদিন নিমাই নারায়ণীকে ভোজনাবশেষ দেন নাই। ইহার পরে—বেশী পরে নয়—দিবেন। সুতরাং বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

অদ্যাপিহ বৈষ্ণব মণ্ডলে যার ধ্বনি
চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২পঃ)

তারপরে নিমাইয়ের আবেশের ভাব চলিয়া গেল। "বাহ্য পাই বিশ্বম্ভর লজ্জিত অন্তর।" লক্ষ্য করিবার বিষয়, সুস্থ অবস্থায় আবেশের অবস্থার জন্য তিনি সর্ব্বদাই লজ্জিত হইতেন। শ্রীবাসকে সতর্ক করিয়া গেলেন— "না কহিও এসব কথা কাহারো গোচর"।/

নিমাইয়ের আবেশের ভাব তাঁহার মনে ও বাহিরের কার্য্যতায় সত্যি ঘটনা—বাস্তব অবস্থা। ইহা তিনি নেতৃত্বের কার্য্যে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় "বৎসরেক কীর্ত্তন" তিনি করিয়াছিলেন। হিসাবমত ৯ মাস কিংবা ১০ মাস দেখিতে পাই। পাষণ্ডী বা রাজ ভয়ে কীর্ত্তন বন্ধ করেন নাই।

বৈষ্ণব ধরিতে রাজার নৌকা আসিয়া এখনো পৌঁছিল না। ইতিমধ্যে নিমাইয়ের একদিন অক্রূরের আবেশ হইল। অক্রূরভাবে ভাবিত হইয়া বলিলেন—"মথুরায় চল নন্দ, রামকৃষ্ণ লইয়া"। তার পরে আবার একদিন বরাহভাবের শ্লোক শুনি—"গর্জ্জিয়া মুরারি ঘরে চলিলা আপনি"। মুরারির বাড়ী গিয়া নিমাই শূকরমূর্ত্তি হইলেন। চারি খুর প্রকাশ হইল। তিনি দাঁতে করিয়া গাড়ু তুলিলেন। মুরারি দেখিয়া স্তব্ধ হইল! হইবার কথাই।

বরাহ আকার প্রভু হইলা সেইক্ষণে
স্বানুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে
গর্জ্জে যজ্ঞবরাহ প্রকাশে খুর চারি
প্রভু বোলে মোর স্তুতি বোলহ মুরারি।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—৩অঃ)

বরাহ একটা ঈশ্বরের অবতার। নিমাই ঈশ্বর, সুতরাং এক অবতারে তিনি নিঃশেষিত হইতে পারেন না। সকল অবতারেই তাঁহার

আত্মপ্রকাশ সম্ভব। বরাহ অবতার দেখাইবার আরো একটা অভিপ্রায় আছে। পূর্ব্বে বরাহ মূর্ত্তিতে তিনি পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন। আসল কথা পৃথিবী উদ্ধার। "আমি সে করিনু পূর্ব্বে পৃথিবী উদ্ধার।" এবারেও তাই হইবে। অবতারের আকৃতি এবার ভিন্ন হইলেও উদ্দেশ্য এক। "ভক্ত জন রাখি দুষ্ট করিমু সংহার।" জীব উদ্ধারের পরিকল্পনায় দুষ্টের সংহারও তাহার অন্তর্ভুক্ত। উদ্ধারের জন্য সংহারেরও প্রয়োজন স্বীকৃত হইল। সংহারও অবতারের একটা দান।

শ্রীবাসকে 'নৃসিংহ', আর মুরারিকে 'বরাহ' মূর্ত্তি দেখাইবার পর—

পাষণ্ডীরে আর কেহ ভয় নাহি করে
হাটে ঘাটে সভে কৃষ্ণ গায় উচৈঃস্বরে।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—৩অঃ)

নিমাইয়ের উদ্দেশ্য সাধিত হইল। বিনা উদ্দেশ্যে তিনি নৃসিংহ আর বরাহ অবতার দেখান নাই। কিংবা চারিটি খুর প্রকাশ করেন নাই।

(এইবার বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ আগমনের কথা লিখিতেছেন। এ সকল কথা তিনি শ্রীপাদ নিত্যানন্দের নিজ মুখে শুনিয়াই লিখিয়াছেন। সুতরাং তিনি ঠিক কথাই লিখিয়াছেন। ইহা অপর চরিত লেখকদের অপেক্ষা বেশী নির্ভরযোগ্য।

রাঢ়দেশে একচাকা নামে একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে নিত্যানন্দ জন্মিলেন। পিতার নাম হাড়াই ওঝা, মাতার নাম পদ্মাবতী। ইহারা রাঢ়ীশ্রেনীর ব্রাহ্মণ। কথিত আছে ১২ বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া এক সন্নাসীর সঙ্গে ভারতভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। একাদিক্রমে ২০ বৎসর পর্য্যটকরূপে ভারতের সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমণ করিয়া, ৩২ বৎসর বয়সে নবদ্বীপ আসিয়া এখন বৈষ্ণবসমাজের উদীয়মান নেতা নিমাইয়ের সহিত মিলিত হইলেন। এখন নিমাইয়ের বয়স ২৪ বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং নিমাই অপেক্ষা নিত্যানন্দ বয়সে ৮ বৎসরের বড়। তীর্থভ্রমণ কালে নিত্যানন্দ বৌদ্ধদের আলয়েও গিয়াছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরীর সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। "মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে ছাড়িতে না পারে। নিরবধি নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে।" মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দকে বন্ধুর মত দেখিতেন, আর নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্রকে গুরুর

মত দেখিতেন। মাধবেন্দ্রের বান্ধব বা শিষ্য নিত্যানন্দ যে নবদ্বীপের বৈষ্ণবসমাজে আসা মাত্রই একজন অন্তরঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইবেন, ইহা খুবই স্বাভাবিক। কেননা—"গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বার বার। ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।" অদ্বৈত আচার্য্যও মাধবেন্দ্রের শিষ্য। দেখিতেছি মাধবেন্দ্রই যোগসূত্র।

নবদ্বীপে যখন গৌরচন্দ্র প্রকাশ হইলেন, নিত্যানন্দ তখন বৃন্দাবনে— "এইমত বৃন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ। নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।" এই প্রকাশের কথা শুনিয়া তিনি বৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপে চলিয়া আসিলেন। আসিয়া নন্দন আচার্য্যের ঘরে রহিলেন। সোজা নিমাইয়ের বাড়ীতে আসিলেন না।

খুব সঙ্কটকাল। নিমাইয়ের 'বৈষ্ণব আন্দোলন', ইতিহাসের পথে পা বাড়াইতে গিয়া যেন কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। নিমাই এখন "আবেশের" ভাবে "অবতার" হইয়া ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। বৈষ্ণবদের বাড়ী বাড়ী গিয়া অবতারত্ব দেখাইয়া সাহসভরসা দিতেছেন। কেননা পাষণ্ডী ও যবনরাজ ভয় যুগপৎ এই নূতন আন্দোলনকে পিষিয়া মারিবার জন্য দুইটি বজ্রের মত উদ্যত হইয়াছে। যুবক নিমাই এই আন্দোলনের নেতা।

"আইস আমার সঙ্গে সবে দেখি গিয়া"—এই কথা বলিয়া নিমাই সঙ্গীদের লইয়া নিত্যানন্দকে দেখিবার জন্য নন্দন আচার্য্যের বাড়ী আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন—"যেন কোটী সূর্য্যসম"—'অলক্ষিত আবেশ,'—কিছু বুঝা যায় না, "ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ সর্ব্বদাই হাসিতেছেন",—নিমাই বুঝিলেন—"মহাভক্তিযোগ",—বুঝিয়া "গণ সহ বিশ্বম্ভর হৈলা নমস্কার"।

নিত্যানন্দ সম্মুখে রহিলা বিশ্বম্ভর
চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন ঈশ্বর
হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়
একদৃষ্টি হই বিশ্বম্ভর রূপ চায়
রসনায় লেহে যেন দরশনে পান
ভুজে যেন আলিঙ্গন, নাসিকায় ঘ্রাণ

এইমত নিত্যানন্দ হইলা স্তম্ভিত
না বোলে না করে কিছু সভেই বিস্মিত।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—৪অঃ)

প্রথম মিলনেই দেখিতে পাই তুইজনেই স্তব্ধ। একটা বিস্মিত ও স্তম্ভিত ভাব। বড় সুন্দর বর্ণনা বৃন্দাবনদাস করিয়াছেন। যে প্রবল ঝটিকা কিছুপরে বাংলার আকাশ ভেদিয়া উৎকল, দ্রাবিড়, মথুরা ও বৃন্দাবনে ছড়াইয়া পড়িবে, এই স্তব্ধতা তাহারি পূর্ব্বাভাষ।

আষাঢ়ী পূর্ণিমার আগের দিন নিত্যানন্দ আসিয়াছেন। ইহা ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের জুনের শেষ কিংবা জুলাইয়ের প্রথমে হইবে। নিমাই নিত্যানন্দকে বলিলেন—"কালি হৈব পৌর্ণমাসী ব্যাসের পূজন"—অতএব "ব্যাসপূজা তোমার হৈব কোন ঠাঞি" ? নিত্যানন্দ শ্রীবাসকে দেখাইয়া বলিলেন—"ব্যাসপূজা এই মোর বামনার ঘর"। শ্রীবাস বলিলেন— "সর্ব্ব ঘরেই আমার— বস্ত্র-মুগ্দ-যজ্ঞসূত্র-ঘৃত-গুয়া-পান" কেবল 'পদ্ধতি পুস্তক' খানা 'মাগিয়া আনিব'।

নিমাই সকলকে লইয়া তখনই শ্রীবাসের বাড়ীতে আসিলেন। নিমাইয়ের আবেশ হইল। বলরামভাবে তিনি "খট্টার উপর" উঠিয়া বসিলেন। এই বলরামভাব নিত্যানন্দকে প্রকাশ করিবার জন্য। বিনা উদ্দেশ্যে কোন অবতারের ভাব তিনি প্রকাশ করেন নাই।

মহামত্ত হৈলা প্রভু বলরাম ভাবে
মদ আন, মদ আন, বলি ঘন ডাকে।
বারুণী বারুণী প্রভু ডাকে মত্ত হৈয়া।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—৫অঃ)

কেহ বুঝিতে পারে না, এ উহার মুখের দিকে তাকায় "সবার বদন সবে চায়"। শেষে সকলে যুকুতি করিয়া—

ঘট ভরি গঙ্গাজল সবে দিল নিয়া
সত্য যেন কাদম্বরী পিয়ে হেন জ্ঞান।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—৫অঃ)

তারপর নিত্যানন্দকে বলিলেন—"ঝাট দেহ মোরে হল মুষল সত্বর"। নিত্যানন্দ হাত বাড়াইয়া দিলেন—নিমাই হাত পাতিয়া নিলেন।

কর দেখে কেহ আর কিছুই না দেখে
কেহ বা দেখিল হল মূষল প্রত্যক্ষে।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—৫অঃ)

'হল মূষল' কেহ দেখিল, আবার কেহ দেখিল না। সর্ব্বকালেই ইহা কেহ দেখে, কেহ দেখে না। নিমাইয়ের আবেশের ভাব কাটিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি চাঞ্চল্য করিলাঙ" ? ভক্ত সব বলে—"কিছু উপাধিক নহে"। নিমাইয়ের আবেশের ভাবে চাঞ্চল্য প্রকাশে ক্রমে তাঁহারা অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন। আবেশ ছুটিয়া গেলে নিমাই প্রত্যেক-বারই জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কি 'চাঞ্চল্য' করিলেন। আবেশকালের চাঞ্চল্যের কথা, স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে নিমাইয়ের কিছুমাত্র মনে থাকে না। মগ্ন চৈতন্যের অবস্থার ক্রিয়াকলাপ, পূর্ণ চৈতন্যের অবস্থায় সকলেরই বিস্মরণ হয়। আবেশে যাহা ঘটিতেছে তাহা কিছুই অলৌকিক নয়, কিছুই ভেল্কী নয়। সমস্তই লৌকিক, সমস্তই সত্য, সমস্তই মনোবিজ্ঞানসম্মত ঘটনা।

সেদিনের মত নিমাই 'গেলা নিজবাসে'। এদিকে রাত্রে নিত্যানন্দ "হুঙ্কার করিয়া, নিজ দণ্ড কমণ্ডলু ফেলিল ভাঙ্গিয়া"। পরের দিন নিমাইয়ের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া নিত্যানন্দ "কুম্ভীর দেখিয়া তারে ধরিবারে যায়"। নিত্যানন্দ অবধূত, অর্থ—সর্ব্ব সংস্কার মুক্ত,—অথচ খেয়ালী মানুষ। ব্যাসপূজা আরম্ভ হইল। নিত্যানন্দ বিধিমত মন্ত্রও পড়েন না, আর ব্যাসদেবকে মাল্য দিয়াও নমস্কার করেন না। শ্রীবাস নিমাইকে বলিলেন—"না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার"। নিমাই নিত্যানন্দকে বলিলেন—"মালা দিয়া কর ঝাট ব্যাসের পূজন"। নিত্যানন্দ সে কথা না শুনিয়া নিমাইয়ের মাথাতেই মালা তুলিয়া দিলেন। নিমাইয়ের 'চাঁচর চিকুরে' মালা অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। নিমাইয়েরও তখন আবেশ হইল—

ছয়ভূজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম—শ্রীহল মূষল।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—৫অঃ)

ষড়্ভূজ দেখি মূর্চ্ছা পাইল নিতাই।

নিমাই পার্ষদ অবতারের মধ্যে নিত্যানন্দকেই প্রথম বলরামের অবতার করিয়া নিজের কৃষ্ণ অবতারের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিলেন।

বৃন্দাবনদাস অপেক্ষা জয়ানন্দ নিম্নশ্রেণীর কারিগর। তাঁহার বর্ণনা ভাল ফুটে নাই। নিত্যানন্দের বর্ণনা—"ঘূর্ণিত লোচন বারুণী মদে মত্ত"। নিত্যানন্দকে বিশ্বরূপ বলিয়া নবদ্বীপের লোকের ভ্রম হইল। নিমাই নিত্যানন্দকে বলিলেন—"তুমি বিশ্বরূপ ইহা বোলে সর্ব্বলোকে"; "বড় দুঃখ পান মায়ে বিশ্বরূপ শোকে"—অতএব তুমি আমার মায়ের সঙ্গে "ঝাট কর পরিচয়"। নিত্যানন্দ নিমাইয়ের বাড়ী আসিলেন। শচীমাতা নিত্যানন্দকে বলিলেন, "হা পুতির পুত মোর নিমাই নিতাই—যজ্ঞসূত্র ধরিঞা কর তুমি বিভা।" তারপর জয়ানন্দের নিমাইও নিত্যানন্দকে ষড়ভুজ দেখাইলেন—"তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ষড়ভূজ হইল"। জয়ানন্দ এই ষড়ভূজের কোন বিশ্লেষণ করিলেন না। ষড়ভূজ শুধু ছয়খানা হাত নয়। ভিন্ন রকমের অনেক তত্ত্বকথা এর মধ্যে আছে। সকল ষড়ভূজের এক অর্থ নয়।

লোচনের বর্ণনাও বৃন্দাবনদাসের অনেক নীচে। লোচন লিখিয়াছেন, নিত্যানন্দের "অঙ্গের সৌরভে যত কুলবধূগণ—কুলবধূ মদ তারা ছাড়িল তখন"। কুলবধূদের এই কল্পিত নির্লজ্জতা বর্ণনা করা লোচনের একটি মুদ্রাদোষ। নিত্যানন্দকে পাইয়া নিমাই বলিলেন—"তাড়িমু পতিত পঙ্গু জড় আদি অন্ত"। বৃন্দাবনদাসও নিত্যানন্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বণিক অধম মূর্খ যে করিল পার"। লোচন ও বৃন্দাবনদাস এক্ষেত্রে উভয়েই একমত।

লোচনের নিমাইও নিতাইকে শচীমাতার নিকট আনিয়া বলিলেন—ইহাকে "নিজ পুত বলিয়া জানিবে। আমারে অধিক করি ইহাকে পালিবে।" শচীমাতা পুত্রভাবে নিতাইকে কোলে করিলেন। নিতাই শচীমাতাকে বলিলেন—"তোর পুত্র বঁটো মুঞি জানিহ নিশ্চয়ে"।

তারপরে ষড়ভূজ—

ষড়ভূজ শরীর প্রভু দেখাইল আগে
চতুর্ভুজ হৈয়া, দুই ভূজ হৈলা পাছে।

এক অঙ্গে তিন অবতার দেখাইলা,
রাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ দেখিল দিব্য তনু
পশ্চাতে দেখিল নবকিশোর রাধা কানু।

(চৈঃ মঃ, মধ্য খণ্ড)

লোচন এই ষড়্‌ভূজকে যতদূর সম্ভব জটিল করিয়া তুলিলেন। ইহা বৃন্দাবনদাসের অনুগামী নয়। কবিরাজ গোস্বামীর অনুগামী বলিয়া মনে হয়।

কবিরাজ গোস্বামী এই ষড়্‌ভূজের কথা এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

প্রথমে ষড়্‌ভূজ তাঁরে (নিত্যানন্দকে) দেখাইলা ঈশ্বর
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শার্ঙ্গ বেণুধর
পাছে চতুর্ভূর্জ হৈলা তিন অঙ্গে বক্র
দুই হস্তে বেণু বাজায়, দুই হস্তে চক্র
তবেত দ্বিভূজ কেবল বংশীবদন।

(চৈঃ চঃ, আদি—১৭পঃ)

ব্যাখ্যাচ্ছলে অন্যত্র কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

স্বরূপ বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভূজ
নারায়ণ রূপে সেই তনু চতুর্ভূর্জ।

(চৈঃ চঃ, আদি—৫পঃ)

কবিরাজ গোস্বামীও বৃন্দাবনদাসকে অনুসরণ করিলেন না। তা না করুন। প্রত্যেক কবির কল্পনাই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। কিন্তু এক্ষেত্রে কবিরাজ গোস্বামী হইতে লোচনে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে কি না, সন্দেহ রহিয়া গেল। এতটা আক্ষরিক মিল প্রক্ষিপ্ত ব্যতিরেকে হইতে পারে না।

এদিকে শ্রীবাসের বাড়ীতেই নিত্যানন্দের থাকিবার ব্যবস্থা হইল। শ্রীবাসকে পিতা ও মালিনীকে মাতা জ্ঞানে তিনি সেইখানে থাকিলেন। এই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াই নিমাই তাঁহার নেতৃত্ব করিবার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন।

নিত্যানন্দ আগমনের পরেই রামাই পণ্ডিতকে নিমাই শান্তিপুর পাঠাইলেন আচার্য্য অদ্বৈতকে আনিবার জন্য। বলিয়া দিলেন—"নির্জ্জনে

কহিও নিত্যানন্দ আগমন; যে কিছু দেখিলা তাঁরে কহিও কথন।"
আরো বলিয়া দিলেন—

আমার পূজার সজ্জ উপহার লৈয়া
ঝাট আসিবারে বোল সস্ত্রীক হৈয়া।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—৬অঃ)

অদ্বৈত জলতুলসী চরণে দিয়া যে নিমাইকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সে নিমাই আর নাই। মানসিক পরিবর্ত্তনে তিনি এখন আবেশ-ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ অবতার। সুতরাং তিনি অদ্বৈতবাঞ্ছিত বৈষ্ণব সমাজের নেতা। নিমাইয়ের উদ্দেশ্য—অদ্বৈত আসিয়া এখন দেখুক, পরীক্ষা করুক। বিশেষতঃ নিত্যানন্দের সহিত অদ্বৈতের পরিচয় হওয়া দরকার।

রামাই শান্তিপুর গিয়া অদ্বৈতকে বলিলেন—

যাঁর লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন
যাঁর লাগি করিলা বিস্তর আরাধন
যাঁর লাগি করিলা বিস্তর উপবাস
সে প্রভু তোমার লাগি হইলা প্রকাশ।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—৬ অঃ)

অদ্বৈত আসিলেন। কি সুন্দর বর্ণনা!

দূরে থাকি দণ্ডবৎ করিতে করিতে
সস্ত্রীক আইসে স্তব পঢ়িতে পঢ়িতে।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—৬ অঃ)

অদ্বৈতের সম্মুখে নিমাইয়ের এক মহা জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখা গেল। "জ্যোতির্ম্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর।" গীতার বিশ্বরূপ-দর্শনের মত অদ্বৈত জ্যোতির্ম্ময় একটা বিরাট প্রকাশ দেখিলেন। নিমাই বলিলেন—

দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি সহিতে
আমারে আনিলে সর্ব্ব জীব উদ্ধারিতে।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—৬ অঃ)

পুনঃ পুনঃ বলা হইতেছে, জীব উদ্ধারের জন্যই এই অবতার।

সেদিনের নবদ্বীপ, সেদিনের বাংলা তাই বলিয়াছিল—পরে উড়িষ্যা বা বৃন্দাবন যদিচ অন্যরকম কথা বলিয়াছে। অদ্বৈত বলিলেন—

মোর কিছু শক্তি নাই, তোমার করুণা
তোমা বই জীব উদ্ধারিব কোন জনা ?

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—৬ অঃ)

ঐতিহাসিক বিকাশে জীব উদ্ধারই লীলার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। ফতে সাহ (১৪৮২-১৪৯০), মোজাফর সাহ (১৪৯৫-১৪৯৯), হুসেন সাহ (১৪৯৯-১৫২০, ষ্টুয়ার্ট) শাসিত বাংলায় ইহা রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন হইতেই উদ্ভব হইয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণ প্রাকৃত, এবং ইতিহাসের পটে প্রত্যক্ষ জীবন্ত চিত্র। এ চিত্র বৃন্দাবনদাস ছাড়া আর কেহ আঁকিতে পারেন নাই। তাঁহারা কথা বলিয়াছেন, ছবি আঁকেন নাই।

অদ্বৈত পুনরায় "নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় জগদ্ধিতায়" স্তব পড়িলেন। নিমাই—"চরণ তুলিয়া দিল অদ্বৈত মাথায়"।

কি অসম্ভব কাণ্ড! কিন্তু নিমাইচরিত্র বিকাশের পথে ইহাতে কোনই অসঙ্গতি দেখা যায় না। বৃন্দাবনদাস সত্য বর্ণনাই করিয়াছেন। কেননা তিনি প্রত্যক্ষদর্শী নিত্যানন্দ ও নিজমাতা নারায়ণীর নিকট শুনিয়া লিখিয়াছেন। নিমাই এখন কৃষ্ণ। অদ্বৈতের মাথায় পা না দিলে বুঝা যাইত যে, তিনি নিজেকে নিজেই কৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন না। সুতরাং অপরে করিবে কেন? আবেশের সময় নিমাই নিজেকে কৃষ্ণ অথবা যেকোন অবতার বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। তিনি ছলনা করেন নাই। অথবা কবি মিথ্যা বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন নাই।

তারপর নিমাই অদ্বৈতকে নৃত্য করিতে বলিলেন। নৃত্য উল্লাসের প্রকাশ। অদ্বৈত নাচিলেন—

ক্ষণে বা বিশাল নাচে, ক্ষণে বা মধুর
ক্ষণে বা দশনে তৃণ করয়ে প্রচুর।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ি গড়ি যায়
ক্ষণে ঘন শ্বাস বহে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়।

ধাইয়া ধাইয়া যায় ঠাকুরের পাশে
নিত্যানন্দ দেখিয়া ভ্রূকুটি করি হাসে।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্যঃ—৬অঃ)

নিমাই নিজের গলার মালা অদ্বৈতকে দিয়া বলিলেন—তুমি আমার নিকট বর চাও। "আপন গলার মালা অদ্বৈতেরে দিয়া ; বর মাগ বর মাগ বলেন হাসিয়া।" অদ্বৈত বলিলেন—আর কি বর চাহিব—আমার চিত্তের যা অভীষ্ট তা সমস্তই পাইলাম,—কেননা আমি "সাক্ষাতে দেখিনু প্রভু তোর অবতার"। ইহাই ত অদ্বৈত এতদিন চাহিয়াছিলেন। তথাপি নিমাই তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্য সম্বন্ধে আভাষ দিলেন—

ব্রহ্মা ভব নারদাদি যাঁরে তপ করে
হেন ভক্তি বিলাইমু কহিনু তোমারে।)

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—৬ অঃ)

অদ্বৈতের নিকট ভবিষ্যৎ নেতা তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতির আভাষ দিলেন। অদ্বৈত বলিলেন, শুধু তা'তে হইবে না।

অদ্বৈত বলয়ে যদি ভক্তি বিলাইবা
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা।
বিদ্যা ধন কুল আদি তপস্যার মদে
তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে যে জন বাধে।
সে পাপীষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
আচণ্ডাল নাচুক তোর নামগুণ গ্যায়া।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—৬ অঃ)

প্রভু বলিলেন—"সত্য যে তোমার অঙ্গীকার"। বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন যে, এই কথার "সাক্ষী সকল সংসার"। কেননা—

চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণ গানে
ভট্ট মিশ্র চক্রবর্ত্তী সবে নিন্দা জানে।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—৬ অঃ)

(নিমাইপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব আন্দোলন ব্রাহ্মণদের জন্য হয় নাই। ব্রাহ্মণেরা যেসকল জাতিকে অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল, এ আন্দোলন তাঁ'দেরি জন্য হইয়াছিল। অকস্মাৎ আকাশ হইতে এ

আন্দোলন নবদ্বীপের মাটীতে পতিত হয় নাই। ইতিহাসের প্রয়োজনে ইহা তিলে তিলে গড়িয়া উঠিয়াছে। যবনরাজ ও ব্রাহ্মণ, এ দুয়ের নিষ্পেষণে এই আন্দোলন জন্মলাভ করিয়া একটা বিদ্রোহের আকারে ইতিহাসপথে তাহার জয়যাত্রা সুরু করিয়াছে। বাংলার ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকের ইতিহাস ও নিমাইয়ের অদ্ভুত নবদ্বীপলীলা ইহার সাক্ষী।

জয়ানন্দ অদ্বৈতমিলন সম্পর্কে কোন বর্ণনাই দেন নাই। কেবল একটা নূতন কথা লিখিয়াছেন যে—এই সময় বাংলার বাহিরে মান্দ্রাজ, বেহার ও উড়িষ্যা হইতে অনেক পারিষদ নবদ্বীপে আসিয়া একত্র হইয়াছিল,—ভিড় করিয়াছিল।

গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ অদ্বৈত সমীপে
মহান্তে তিলার্দ্ধ স্থান নাহি নবদ্বীপে।
গৌড় বঙ্গ তেলেঙ্গ মগধ উৎকল
নানা দেশের পারিষদ পূরিল সকল।

(চৈঃ মঃ, নদীয়া খণ্ড)

নিত্যানন্দ ২০ বৎসর সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি যদি একটি শিষ্যের দল সঙ্গে আনিয়া থাকেন—তবে সেই দলে মাদ্রাজী, বেহারী ও উড়িয়া থাকা অসম্ভব নয়। কেননা এ সকল প্রদেশেই তাঁহার শুভগমন হইয়াছিল।

লোচন অদ্বৈতমিলন উল্টাপাল্টা করিয়াছেন। লোচনও অদ্বৈতকে নিমাইয়ের সম্মুখে নাচাইয়াছেন—"দশ অবতার গীতে নাচিল বিস্তর"। লোচনের অদ্বৈত নিমাইকে বলিল—"প্রেমধন দিয়া সব ভক্ত রক্ষা কর" (চৈঃ মঃ, মধ্য খণ্ড)। ভক্তদের রক্ষা করার প্রয়োজনই বড় প্রয়োজন। কিন্তু লোচন অপ্রাসঙ্গিকভাবে অবতারের উদ্দেশ্য বলিতে গিয়া বৃন্দাবনদাস হইতে ভিন্ন কথা বলিয়াছেন। অবশ্য বৃন্দাবনদাসের অনুগামী হইয়া লোচন সূত্র খণ্ডে বলিয়াছেন—

যে প্রেম যাচয়ে শিব বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা) অনন্ত (বিষ্ণু)
তাহা বিলসিব কলি অধম দুরন্ত।

(চৈঃ মঃ, সূত্র খণ্ড)

বৃন্দাবনদাসের নিমাই অদ্বৈতকে যে কথা বলিয়াছিলেন, ইহা

অবিকল সেই কথা। আবার কবিরাজ গোস্বামীর অনুগামী হইয়া বলিয়াছেন—

আপনি আপন রস করে আস্বাদন
মুখ্য এই হেতু কথা শুন সর্ব্বজন।
জীব উদ্ধারণ হেতু গৌণ করি মানি

(চৈঃ মঃ, মধ্য খণ্ড)

ইহা অবিকল কবিরাজ গোস্বামীর প্রতিধ্বনি। "আপনে আপন রস আস্বাদনের" ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কবিরাজ গোস্বামীর নিকট।

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ।

(চৈঃ চঃ, আদি—৫ পঃ)

জয়ানন্দ বা লোচনে, ইতিহাস ও জীবনের বিকাশপথে ঘটনার সমাবেশ আদৌ হয় নাই। এক্ষেত্রে বৃন্দাবনদাসের সমকক্ষ দূরের কথা, তাঁহার কাছেও কেহ আসিতে পারেন না। কবিরাজ গোস্বামীর এই সকল লীলা বর্ণনে আদৌ কোন উৎসাহ দেখা যায় না।

আবার বৃন্দাবনদাসে ফিরিয়া যাইতেছি। অদ্বৈতের মাথায় পা তুলিয়া দিবার পর বৈষ্ণবদের আর কাহারো কোন সন্দেহ রহিল না যে, নিমাই কৃষ্ণের অবতার। অদ্বৈত যেদিন নিমাইয়ের চরণে জলতুলসী দিয়া পূজা করিয়াছিলেন, সেদিন অদ্বৈত বুঝিয়াছিলেন যে নিমাই কৃষ্ণের অবতার। আর যেদিন নিমাই অদ্বৈতের মাথায় পা তুলিয়া দিলেন, সেদিন নিমাই বুঝিলেন যে তিনি কৃষ্ণের অবতার।

অবতার-বোধ যখন নিমাইয়ের মনে এবং ভক্তদের মনে সম্পূর্ণ হইয়া গেল, তখন নিমাই বৈষ্ণবসমাজের কলেবর বৃদ্ধি ও ইহার সুদৃঢ় সংগঠন কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। ইহাই নেতৃত্ব। ইহাতে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ও অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, নিমাইয়ের নেতৃত্বের বিশেষত্ব কি—তবে এক কথায় বলা যায় যে, বিভিন্ন রুচির লোককে একত্রে আনিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করার অদ্ভুত কৌশল ও আকর্ষণী শক্তিই তাঁহার নেতৃত্বের বিশেষত্ব

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব, কিন্তু ভারী বিলাসী। "দিব্য ময়ূরের

পাখা লই দুইজনে, বাতাস করিতে আছে দেহে সর্ব্বক্ষণে।” গদাধর পুণ্ডরীককে মনে কিছু সন্দেহ করিল। গদাধরের এই ভুল ভাঙ্গিয়া নিমাই পুণ্ডরীকের কাছেই গদাধরকে দীক্ষা দেওয়াইলেন। ইহাই নেতৃত্ব।

এই সময় নিমাই—“নিরন্তর সভার মন্দিরে প্রভু যায়। চতুর্ভুর্জ ষড়ভূজাদি বিগ্রহ দেখায়।” দুই বা চারি হাত বেশী আর কম, প্রয়োজন বুঝিয়া প্রকাশ হইত। নিমাই তাঁহার অবতারত্ব বৈষ্ণবসঙ্ঘ গঠনের কাজে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ ভক্তদের মধ্যে যবনরাজ-ভয় দূর করিবার জন্যও নিমাই তাঁহার অবতারত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি যখন স্বয়ং অবতার পুরুষ তখন আবার কাকে ভয়, আর কিসেরি বা ভয়। চতুর্ভুর্জ ষড়ভূজ খেয়াল নয়। অকস্মাৎ ঘটনা নয়। একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া যে তিনি এই সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অথচ তিনি কোনরূপ ছলনাও করেন নাই। এবং এসকল অতিপ্রাকৃত ব্যাপার চরিত লেখকদের সম্পূর্ণ মিথ্যা বর্ণনাও নয়।

নিমাই স্বভাবতঃই পরিহাসপ্রিয় ছিলেন। আশ্চর্য্য যে, এই সময় তাঁহার অতি সূক্ষ্ম পরিহাসপ্রিয়তা তাঁহার সুস্থ মনের পরিচয় দেয়। শচীমাতা নিমাইকে এক স্বপ্নের কথা বলিলেন যে, বিষ্ণুঘরের দুই মূর্ত্তি রাম (বলরাম ?) আর কৃষ্ণ কাড়াকাড়ি করিয়া নৈবেদ্যের ‘সন্দেশ দধি দুগ্ধ’ গত রজনীতে খাইয়াছে। নিমাই বলিলেন—

আমার ঘরের মূর্ত্তি পরতেক বড়।
মোর চিত্তে তোমার স্বপ্নেতে হৈল দড়॥
মুঞি দেখো বারে বারে নৈবেদ্যের সাজে।
আধাআধি না থাকে কহোঁ কারে লাজে॥
তোমার বধুরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল॥
হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা স্বামীর বচনে।
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্ন কথা শুনে॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—৮অঃ)

বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া এই মধুর পরিহাস নিমাইয়ের চিত্তের স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

অথচ এই সময় কেবল এক ভাবের আবেশ তাঁহার হয় নাই। হিন্দুশাস্ত্রের পৌরাণিক উপাখ্যানের বহু অবতার বা ভাবের আবেশ তাঁহার মধ্যে হইয়াছে। "মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ বামন নরসিংহ, উদ্ধব অক্রুর ব্রহ্মা প্রহ্লাদ" কেহ বাদ যান নাই। "কোন দিন 'গোপীভাবে' করেন রোদন"—আবার "কোনদিন রামভাবে মদিরা যাচয়"। একদিন এক শিবের গায়ন আসিল—

একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডম্বুর বাজায় গায় শিবের কথন॥
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্কর মূর্ত্তি দিব্য জটাধর॥
একলম্ফে উঠি তায় স্কন্ধের উপর।
হুঙ্কার করিয়া বলে মুঞি সে শঙ্কর॥
কেহ দেখে জটা শিঙ্গা ডমরু বাজায়।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—৮ পঃ)

কেহ—সকলে নয়। আকৃতির পরিবর্ত্তন সকলে দেখিতে পায় নাই। অবশ্য ভাবের পরিবর্ত্তন সকলেই দেখিয়াছে। ভাবের পরিবর্ত্তন সকলের নিকটেই সত্য। আকৃতির পরিবর্ত্তন, যাহারা দেখিয়াছে কেবল তাহাদের নিকটেই সত্য। আর যাহারা দেখে নাই তাহাদের নিকট সত্য নয়। ভাবের পরিবর্ত্তনের মত আকৃতির পরিবর্ত্তন সাধারণ সত্য নয়। ভাবের পরিবর্ত্তন সাধারণ সত্য। আকৃতির পরিবর্ত্তন বিশেষ সত্য।

কীর্ত্তন জোড় চলিতেছে—কেননা "আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন বিলাস"। "শ্রীবাস মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্ত্তন—কোনদিন হয় চন্দ্রশেখর ভবন।"

এইবার ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া কীর্ত্তন হইতেছে। বাহিরের কৌতূহলী দর্শক, বিশেষতঃ পাষণ্ডীরা, কীর্ত্তন দেখিতে না পাইয়া বিষম চটিয়া নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাষণ্ডী ও যবনরাজ ভয়, এই দুইটি বিরুদ্ধ-শক্তিকে সর্ব্বদাই এই নূতন বৈষ্ণব আন্দোলনের দুই পার্শ্বে চলিতে দেখিতে পাই।

পাষণ্ডীদের কথা সংক্ষেপে এই—(১) নিমাইয়ের অধঃপতন

হইয়াছে। কারণ তিনটি—সঙ্গদোষ, নিয়ামক বাপ না থাকা, আর বায়ুরোগ। একদিক দিয়া ইহার প্রত্যেকটিই সত্য এবং প্রত্যক্ষ। (২) তারপর দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, ধান্য মরিয়া যাওয়া—এ সমস্তই ইহাদের অনাচারে ঘটিতেছে। (৩) নৃত্য করা কিছু ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নয়। ইহা অশাস্ত্রীয়। (৪) একসঙ্গে সকলে বসিয়া খায় তা'তে জাতি নষ্ট হয়। (৫) রাত্রে নিশ্চয় ইহারা মদ খায় আর বারনারী গোপনে আনে। নতুবা দরজা বন্ধ করে কেন? (৬) ঠিক হইল শ্রীবাসের ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেও, অন্যথা যবনরাজ গ্রাম উৎখাত করিবে। (৭) রাজদরবারে খবর দেও, এদের সকলকেই কোমরে দড়ি বান্ধিয়া ধরিয়া নিয়া যাউক।

কেহ বলে আরে ভাই মদিরা আনিয়া
সবে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া

নিমাই সম্বন্ধে বলিল—

কেহ বলে সঙ্গ দোষ হইল তাহার
নিয়ামক বাপ নাই তাতে আছে বাই।
কেহ বলে পাসরিল সব অধ্যয়ন
মাসেক না চাহিলে হয় অ-বৈয়াকরণ
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে
খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ
কেহ বলে কালি হউক যাইব দেয়ানে
কাঁকালে বান্ধিয়া সব নিবে জনে জনে
যে না ছিল রাজ্য দেশে আনিয়া কীর্ত্তন
দুর্ভিক্ষ হইল সব গেল চিরন্তন
দেবে হরিলেক বৃষ্টি জানিহ নিশ্চয়
ধান্য মরি গেল, কড়ি উৎপন্ন না হয়
কেহ বলে ব্রাহ্মণের নহে নৃত্য ধর্ম্ম
চাল কলা দুগ্ধ দধি একত্র করিয়া
জাতি নাশ করি খায় একত্র হইয়া
পরম সুবুদ্ধি ছিল নিমাই পণ্ডিত
এ গুলার সঙ্গে তাঁর হেন হৈল চিত।

শ্রীবাস বামনারে এই নদীয়া হৈতে
ঘর ভাঙ্গি কালি নিয়া ফেলাইমু স্রোতে
ও ব্রাহ্মণ ঘুচাইলে গ্রামের কুশল
অন্যথা যবনে গ্রামে করিবেক বল।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—৮পঃ)

যবনে গ্রামে কীর্ত্তনের জন্য বল করিবেক, পাষণ্ডীদের এই ভয়-ই সব চেয়ে বেশী। আর ইহা কিছু মিথ্যা ভয়ও নয়। কাজেই পাষণ্ডীরা প্রাণের দায়ে বৈষ্ণববিদ্বেষী। পাষণ্ডীদের কথায় কোনই অস্পষ্টতা নাই। সত্য ইতিহাস, খাঁটী চিত্র, দক্ষতার সহিত অঙ্কিত। বৃন্দাবনদাস কবি-কঙ্কণের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী আগে। এই দুই জন সেকালের যে ইতিহাস দিয়াছেন, তা' অদ্যাপি কোন ইতিহাসগ্রন্থে লেখা হয় নাই।

প্রথম ১৫০২ খৃষ্টাব্দে, দ্বিতীয় ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বৃন্দাবনদাস নিমাইয়ের বিদ্যাবিলাসের আরম্ভ ও উপসংহারের সময় জন্মেন নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। আবার এখন তৃতীয়বার (১৫০৯ খৃষ্টাব্দের সম্ভবতঃ জুলাই মাসে) নিমাইয়ের কীর্ত্তনবিলাসের সময় জন্মেন নাই বলিয়াও আক্ষেপ করিতেছেন—

হইল পাপিষ্ঠ জন্ম তখন না হইল
হেন মহা মহোৎসব দেখিতে না পাইল।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—৮পঃ)

'হইল' অর্থ ইহার অল্পকাল পরেই, পরের বৎসরই জন্ম হইল। কিন্তু 'তখন' অর্থ এক বৎসর বা তার কিছু আগে জন্ম হইল না। নতুবা আক্ষেপের সঙ্গত কারণ মিলে না।

তারপর শ্রীবাসের বাড়ীতে একদিন নিমাইয়ের খুব আড়ম্বর করিয়া অভিষেক হইল। ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহার নেতৃত্ব গ্রহণ। "নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শিরে ধরে ছাতি। জোড়করে অদ্বৈত সম্মুখে করে স্তুতি।" অপর ভক্তদের ত কথাই নাই। নিমাই বলিলেন "আমার অভিষেক গীত গাও"। গাওয়া হইল। পরে বলিলেন, "আমাকে কিছু খাইতে দাও"। দধি, ক্ষীর, সন্দেশ ইত্যাদি দেওয়া হইল; তিনি খাইলেন।

"আজ্ঞা হৈল শ্রীধরেরে ঝাট গিয়া আন।" শ্রীধর আসিল। বড়

গরীব। কলাগাছের খোলা বেচিয়া খায়। শ্রীধরকে বলিলেন—"শ্রীধর আমারে কর স্তুতি"। শ্রীধর বলিল—আমি মূর্খ 'মুঞি মূঢ়মতি'—সংস্কৃত জানিনা, কি স্তুতি করিব। "কোন স্তুতি জানো মুঞি কি মোর শকতি।" "প্রভু বলে তোর বাক্য সেই মোর স্তুতি।" কত বড় কথা। বাংলার ইতিহাসের পাতা একের পর আর উল্টাইয়া যাও, এত বড় কথা আর কেহ বলে নাই। বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের সমকক্ষ করিয়া লইবার প্রয়োজন রঘুমনি, রঘুনন্দন, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ বুঝেন নাই। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর নবযুগপ্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য তাহা বুঝিয়াছিলেন। যে কারণে বুদ্ধদেব সংস্কৃত ছাড়িয়া পালি ভাষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঠিক সেই কারণেই নিমাই পণ্ডিত বাংলা কথিত ভাষা গ্রহণ করিলেন। "তোর বাক্য সেই মোর স্তব।"

তারপর মুরারির উপর আক্রমণ। আবেশের আক্রমণ মুরারির উপর তিনবার হইয়াছে। মুরারি রামোপাসক ছিলেন। তাঁহাকে বলিলেন, "আমি সেই রাঘবেন্দ্র, তুমি হনুমান"। মুরারি হনুমানের অবতার হওয়াতে তাঁহার 'দীঘল লাঙ্গুল' বহির্গত হইল। ভাগ্যবানেরা তাহা দেখিয়াছেন—এতদিন পরে আর সে কথায় আমাদের কাজ নাই। লোচন বলেন—"রামদাস বলি নাম লিখিলা কপালে"। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"ললাটে লিখিল তাঁর রামদাস নাম"। মুরারি নিজে লিখিয়াছেন—"রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি"। লাঙ্গুলের কথা মুরারি নিজে কিছু লেখেন নাই।

গঙ্গাদাসকে বলিলেন যে, তুমি যবনরাজভয়ে পরিবারাদিসহ নিশা-যোগে পালাইতেছিলে। গঙ্গাঘাটে খেয়া না দেখিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে চাহিয়াছিলে। দুঃখ করিয়াছিলে—"মোর আগে যবনে স্পর্শিবে পরিবার"। আমি ছদ্মবেশে খেয়ারির রূপে তোমায় পার করিয়াছিলাম। তুমি "এক তঙ্কা এক জোড় বক্সিস" আমাকে দিতে চাহিয়াছিলে,—মনে আছে? গঙ্গাদাস "শুনিয়া মূর্চ্ছিত দাস গড়াগড়ি যায়"। যবনরাজভীতি যে নিমাইয়ের বৈষ্ণব আন্দোলনের একটি প্রধান কারণ ক্রমে শ্রীচৈতন্যে রাধাভাবের প্রাবল্যে তাহা চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

বৃন্দাবনদাসের জন্ম কখন হইল না, ইহা তিনি তিনবার উল্লেখ

করিয়াছেন। কিন্তু কখন হইল ইহা তিনি একবারও উল্লেখ করেন নাই। নিমাই লক্ষ্মীকে বিবাহের পর এবং পূর্ব্ব বঙ্গে গমনের পূর্ব্বে, অতএব ১৫০২ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মেন নাই (চৈঃ ভাঃ, আদি—১০ অঃ)। নিমাই ১৫০৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে গয়া গিয়া ৪ মাস থাকিয়া, ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় ছাত্র পড়াইবার জন্য ৪ মাস চেষ্টা করেন। অর্থাৎ মে মাস পর্য্যন্ত চেষ্টা করেন। তখন (১৫০৯ খৃষ্টাব্দের মে) তিনি জন্মেন নাই (চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১অঃ)। নিত্যানন্দের আগমন ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে জুনের শেষ কিংবা জুলাইর প্রথম। নিত্যানন্দের আগমনের পর এবং নিমাইয়ের অভিষেকের পূর্ব্বে (১৫০৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই) তিনি জন্মেন নাই (চৈঃ ভাঃ, মধ্য—৮অঃ)। নিমাইয়ের অভিষেক, নিত্যানন্দের ব্যাস পূজার পরেই আগষ্টের প্রথমে হইবে। নিমাই এই অভিষেকের দিনে নারায়ণীকে ভোজনাবশেষ দিলেন'।

ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান
তাহারে ভোজন শেষ প্রভু করে দান।
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব মণ্ডলে এই ধ্বনি
গৌরাঙ্গের অবশেষ পাত্র নারায়ণী।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১০ অঃ)

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন
তাঁর গর্ভে জন্মিল শ্রীদাস বৃন্দাবন।

(চৈঃ চঃ, আদি—৮ পঃ)

উচ্ছিষ্ট ভোজন যদি গর্ভের কারণ হয়, তবে ১৫১০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে দশ মাস পূর্ণ হইয়া বৃন্দাবনদাসের জন্ম হইয়াছিল। ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর মধ্যভাগে নিমাই সন্ন্যাস নিয়া নীলাচল গমন করেন। নিমাইয়ের উচ্ছিষ্ট ভোজনের সময় নারায়ণীর ৪ বৎসর বয়ঃক্রমের কথা ঠিক কথা নয়। বৃন্দাবনদাসের জন্মকে রহস্যে আবৃত করার জন্য ঐরূপ বলা হইয়াছে। বৃন্দাবনদাস তাঁহার জন্মের অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করিয়া

যাহা শুনিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন। তিনি সর্ব্বত্রই নিজেকে "নারায়ণী-স্নুত" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কুত্রাপি তিনি পিতার নাম উল্লেখ করেন নাই। কেননা তাঁহার জন্মকালে তাঁহার মাতা "অভর্ত্তৃকা" অর্থাৎ বিধবা ছিলেন।

অভিষেকের সময় নারায়ণীকে ভোজনাবশেষ দিলেন, আর অপর সকলকে বর দিলেন। অদ্বৈতকেও বর দিলেন। দিলেন না নিত্যানন্দকে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। নিত্যানন্দ বরদানের উর্দ্ধে। নিত্যানন্দের একখানি কৌপীন ছিঁড়িয়া এক এক টুকরা করিয়া সকলকে বিতরণ করিলেন। নিত্যানন্দের পাদোদক সকল ভক্তকে খাওয়াইলেন। দলের মধ্যে নিত্যানন্দের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। দল সংগঠনে এইরূপে তাঁহার নেতৃত্বের প্রকাশ সকলে দেখিল।

যবন হরিদাসকেও বর দিলেন, বলিলেন—

এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়
তোমার যে জাতি সেই জাতি মোর দড়।
যেবা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে
শীঘ্র আইনু তোর দুঃখ না পারোঁ সহিতে।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১০অঃ)

দুইটি লক্ষ্য করিবার বিষয়—১ম, নিমাই নিজেকে যবন হরিদাসের সহিত একজাতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ২য়, হরিদাসের উপর যবন-রাজ অত্যাচার নিমাইয়ের শীঘ্র প্রকাশ হইবার কারণ, ইহাও স্পষ্ট ঘোষণা করিলেন। এই দুইটি ঘোষণার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।

বৈষ্ণব হওয়ার অপরাধে ঠিক কোন বৎসরে যে যবন হরিদাসকে ২২ বাজারে চাবুক মারা হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহ বলেন না। ১৫০৬, ১৫০৭ অথবা ১৫০৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরের আগে যেকোন বৎসরে হইতে পারে। যে বৎসরেই হউক হরিদাসের উপর এই রাজঅত্যাচার, নিমাইয়ের মনকে যে কিরূপ আঘাত করিয়াছিল, কিরূপ বিচলিত করিয়াছিল এবং তাহার কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল ইহা বৃন্দাবনদাস সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। নিমাই হরিদাসকে বলিলেন—

পাপীষ্ঠ যবনে তোমা বড় দিল দুঃখ
তাহা সঙরিতে মোর বিদরয়ে বুক
শুন শুন হরিদাস তোমারে যখনে
নগরে নগরে মারি বেড়ায় যবনে।
দেখিয়া তোমার দুঃখ চক্র ধরি করে
নামিনু বৈকুণ্ঠ হৈতে সবা কাটিবারে।
প্রাণান্ত করিয়া তোমা মারয়ে সকলে
তুমি মনে চিন্ত তাহা সবার কুশলে।
আপনে মারন খাও তাহা নাহি লেখ
তখনও তা সবারে মনে ভাল দেখ।
তুমি ভাল চিন্তিলে না করোঁ মুঞি বল
মোর চক্র তোমা লাগি হৈল বিফল।
কাটিতে না পারোঁ তোর সংকল্প লাগিয়া
তোর পৃষ্ঠে পড়োঁ তোর মারন দেখিয়া।
তোমার মারন নিজে অঙ্গে করিলঙ
এই তার সাক্ষী আছে মিছা নাহি কঙ।

তারপর—

যেবা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে
শীঘ্র আইনু তোর দুঃখ না পারো সহিতে।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১০অঃ)

সুতরাং হরিদাসের উপর হুসেন সাহর রাজত্বকালে যখন অত্যাচার হইয়াছিল তখন বৈকুণ্ঠ হৈতে চক্র হাতে অত্যাচারীকে কাটিবার জন্যই যে নিমাই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—বিনাশায় চ দুস্কৃতাং—ইহা তিনি নিজ মুখেই স্বীকার করিলেন। রাজ অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া—নিমাইয়ের চক্র হাতে কৃষ্ণের অবতার হওয়া। অদ্বৈত ইহাই এতদিন ধরিয়া চাহিতে-ছিলেন। তাঁহার আকিঞ্চন, তাঁহার হুঙ্কার বৃথা হয় নাই। হরিদাস ইহারি প্রতীক্ষায় গোঁফায় বসিয়া নাম জপ করিতেছিলেন। সে নাম জপ বৃথা হয় নাই।

ষষ্ঠ বক্তৃতা

[নিমাই পণ্ডিতের বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের আজ্ঞা। নিত্যানন্দ ও যবন হরিদাস, এই দুই জনকে নিমাই পণ্ডিত কেন প্রথম প্রচারকরূপে নির্ব্বাচন করিলেন? প্রচারে বিঘ্ন ও তাহার কারণ বিশ্লেষণ। জগাই মাধাই উদ্ধার—প্রচারের অভিনব প্রকৃতি নিরূপণ। চন্দ্রশেখর ভবনে নাটকাভিনয়। নিমাইয়ের রুক্মিণী বেশে নৃত্য—ইহার তাৎপর্য্য কি? পুনরায় কাজী ও পাষণ্ডীর অত্যাচার—কারণ বিশ্লেষণ। প্রতিবাদে নগর সংকীর্ত্তন। চাঁদ কাজী কে? সিমুলিয়া গ্রাম কোথায়? চাঁদ কাজীর বাড়ী আক্রমণ ও লুণ্ঠন সম্পর্কে বিভিন্ন চরিত গ্রন্থের বিরোধী মতের সামঞ্জস্যের চেষ্টা।]

অভিষেকের পর বৃন্দাবনদাস প্রচারের কথা লিখিয়াছেন—

একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি
শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ
'প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা
কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বোল, কর কৃষ্ণ শিক্ষা
ইহা বই আর না বলিবা, বোলাইবা
দিবা অবসানে আসি আমারে কহিবা'
তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই না বলিব
তবে আমি চক্র হস্তে সভারে কাটিব।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১৩ অঃ)

লক্ষ্য করিবার বিষয়—১ম, সর্ব্বপ্রথমদিনের প্রচার রাজ আজ্ঞার মত উচ্চারিত হইয়াছিল। যেসকল পাষণ্ডী এই প্রচারে বিরোধী হইবে, কৃষ্ণের অবতার নিমাই তাহাদের সবারে চক্রহস্তে কাটিবেন। যিনি শ্রীবাসের বাড়ীতে মাত্র সেদিন পাষণ্ডী সংহারের জন্য গদা পূজা করিয়াছেন,—যিনি ঠাকুর হরিদাসের উপর যবন অত্যাচার দেখিয়া বৈকুণ্ঠ হৈতে 'সবা কাটিবারে' চক্র হাতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—তাঁহার চরিত্রের সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই এই চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

২য়, প্রথম দিনের প্রথম দুই প্রচারকের মধ্যে একজন হিন্দু আর একজন মুসলমান—অথচ দুইজনেই বৈষ্ণব। মুসলমান যে শুধু বৈষ্ণব হইতে পারে তাহা নয়; মুসলমান বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতে নিমাই পণ্ডিতের আদেশে প্রথম দিনই নবদ্বীপের রাজপথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দুর্গের বুকে বসিয়া, নিমাইয়ের পক্ষে ইহা সেদিন কত বড় দুঃসাহসের কার্য্য ছিল! নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ সমাজে সেদিন এক ভূমিকম্প অনুভূত হইবার কথা।

ব্রাহ্মণ মুসলমানের সংমিশ্রণমূলক এই প্রচারে নানা জনে নানা কথা বলিলেন। কেহ বলিল এ দুইজন 'ক্ষিপ্ত'—পাগল হইয়া গিয়াছে। কেহ বাড়ী যাওয়া মাত্রই "মার মার" শব্দে ধাওয়া করিল। কেহ বলিল—"নিমাই পণ্ডিত নষ্ট করিল সকল"। কেহ বলিল—"আর বার আসে যদি লইব দেয়ানে"। রাজার কাছে ধরিয়া লইয়া যাইব, অর্থাৎ পুলিশে দেব। আর তার দরকার হইল না। প্রচারক দুইজন অতি সত্বরেই একেবারে দুই বাঘের মুখে গিয়া পড়িলেন।

নবদ্বীপে পাষণ্ডীদের দুই সর্ব্বোত্তম প্রতিনিধি জগাই মাধাই। তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ। খাস নবদ্বীপবাসী, নবদ্বীপেই জন্ম। "সুব্রাহ্মণ পুত্র দুই, জন্ম এই ঠাঞি।" কিন্তু গোমাংস ভক্ষণ আর গুরুপত্নী গমন, ইহাতে তাহাদের আপত্তি নাই। মদিরা তাহারা সর্ব্বক্ষণ পান করিয়া পরম উল্লাসে আছেন।

একদিন প্রচারে বাহির হইয়া নিত্যানন্দ আর হরিদাস এই দুই মাতাল দস্যুকে দূর হইতে দেখিলেন—

দুই জন পথে পড়ি গড়াগড়ি যায়
যাহারেই পায় সেই তাহারে কিলায়
ক্ষণে দুইজনে প্রীত, ক্ষণে ধরে চুলে
চকার বকার শব্দ উচ্চ করি বলে।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১৩ অঃ)

সংক্ষেপে অথচ অতিশয় দক্ষতার সহিত এই দুই মাতাল অঙ্কিত হইয়াছে। "এই দুই দেখি সব নদীয়া ডরায়।" "হেন পাপ নাহি যাহা করে দুইজন।" গোবধ, আর ব্রহ্মবধ ত ইহাদের কাছে কিছুই না—

ডাল ভাত। ইহা শুনিয়া নিত্যানন্দ করুণায় বিগলিত হইলেন এবং মনে মনে ইহাদের উদ্ধারচিন্তা করিতে লাগিলেন।

শুনি নিত্যানন্দ বড় কারুণ্য হৃদয়
দুইয়ের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়।

'করুণা' শব্দটি বৌদ্ধদের নিজস্ব। এই শব্দ এবং তার অর্থ—দুই-ই বৈষ্ণবেরা বৌদ্ধদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। নিত্যানন্দ হরিদাসকে বলিলেন—

প্রাণান্তে মারিল তোমা যবনের গণে
তাহারও করিলে তুমি ভাল মনে মনে।
যদি তুমি শুভানুসন্ধান কর মনে
তবে সে উদ্ধার পায় এই দুই জনে।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১৩ অঃ)

নিত্যানন্দ বলিলেন—চল আমরা এই দুই মদ্যপের ঠাঞি গিয়া প্রভুর আজ্ঞা জানাই। যদিও সকলকেই প্রভু কৃষ্ণ ভজিবার আদেশ দিয়াছেন—"তার মধ্যে অতিশয় পাপীরে বিশেষ"। এই যুক্তি করিয়া "নিত্যানন্দ হরিদাস করিলা গমনে"। সাধুলোক সব মানা করিতে লাগিল, বলিল—সর্ব্বনাশ! "নিকটে না যাও; লাগাল পাইলে পাছে পরাণ হারাও।" 'পরাণ তরাসে' আমরা দূরে থাকি, তোমরা যে নিকটে যাও কোন সাহসে? "কিসের সন্ন্যাসী জ্ঞান ওভ্-এর ঠাঞি।" তথাপি নিত্যানন্দ হরিদাস নিকটে চলিলা। "শুনি-বারে পায় হেন নিকট থাকিয়া। কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া।" এই দুই হিংস্র পশুতুল্য মাতাল নেশার চোটে মাথাই তুলিতে পারে না।

ডাক শুনি মাথা তুলি চাহে দুই জন
মহাক্রোধে দুই জন অরুণ লোচন।
ধর ধর ধর বলি ধরিবারে যায়
আথে ব্যথে নিত্যানন্দ হরিদাস ধায়।

এইত অবস্থা। হরিদাস নিত্যানন্দের উপর চটিয়া গেলেন।

হরিদাস বলে ঠাকুর আর কেন বল
তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল।
হরিদাস বলে আমি না পারি চলিতে
জানিয়াও আসি আমি চঞ্চল সহিতে।
রাখিলেন কৃষ্ণ কাল যবনের ঠাঞি
চঞ্চলের বুদ্ধে আজি পরাণ হারাই।

নিত্যানন্দ বলিলেন—আমি চঞ্চল নই, তোমার প্রভুই বিহ্বল। কেননা—

ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজ আজ্ঞা করে।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১৩ অঃ)

নিত্যানন্দ ও হরিদাস আসিয়া এই দিনের বৃত্তান্ত নিমাইয়ের নিকট বলিলেন—

প্রভু বলে জানোঁ জানোঁ সেই দুই বেটা
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা।

"কাটিমু", "খণ্ড খণ্ড করিমু"—ইহা নিমাই চরিত্রের বিশেষত্ব। সত্য না হইলে, মিথ্যা করিয়া বৃন্দাবনদাস ইহা প্রভুর মুখ দিয়া বলাইতে সাহসী হইতেন না। নিত্যানন্দ এই খণ্ড খণ্ড করা সমর্থন করিলেন না। ইহা আবার নিত্যানন্দ চরিত্রের বিশেষত্ব।

নিত্যানন্দ বলে খণ্ড খণ্ড কর তুমি
সে দুই থাকিতে কোথা না যাইব আমি।
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াঞি
আগে সেই দুই জনে গোবিন্দ বলাই।

অদ্বৈত হরিদাসকে সাহস দিয়া বলিলেন—কোন চিন্তা নাই, নিত্যানন্দ মাতাল ; জগাই মাধাইও মাতাল। তিন মাতাল এক সঙ্গে হইবে। এই দেখ নিত্যানন্দ তাহাদের দলে আনিল বলিয়া। অদ্বৈত নিত্যানন্দকে সর্ব্বদাই মাতালিয়া বলিতেন। রহস্যও আছে, আবার কিছুটা সত্যও থাকিতে পারে।

এদিকে জগাই মাধাই, যে ঘাটে নিমাই গঙ্গাস্নান করেন সেই

স্থানে আসিয়া "করিলেক থানা"। সর্ব্ব রাত্রি নিমাইয়ের বাড়ীতে মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজাইয়া কীর্ত্তন হয়। জগাই মাধাই—"দূরে থাকি সব ধ্বনি শুনিবারে পায়। শুনিলেই নাচিয়া অধিক মদ্য খায়।" মদ্যপানে তাহারা এতদূর বিহ্বল হইয়াছে যে, কোথায় বা তাহারা ছিল আর কোথায় বা এখন আছে তা কিছুই জ্ঞান নাই। দৈবে একদিন নিমাইয়ের সহিত তাহাদের দেখা হইল—

প্রভুরে দেখিয়া বলে, নিমাই পণ্ডিত
করাইবা সংপূর্ণ মঙ্গল চণ্ডীর গীত।
গায়েন সব ভাল মুঞি দেখিবারে চাঙ
সকল আনিয়া দিব যথা যেই পাঙ।

শাক্তেরা দম্ভ করি বিষহরী পূজে, আর মঙ্গল চণ্ডীর গীতে রাত্রি জাগরণ করে। তাহারা কৃষ্ণও ভজে না, আর কীর্ত্তনও করে না। নিমাই দুর্জ্জন দেখিয়া দূরে দূরে সরিয়া গেলেন। মঙ্গল চণ্ডীর গীতে জগাই মাধাই খুব উৎসাহী—তাহারা শাক্ত।

একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া নিশায় প্রভুর বাড়ীতে আসিতে-ছিলেন। পথে জগাই-মাধাইয়ের সঙ্গে দেখা। "কে-রে কে-রে বলি ডাকে জগাই মাধাই।" "কিবা নাম তোর?" "নিত্যানন্দ বলে অবধূত নাম মোর।"

অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া
মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া।
ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে।
দয়া হৈল জগাইর রক্ত দেখি মাথে
আর বার মারিতে ধরিল তার হাতে।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১৩ অঃ)

মাধাই হইতে জগাই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। জগাই বলিল, দেশান্তরী সন্ন্যাসী মারিয়া "কোন ভালই তোমার"? ইহা অতিশয় নির্দ্দয় কার্য্য—"কেন হেন করিলে"?

এদিকে "আথে ব্যথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিল"। তৎক্ষণাৎ সাঙ্গোপাঙ্গে নিমাই ছুটিয়া আসিলেন।

নিত্যানন্দের অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দুয়ের ভিতরে॥
রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে।
চক্র, চক্র, চক্র প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥
আথে ব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হইল।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল॥
আথে ব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন
মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই॥
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১৩ অঃ)

খুব জীবন্ত বর্ণনা। নিমাই পাষণ্ডী সংহার করিবার জন্য কৃষ্ণের অবতার হইয়াছেন। ক্রোধে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই,—কাজেই "চক্র, চক্র, চক্র প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে"। শুধু ডাকা নয়, চক্র স্বয়ং আসিয়া উপসন্ন হইল। জগাই মাধাই তাহা চক্ষে দেখিল। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন—"কিছু দুঃখ নাহি মোর, তুমি হও স্থির"। তিনি নিমাইকে স্থির হইতে বলিলেন। "মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই"—এই কথা প্রভুর মনে ধরিল। ইহা শুনিয়া তিনি জগাইকে আলিঙ্গন করিলেন। জগাই মুর্চ্ছিত হইল। প্রভু জগাইয়ের বক্ষে শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন। তারপর শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, জগাই সমস্তই দেখিল। "মাধাইয়ের চিত্ত ততক্ষণে ভাল হইল।" প্রভু তাদের আর পাপ করিতে নিষেধ করিলেন। "প্রভু বলে তোরা আর না করিস পাপ। জগাই মাধাই বলে—আর নারে বাপ।"

এই যে "আর নারে বাপ"—ইহাকেই বলে রূপান্তর। ইহা প্রথমে হয় জীবনে; তারপরে হয় কাব্যে, ইতিহাসে। এখানে ও তাই হইয়াছে।

জগাই-মাধাইকে প্রভুর বাড়ীর অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া উহা দেখিলেন এবং

আনন্দ সাগরে ভাসিলেন। "বধূ সঙ্গে দেখে আই ঘরের ভিতরে। বসিয়া ভাসয়ে আনন্দ সাগরে।" এক মনোরম পারিবারিক চিত্র আমরা সম্মুখে দেখিতেছি।

চিত্রগুপ্তকে যম রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, জগাই-মাধাইয়ের কত পাপ? চিত্রগুপ্ত বলিলেন—"লক্ষেক কায়স্থ যদি এক মাস পড়ে" তবু শেষ করা যাইবে না। ইহাদের পাপ "লিখিতে কায়স্থ সব উৎপাত গণয়ে"। কায়স্থেরা চিত্রগুপ্তের সেরেস্তাতেও লেখার কাজ করেন। কথায় বলে—স্বর্গে গেলেও ঢেকি ধান ভানে।

জগাই মাধাই আর পাপ করে না। উষাকালে নির্জ্জনে দুই জনে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রতিদিন দুই লক্ষ কৃষ্ণ নাম জপ করে। "আপনে আসিয়া প্রভু ভোজন করায়।" দেখা যাইতেছে ইহারা ঠাকুর হরিদাসের অনুগামী হইল। মাধাই একদিন প্রভুকে বলিল, "কার বা করিনু হিংসা কারে নাহি চিনি"—যদি চিনিতাম তবে না হয় গিয়া ক্ষমা চাহিতাম। প্রভু বলিলেন—"গঙ্গাঘাট তুমি সজ্জ করহ সদায়"। সকলকেই কাকু অর্থাৎ বিনয় করিয়া নমস্কার করিও, তাতেই তোমার সকল অপরাধ খণ্ডন হইয়া যাইবে। মাধাই তাই করিতে লাগিল। "অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে,—মাধাইয়ের ঘাট বলি সর্ব্ব লোক গায়।" "পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই।" তাঁর ব্রহ্মচারী বলিয়া খ্যাতি রটিয়া গেল। লম্পট ব্রহ্মচারী হইল। ইহাকেই বলে রূপান্তর।

ইহার ফল কি হইল? সকলেই বলিতে লাগিল—"প্রাকৃত মনুষ্য নহে নিমাই পণ্ডিত। এবে সে মহিমা তান হইল বিদিত।" ইহার ফল প্রচারের সফলতা বহুদূর অগ্রসর হইল এবং নিমাই পণ্ডিত যে 'প্রাকৃত মনুষ্য নহে'—এ কথা শুধু ভক্তেরা নয়, নবদ্বীপবাসীরা ক্রমে বিশ্বাস করিতে লাগিল।

ইহাকে "নির্লক্ষ উদ্ধার" বলা হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, এ উদ্ধার শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দ্বারা পূর্ব্ব পরিকল্পিত। বৈষ্ণব ধর্ম্মের অহিংস নীতিবাদ, ক্ষমার ভিত্তির উপর নিত্যানন্দই প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার আগে করিয়াছেন ঠাকুর হরিদাস। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ব ও নীতি বহু প্রতিভার সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠিয়াছে—মহাপ্রভুর নেতৃত্বে, তাঁহার

অপূর্ব্ব বলশালী চরিত্রে, প্রাণময় জীবন্ত হইয়া জগতের সম্মুখে প্রকাশ পাইয়াছে।

অদ্বৈতের চক্রহস্তে পাষণ্ডী সংহার, নিমাইয়ের "কাটিমু", "খণ্ড খণ্ড করিমু"—নিত্যানন্দ ক্ষমা ও অহিংসার ভিত্তিতে পাষণ্ডী উদ্ধারে পরিণত করিলেন। নিত্যানন্দের প্রতিভা এই প্রচারকে অহিংসার পথে পরিচালিত করিল। বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের মুখে শুনিয়া জগাই মাধাই উদ্ধার নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা সত্য ইতিহাস ও জীবন্ত চিত্র এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য।

জয়ানন্দ জগাই মাধাই সম্পর্কে লিখিতেছেন—

দস্যুগণ সঙ্গে থাকে বনে তেপান্তরে।
নিদ্রা না জাএ লোক জগাই মাধাই ডরে॥
অন্নযোনি বিচার নাহিক দুই ভাই।
চান সন্ধ্যা বিবর্জ্জিত জগাই মাধাই॥
গোবধ, ব্রহ্মবধ, স্ত্রীবধ জত জত।
বলে ছলে গুরুপত্নী হরে শত শত॥
গোমাংস শুকর মাংস করে স্নুরাপান।
ধর্ম্ম কথা না শুনে না করে গঙ্গাচান॥
শিশু সব আছাড়িয়া মারে শিলাপাটে।
কত কত গর্ভবতীর কত গর্ভ কাটে॥
গলে যজ্ঞ স্নুত্র বাধা জেন সিংহনাদ।
উত্তম বধির প্রায় মহাপরমাদ॥
উদয়াস্ত জ্ঞান নাহি মদিরা ভক্ষণে।
ঘুর্ণিতা লোচনচারু পূর্ণ শক্রাসনে॥
দস্যুগণ সঙ্গে থাকি ঘরে অগ্নি দেই।
বুকে বাঁশ দিয়া কারো সর্ব্বস্ব নেই॥

(চৈঃ মঃ—নদীয়া খণ্ড)

জগাই-মাধাইয়ের গুনাবলী ও আচারব্যবহার সম্পর্কে সব গ্রন্থকর্ত্তাই একমত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে যেমন নবদ্বীপে একটা প্রবল অধ্যাপক সমাজ ছিল, তেমনই জগাই-মাধাইয়ের মত দস্যুও ছিল।

নিত্যানন্দ শিরে মাধাই মুটকী মারিল।
বজ্রাঘাত সম রক্ত চৌদিকে স্রবিল ॥
নিত্যানন্দ শিরে রক্ত পড়ে বুক বাঞা।
গৌড়চন্দ্রে দূত সব জানাইল গিঞা ॥
নিত্যানন্দ বলে মোরে মারিল মাধাই।
আজিকার দুর্গে মোরে রাখিল জগাই ॥
জগাই বলে অপরাধ ক্ষেম গৌড়চন্দ্র
না জানিয়া মাধাই মারিল নিত্যানন্দ ॥

(চৈঃ মঃ—নদীয়া খণ্ড)

তারপর প্রভু হাত পাতিয়া জগাই-মাধাইয়ের পাপ গ্রহণ করিলেন।

জগাইরে প্রেমভক্তি দিল গৌড়চন্দ্র।
মাধাইরে হরিনাম দিলা নিত্যানন্দ ॥

মাধাইকে হরিনাম নিত্যানন্দই দিলেন, গৌরচন্দ্র দিলেন না।

জয়ানন্দ এই ঘটনার প্রত্যেকটি বর্ণনায় বৃন্দাবনদাসকে অনুসরণ করিয়াছেন।

লোচন লিখিয়াছেন যে, প্রভু নিজেই কীর্ত্তন করিতে করিতে জগাই-মাধাইয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন—

সেই পথে কীর্ত্তন করিয়া প্রভু যায়।
নদীয়ার লোক সব দেখিবারে ধায় ॥
জাগিল দুই ভাই কীর্ত্তনের রোলে।

(চৈঃ মঃ—মধ্য খণ্ড)

লোচনের একথা নির্ভরযোগ্য নয়। বৃন্দাবনদাস ও জয়ানন্দ এরূপ কথা লেখেন নাই। যাহা হউক দুই ভাই কীর্ত্তনের রোলে জাগিয়া দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ক্রোধভরে বলিল, "নাশিব সকল বৈষ্ণব নদীয়া-নগরে"। মাধাই লাঠি হাতে তাড়া করিল, এবং সম্মুখে এক খণ্ড ভগ্ন কলসীর কানা পাইয়া নিত্যানন্দের মাথায় মারিল। নিত্যানন্দের মাথা কাটিয়া রক্তের ধারা প্রবাহিত হইল। "ফুটিলা মুটকী শিরে রক্ত পরে

ধারে।" নিত্যানন্দ গৌর বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিলেন। বৃন্দাবনদাসও লিখিয়াছেন, "নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গোবিন্দ সঙরে"। এবং বলিলেন—

মারিলি কলসীর কানা সহিবারে পারি।
তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি॥
মেরেছিস মেরেছিস তোরা তাহে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই॥
নিত্যানন্দ অঙ্গে সব রক্ত পরে ধারে।
আনন্দময় নিত্যানন্দ গৌড়াঙ্গে নেহারে॥
প্রেমভরে মহাপ্রভু নিতাই কোলে নিল।
আপন বসন দিয়া রক্ত মুছাইল॥

(চৈঃ মঃ—মধ্য খণ্ড)

"নিত্যানন্দের অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে"—এই ছত্রের প্রত্যেকটি অক্ষর লোচন বৃন্দাবনদাস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। অথবা পরবর্ত্তীয়দের দ্বারা ইহা হুবহু প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। জয়ানন্দে এরূপটী ঘটে নাই। প্রভু ক্রোধভরে সুদর্শন চক্রকে ডাকিলেন। তৎক্ষণাৎ আসিয়া "দাঁড়াইল সুদর্শন করজোড় করি"। প্রভু বলে "জগাই-মাধাইরে সংহার"; সুদর্শন প্রলয় অগ্নির মত জগাই-মাধাইয়ের প্রতি ধাবিত হইল। নিত্যানন্দ সুদর্শনকে থামাইয়া প্রভুকে বলিলেন—"এ দুই পতিতে প্রভু মোরে দেহ দান"। ইহাও সেই বৃন্দাবনদাসের "মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর"। নিত্যানন্দ আরও বলিলেন—

সংকীর্ত্তন আরম্ভেতে তোমার অবতার।
কৃপায় সকল জীবে করিবে উদ্ধার॥
যে মারিবে তারে যদি করিবে সংহার।
কেমনে করিবে কলি জীবের নিস্তার॥

(চৈঃ মঃ—মধ্য খণ্ড)

অতএব জগাই-মাধাইকে ছাড়িয়া দিয়া "ঘরে গেলা মহাপ্রভু নিজ জন লইয়া"। জগাই মাধাই উভয়েই বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। তারপর উর্দ্ধমুখে ধাইয়া মহাপ্রভুর দ্বারে গিয়া উপনীত হইল এবং

ঠাকুর ঠাকুর বলিয়া ডাকিতে লাগিল। প্রভু মুরারিকে বলিলেন—'কে ডাকে, লইয়া আইস।' জগাই মাধাই আসিয়া প্রভুর চরণতলে পড়িয়া কান্দিতে লাগিল। বলিল—

গোবধ স্ত্রীবধ পাপ করিয়াছি যত।
লেখাজোখা নাহি নরবধ কৈলু কত॥
ব্রাহ্মণী, যবনী, গুর্ব্বঙ্গনা নাহি এড়ি।
চণ্ডালিনী আদি চারি কাহুকে না ছাড়ি॥
সহস্র কায়স্থ যদি দুই মাস গণে।
তবু আমা দোঁহা পাপ গণিতে না জানে॥

(চৈঃ মঃ—মধ্য খণ্ড)

বৃন্দাবনদাসের 'এক লক্ষ কায়স্থ' লোচনে আসিয়া 'এক সহস্রে' ঠেকিয়াছে। সংখ্যা কিছুটা কমিয়াছে।

প্রভু বলিলেন—তোমাদের সমস্ত পাপ আমাকে উৎসর্গ কর। জগাই মাধাই তাহাদের সমস্ত পাপ প্রভুর হাতে তুলিয়া দিল। লোচনের নিমাই জগাই-মাধাইকে ফেলিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলেন। বৃন্দাবনদাসের নিমাই জগাই-মাধাইকে তুলিয়া লইয়া বাড়ীতে আসিলেন। "দুই জনে তুলি লহ আমার বাড়ীতে।"

কবিরাজ গোস্বামী এক ছত্রে জগাই মাধাই উদ্ধার শেষ করিয়াছেন।

"তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই-মাধাই।"

(চৈঃ চঃ, আদি—১৭পঃ)

নবদ্বীপলীলার এতবড় ঘটনা কবিরাজ গোস্বামী এত সংক্ষেপে এক ছত্রে শেষ করায় আমরা যত না নিরাশ হইয়াছি, তার চেয়ে বেশী বিস্মিত হইয়াছি। নবদ্বীপলীলা সম্পর্কে কবিরাজ গোস্বামীর মত অসম্পূর্ণ গ্রন্থ অপর কোন চরিত লেখক লেখেন নাই—জয়ানন্দও নহে, লোচনও নহে। অবশ্য কবিরাজ গোস্বামী এক্ষেত্রে বৃন্দাবনদাসের উপর নির্ভর করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন, এই যা ভরসা।

তারপর একদিন নিমাই বুদ্ধিমন্ত খানকে বলিলেন—

সত্বরে চলহ বুদ্ধিমন্ত খান তুমি।
কাচ সজ্জ কর গিয়া নাচিবাঙ আমি॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১৮অঃ)

বুদ্ধিমন্ত খান নবদ্বীপে একজন সম্ভ্রান্ত ধনী লোক। 'খান' মুসলমান রাজসরকার প্রদত্ত উপাধি।

"শঙ্খ, কাঁচুলি, পাটসাড়ী, অলঙ্কার"—সমস্ত তৈয়ারী হইল। তারপর চন্দ্রশেখর ভবনে এক রাত্রে নাটকের অভিনয় হইল। নিমাই বলিলেন, "প্রকৃতি স্বরূপা নৃত্য হইবে আমার"—নিমাই রুক্মিণীর আবেশে নৃত্য করিলেন। শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে সঙ্গে লইয়া এই নাটক অভিনয়ে প্রভুর রুক্মিণীবেশে নৃত্য দেখিবার জন্য রাত্রে চন্দ্রশেখর ভবনে গমন করিলেন।

আই চলিলেন নিজ বধুর সহিতে।
লক্ষ্মীরূপে নৃত্য বড় অদ্ভুত দেখিতে॥
যত আপ্ত বৈষ্ণবগণের পরিবার।
চলিলা আইর সঙ্গে নৃত্য দেখিবার॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১৮অঃ)

বৈষ্ণবগণের পরিবারেরাও চলিলেন।

প্রথমেই হরিদাস "মহা দুই গোঁফ বদনে বিলাস করিয়া" এবং দুই হাতে দুই গোঁফ মুচরাইয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন। "আরে আরে ভাই সব হও সাবধান—নাচিবে লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ।" হরিদাস বৈকুণ্ঠের কোটাল সাজিয়াছেন। তিনি বলিলেন—কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে নাই, নবদ্বীপ আসিয়াছেন ; কাজেই এখানে আমার আগমন।

শ্রীবাস নারদ সাজিয়াছেন—

মহাদীর্ঘ পাকাদাড়ী ফোটা সর্ব্বগায়।
বীণা কান্ধে কুশহস্তে চারিদিকে চায়॥

শ্রীবাসের মুর্ত্তি দেখিয়া শচীমাতা আনন্দে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তারপর—

গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইল নির্ভর॥
আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী আবেশে।
বিদর্ভের সুতা হেন আপনাকে বাসে॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১৮অঃ)

প্রভু শুধু রুক্মিণীর সাজ পড়িলেন না— রুক্মিণী-আবেশে রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইলেন। অভিনয়ে ইহাই প্রধান কলাকৌশল। গদাধর রুক্মিণীর সখী সুপ্রভা সাজিয়া প্রবেশ করিলেন। রুক্মিণীবেশে নৃত্য শেষ হইলে পর, প্রভু আদ্যাশক্তির বেশে নৃত্য করিলেন। "মহাচণ্ডী হেন সবে বুঝেন প্রকাশে।"

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত শক্তি আছে
সকল প্রকাশে প্রভু রুক্মিণীর নাচে।

লৌকিক, বৈদিক, যত কিছু কৃষ্ণ-শক্তি প্রভু রুক্মিণীর সাজে প্রকাশ করিলেন।

তারপর—

মহালক্ষ্মী ভাবে উঠে খট্টার উপরি
কেহ পড়ে লক্ষ্মীর স্তব কেহ চণ্ডীর স্তুতি।

প্রভুর জগৎ-জননীর আবেশ হইল। তিনি সকল ভক্তগণকে স্তন পান করাইলেন। নিত্যানন্দ প্রভু বড়াই-বুড়ী সাজিয়াছিলেন। সাতদিন পর্য্যন্ত চন্দ্রশেখরের ভবনে চন্দ্র-সূর্য্য-বিদ্যুৎ যেন একত্রে জ্বলিতেছে, এইরূপ দেখা গেল। এই নাটক অভিনয় উপলক্ষে প্রভু লৌকিক ও বৈদিক, সকল শক্তি মূর্ত্তির প্রকাশ দেখাইলেন। ইহা শুধু নাটক অভিনয় নয়—তাঁহার আরব্ধ প্রচার কার্য্যের একটি বিশেষ অঙ্গ জীবনের স্ফুর্ত্তি ও উল্লাসের একটি প্রকাশ। জগাই মাধাই উদ্ধারের পর এই উল্লাস তিনি প্রকাশ করিলেন।

জয়ানন্দ রুক্মিণীবেশে নৃত্যের কথা কিছু লিখিলেন না। লোচন উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অতিশয় সংক্ষেপে—

চন্দ্রশেখরের বাড়ী নাচিয়া গাইয়া।
ঘরেতে আইলা প্রভু আনন্দিত হইয়া॥
সাতদিন অবিচ্ছিন্ন ছিল তেজ রাশি।
তেজের ছটায় নাহি জানি দিবা নিশি।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১৮অঃ)

কবিরাজ গোস্বামী চন্দ্রশেখরের ভবনে নৃত্যের কথা বলিলেন না, "আচার্য্যের ঘরে"-র কথা বলিলেন। আচার্য্য বলিতে এক্ষেত্রে শ্রীবাস আচার্য্যের বাড়ীই বুঝায়।

তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণ্যাদি রূপ প্রভু যাতে আপনে কৈলা॥
কভু দুর্গা লক্ষ্মী হয় কভু বা চিচ্ছক্তি।
খাটে বসি ভক্তগণে দিলা প্রেমভক্তি॥

(চৈঃ চঃ, আদি—১৭পঃ)

বৃন্দাবনদাস স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, চন্দ্রশেখরের ভবনেই এইরূপ নৃত্য হইয়াছিল। কবিরাজ গোস্বামী ইহা জানিয়াও "আচার্য্যের ঘরে" লিখিলেন। নাটক কিন্তু চন্দ্রশেখরের ভবনেই হইয়াছিল।

নাটক অভিনয়ের পর অদ্বৈত আবার শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন। অদ্বৈতের প্রতি নিমাইয়ের গুরুবুদ্ধি দূর হয় না, মাথায় পা দিলে কি হইবে। ইহাই অদ্বৈতের আক্ষেপ। অদ্বৈত শান্তিপুর গিয়া আবার জ্ঞানপথে শাস্ত্র ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। ইহা নিমাইকে উত্তেজিত করিবার জন্য। হরিদাসকেও অদ্বৈত সঙ্গে নিলেন। ইহাও নিমাইকে পরীক্ষার জন্য। জ্ঞানপথ ছাড়িয়া ভক্তিপথে প্রচার করিতে হইবে—ইহাই প্রয়োজন ও সিদ্ধান্ত। ইহা জানিয়াও অদ্বৈত বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করিলেন। নিমাই বুঝিতে পারিয়া নিত্যানন্দকে লইয়া আবার শান্তিপুর আসিলেন।

মোহেরে আনিল নাঢ়া শয়ন ভাঙ্গিয়া
এখনে বাখানে জ্ঞান ভক্তি লুকাইয়া।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১৯ অঃ)

নিমাই অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—জ্ঞান বড়, কি ভক্তি বড়? অদ্বৈত বলিলেন—জ্ঞান বড়। আর যাবে কোথায়!

পিঁড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া॥

অদ্বৈতগৃহিণী চীৎকার করিয়া বলিলেন—

বুড়াবিপ্র বুড়াবিপ্র রাখ রাখ প্রাণ।
কাহার শিক্ষায় কর এত অপমান॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১৯ অঃ)

ভক্তি ছাড়িয়া জ্ঞানচর্চ্চায় অদ্বৈতের এই শাস্তি। অদ্বৈত ভক্ত কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত, অজ্ঞানী ভক্ত নহেন। কেননা ইচ্ছামাত্রই তিনি ভক্তি ছাড়িয়া জ্ঞানপথে ব্যাখ্যা করিতে পারেন। ইহা প্রণিধানযোগ্য। আবেশের ভাবের নিমাই চরিত্রের সহিত, এই ঘটনা কিছুমাত্র অসংলগ্ন বা অসঙ্গত হয় নাই। তারপর নিমাই বলিলেন—

আরে আরে কংস যে মারিল সেই মুঞি।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১৯ অঃ)

অদ্বৈত সুন্দর [illegible] দিলেন। বলিলেন—আমি দুর্ব্বাসাও নহি যে শাপ দিব, আর ভৃগুও নই যে তোমার বুকে লাথি মারিব। মোর নাম অদ্বৈত, তোমার 'শুদ্ধ দাস'। অদ্বৈত চরিত্র বিকাশের জন্য এ প্রহারের প্রয়োজন ছিল। অথচ ভক্তিপক্ষে শাস্ত্র ব্যাখ্যায় বাংলায় আচার্য্য অদ্বৈত, যেমন দাক্ষিণাত্যে ছিলেন রামানুজ। তারপরে—

অদ্বৈত কান্দয়ে দুই চরণ ধরিয়া।
প্রভু কান্দে অদ্বৈতেরে কোলেতে করিয়া॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—১৯ অঃ)

নিমাই অদ্বৈতকে লইয়া নবদ্বীপ ফিরিয়া আসিলেন এবং একদিন প্রকাশ্যে সকল বৈষ্ণবকে মন্ত্র শুনাইলেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা গিয়া জপ সভে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৩ অঃ)

দেখা যাইতেছে বৈষ্ণবের মন্ত্র অপ্রকাশ্য নয়। ইহা একটা পারিবারিক উপাসনা, গায়ত্রী জপ হইতে ইহার স্বাতন্ত্র্য দেদীপ্যমান। গায়ত্রী ব্যক্তিগত উপাসনা, শ্রীচৈতন্যের মন্ত্র পারিবারিক ও বৈষ্ণব-সঙ্ঘের উপাসনা।

ইহার পরেই চাঁদ কাজির বাড়ী আক্রমণ ও লুণ্ঠন। কিন্তু ইহা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গৌড়েশ্বর যবনরাজ নবদ্বীপের প্রতি কখনও উদাসীন ছিলেন না। আমরা জয়ানন্দে দেখিয়াছি, নিমাই যখন শচীগর্ভে তখন গৌড়েশ্বর ফতে শাঁহ্ নবদ্বীপ উৎসন্ন করিবার আদেশ দিয়াছিলেন এবং নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের জাতিপ্রাণ লইয়াছিলেন। যবনরাজ অত্যাচারে যখন "প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী" সেই সময় নিমাই ভুমিষ্ঠ হন। সে আজ ২৪ বৎসরের প্রাচীন ইতিহাস, অথচ খুব প্রাচীন নয়। মাত্র সেদিন যবন হরিদাসের উপর বৈষ্ণব হওয়ার দরুন বাইশ বাজারে চাবুক মারিয়া প্রাণ লইবার যে আদেশ হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। ইহা হুসেন শাহর রাজত্বকালের ঘটনা এবং এই ঘটনা হইতেই নিমাই অতি দ্রুত কৃষ্ণের অবতার হইয়া রাজ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

১৫০৯ খৃষ্টাব্দে হুসেন শাহর রাজত্বের পটভূমিকায় আমরা এই আন্দোলনের সূত্রপাত দেখিতে পাই। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে, "হুসেন সাহ সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে ; দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে"—(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—৪ পঃ)। তিনি যে গৌড়দেশে হিন্দুদের প্রতি উড়িয়ার দেশ অপেক্ষা অধিকতর সদয় ব্যবহার করিবেন, ইহা আশা করা যায় না। নবদ্বীপের এই পরম দুর্ব্বার যবন রাজভীতির মধ্যেই নিমাই পণ্ডিতের বৈষ্ণব আন্দোলন জন্মগ্রহণ করিল। চাঁদ কাজীর সহিত নিমাইয়ের সংঘর্ষ একটা অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক ঘটনা নয়। জয়ানন্দ আরম্ভ করিয়াছেন ও বৃন্দাবনদাস ক্রমে সেই যোগসূত্র সূক্ষ্মভাবে সম্প্রসারিত করিয়াছেন ; কার্য্য-কারণ সম্পর্কে তাহারই একটা অপরিহার্য্য ও স্বাভাবিক পরিণতিরূপে চাঁদ কাজির সহিত সংঘর্ষ দেখা দেয় এবং ইহা একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজন বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। রাজশক্তির সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম যে-আন্দোলনকে জন্ম দিয়াছে, পরবর্ত্তীয়দের

ভীরুতা ইহার জন্মদিনের গৌরবকে চেষ্টা করিলেও ম্লান করিতে পারিবে না। ইতিহাস মুছিয়া ফেলা যায় না। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে নিমাই পণ্ডিত অদ্বৈতের কথামত নির্বিঘ্নে আচণ্ডালে হরিনাম বিলাইতে পারেন নাই, গৌড়েশ্বর যবনরাজ এবং তাহার কর্ম্মচারিবৃন্দ ইহাতে বাধা দিয়াছিল। —সেই কথাই হইতেছে।

নিমাই পণ্ডিত জগাই মাধাই উদ্ধার করিয়া, পরম উল্লাসে নাটক অভিনয় করিয়া রুক্মিণীবেশে নৃত্য করিলেন। শচীমাতাকে, বিষ্ণুপ্রিয়াকে এবং সেই সঙ্গে সকল বৈষ্ণবদের পরিবারদিগকে নিয়া গিয়া নাটক ও নিজের নৃত্য দেখাইলেন। পরে শ্রীধরের বাড়ী গিয়া তাহার লৌহ পাত্রে জল পান করিলেন, শুক্লাম্বরের বাড়ী গিয়া লাউ থোর ভাতে সিদ্ধ দিয়া ভোজন করিলেন। কীর্ত্তনের সাফল্যে, আনন্দেই দিন কাটিতেছিল। কিন্তু পাষণ্ডীরা ষড়যন্ত্র করিয়া ব.জিকে সংবাদ দিল যে—নিমাই পণ্ডিত আমাদের হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করিল, তাহাকে ডাকিয়া সায়েস্তা কর। এদিকে নগরিয়াদের বাড়ীতে দুর্গোৎসবকালে বাজাইবার জন্য মৃদঙ্গ, মন্দিরা ও শঙ্খ—যাহা ঘরে ছিল সেই সব বাজাইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব্ব ঘরে।
দুর্গোৎসব কালে বাদ্য বাজাবার তরে॥
সেই সব বাদ্য এবে কীর্ত্তন সময়ে।
গায়েন বায়েন সবে সন্তোষ হৃদয়ে॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৩অঃ)

দুর্গোৎসবের বাদ্যভাণ্ডই নিমাই পণ্ডিতের কীর্ত্তনে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। নিমাইয়ের বৈষ্ণব আন্দোলনের পূর্ব্বে হিন্দু-বাংলায় জাকজমকের সহিত দুর্গোৎসব হইত, প্রমাণ পাওয়া গেল।

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, এই অবস্থার মধ্যে—

একদিন দৈবে কাজি সেই পথে যায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায়॥
হরিনাম কোলাহল চতুর্দ্দিকে মাত্র।
শুনিয়া সঙরে কাজি আপনার শাস্ত্র॥

কাজি বলে ধর ধর আজি করোঁ কার্য্য।
আজি বা কি করে তোর নিমাই আচার্য্য॥
আথে ব্যাথে পলাইল নগরীয়া-গণ।
মহাত্রাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন॥
যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে॥
কাজি বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
করিব ইহার শাস্তি লাগালি পাইয়া॥
ক্ষমা করি যাও আজি দৈবে হৈল রাতি।
আর দিন লাগালি পাইলে লইব জাতি॥
এই মত প্রতি দিন দুষ্টগণ লৈয়া।
নগর ভ্রময়ে কাজি কীর্ত্তন চাহিয়া॥
দুঃখে সব নগরীয়া থাকে লুকাইয়া।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৩ অঃ)

চাঁদ কাজির বাড়ী আক্রমনের কারণ অতিশয় সুস্পষ্ট।

বহুদিন হইতে নিমাইয়ের নেতৃত্ব ইহারি প্রতীক্ষা করিতেছিল। বৈষ্ণবেরা আসিয়া নিমাইকে বলিল—"নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব অন্যস্থানে"। নিমাই সম্পূর্ণ উল্টা কথা বলিলেন—

প্রভু বলেন নিত্যানন্দ হও সাবধান।
এই ক্ষনে চল সব বৈষ্ণবের স্থান॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন।
দেখি মোরে কোন কর্ম্ম করে কোন জন॥
দেখ আজি কাজির পোরাও ঘর দ্বার।
কোন কর্ম্ম করে দেখি রাজা বা তাহার॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৩অঃ)

নিমাই সম্পুর্ণ জ্ঞাতসারে কাজির আদেশ লঙ্ঘন করিবার জন্য স্থিরসংকল্প করিলেন। "সর্ব্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন"—কাজির নিষেধের ইহাই উত্তর, ইহাই নিমাইয়ের বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতৃত্ব। দেখা গেল বৈষ্ণবদের নবদ্বীপ ছাড়িয়া পালাইয়া যাইবার প্রস্তাব তিনি

আদৌ সমর্থন করিলেন না। এবং নেতা এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য এক মুহূর্ত্তও দেরি করিলেন না। তিনি নগরবাসীদের সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে—সকলেই ভোজন করিয়া বিকালে হাতে একটি করিয়া মশাল লইয়া আমার বাড়ীতে আসিবে। আজ শুধু কীর্ত্তন করিব না, কাজির ঘর ভাঙ্গিয়া এবং কাজির দুয়ারে গিয়া কীর্ত্তন করিব। তোমরা মনে সাহস রাখিবে এবং কিছুমাত্র ভয় করিবে না। কাজির নিষেধের ইহাই উত্তর। নিমাই বলিলেন—

চল চল ভাই সব নগরিয়া-গণ।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ কথন ॥
কৃষ্ণের রহস্য আজি দেখিবেক যে।
এক মহা দীপ লঞা আসিবেক সে ॥
ভাঙ্গিব কাজির ঘর কাজির দুয়ার।
কীর্ত্তন করিব দেখি কোন কর্ম্ম করে ॥
তিলার্দ্ধেক ভয় কেহ না করিহ মনে।
বিকালে আসিবে ঝাট করিয়া ভোজনে ॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৩ অঃ)

নগরিয়াগণ কিছু সকলেই বৈষ্ণব নহেন ; অথচ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে প্রথমে তিনি সকল বৈষ্ণবের স্থানে গেলেন, তারপর তিনি সকল নগরিয়াগণকে আহ্বান করিলেন। সুতরাং এই অভিযানটি দলগত হইল না—সমস্ত নবদ্বীপবাসীর মিলিত অভিযানরূপে প্রকাশ পাইল। ইহাই নিমাইয়ের নেতৃত্ব।

নবদ্বীপের প্রতি ঘরে ঘরে ধ্বনি রটিয়া গেল যে, নিমাই পণ্ডিত আজ নগরে নগরে নৃত্য করিবেন। নগরবাসীরা প্রত্যেকেই গৃহদ্বার পত্র-পুষ্প-মঙ্গলঘটে সজ্জিত করিলেন। মশাল হাতে বড় বড় ভাণ্ডে তৈল লইয়া "অনন্ত অর্ব্বুদ লক্ষ লোক নদীয়ার" নিমাইয়ের বাড়ীতে আসিয়া মিলিত হইল। সমস্ত নবদ্বীপ আলোকময় হইল—"হইল দেউটিময় নবদ্বীপপুর"। "সবে জ্যোতির্ম্ময় দেখে সকল আকাশ।"

কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে।
পূর্ণ ঘট শোভে নারিকেল আম্র সারে ॥

চোরের আছিল চিত্ত এই অবসরে।
আজি চুরি করিবাঙ প্রতি ঘরে ঘরে ॥
শেষে চোর পাসরিল ভাব আপনার।
হরি বহি মুখে কারো না আইসে আর ॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৩ অঃ)

অতিশয় বস্তুতান্ত্রিক বর্ণনা, অথচ কাব্যরসে ভরপুর। ঠিক হইল যে—"আগে নৃত্য করিবেন আচার্য্য গোসাই", তাহাকে ঘিরিয়া এক সম্প্রদায় গাইবেন। "মধ্যে নৃত্য করিয়া যাইবেন হরিদাস", তাঁকে ঘিরিয়াও এক সম্প্রদায় গাইবেন। "তবে নৃত্য করিবেন শ্রীবাস পণ্ডিত", তাঁকে ঘিরিয়াও এক সম্প্রদায় গাইবেন। "সকল পশ্চাতে প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর"—"নিত্যানন্দ গদাধর যায় দুই পাশে"।

বাহির হৈলা প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
উন্নত নাসিকা সিংহ-গ্রীব মনোহর ॥
সবা হইতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর ॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৩অঃ)

সংকীর্ত্তন এতদিন বসিয়াছিল—এইবার চলিতে আরম্ভ করিল। সকলেই গাইতে লাগিল—

তুয়া চরণে মন লাগু হুঁরে।
সারঙ্গ ধর তুয়া চরণে লাগু হুঁরে।

চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সংকীর্ত্তন—

গঙ্গা তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌর রায় ॥
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধায়ের ঘাটে গেলা গৌড়হরি ॥
বারকোনা ঘাটে নগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমলিয়া ॥
নদীয়ার একান্তে নগর সিমলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া ॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৩ অঃ)

সমস্ত নবদ্বীপবাসীর এই বিরাট উন্মাদনা দেখিয়া "মরয়ে পাষণ্ডী সব জ্বলিয়া পুড়িয়া"। তাহারা ভাবিল—"গোসাই করেন কাজি আইসে এখনি"। "কেহ বলে চল যাই কাজিরে কহিতে।" "কেহ বলে আইসে কাজি করিয়া এ বচন তোলাই"। "তবে একজন না রহিবে এই ঠাঞি।" এই পাষণ্ডীদের মতিগতি, চলাবলা—বৃন্দাবনদাস অতি নিপুনতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহা যেমন বস্তুতান্ত্রিক তেমনই খাঁটী ইতিহাস—অদ্যাপি নিশ্চিহ্ন হয় নাই।

তারপর—

কাজির বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।
বাদ্য কোলাহল কাজি শুনয়ে প্রচুর॥
কাজি বলে শুনি ভাই কি গীত বাদন।
কিবা কার বিভা কিবা ভুতের কীর্ত্তন॥
মোর বোল লঙ্ঘিয়া কে করে হিন্দুয়ানি।
ঝাট আন তত্ত্ব তবে চলিব আপনি॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৩ অঃ)

কাজির অনুচরেরা খবর লইয়া আসিল—

যে সকল নগরিয়া মারিল আমরা
আজি কাজি মার বলি আইসে তাহারা।

কাজি তবুও বিশ্বাস না করিয়া বলিল—

কাজি বলে হেন বুঝি নিমাই পণ্ডিত।
বিবাহ করিতে বা চলিল কোন ভিত॥
এবা নহে মোরে লঙ্ঘি হিন্দুয়ানি করে।
তবে জাতি নিমু আজি সবার নগরে॥

সংকীর্ত্তন চলিতে চলিতে কাজির বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত—

আসিয়া কাজির দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর॥
ক্রোধে বলে প্রভু আরে কাজি বেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেল মাথা॥

প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।
ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ প্রভু বলে বার বার॥
(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৩ অঃ)

তৎক্ষণাৎ—

কেহ ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙ্গয়ে দুয়ার।
কেহ লাথি মারে কেহ করয়ে হুঙ্কার॥
আম্র পানসের ডাল ভাঙ্গি কেহ ফেলে।
কেহ কদলির বন ভাঙ্গি হরি বলে॥
পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া।
উপারিয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া॥
*　　*　　*
যার দাড়ি আছে সেই হঞা অধোমুখ।
লাজে মাথা নাহি তোলে ডরে হালে বুক॥
*　　*　　*
একটি করিয়া পত্র সর্ব্ব লোকে নিতে।
কিছু না রহিল আর কাজির বাড়ীতে॥
ভাঙ্গিলেন যত সব বাহিরের ঘর।
(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৩ অঃ)

দেখা যাইতেছে বাড়ীতে যেমন হইয়া থাকে, পুরুষ ও মেয়েদের ভিন্ন ভিন্ন মহল্লা আছে। পুরুষদের বাহিরের ঘর সমস্তই ভাঙ্গা হইয়া গেল। এখন বাড়ীর ভিতরের ঘরগুলির কি হইবে? নিমাই পুনরায় আজ্ঞা দিলেন।

প্রভু বলে অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর।
পুড়িয়া মরুক সব গণের সহিতে।
সর্ব্ব বাড়ী বেড়ি অগ্নি দেহ চারি ভিতে॥
দেখি মোরে কি করে উহার নরপতি।
দেখি আজি কোন জনে করে অব্যাহতি॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
কীর্ত্তন বিরোধী পাপী করিমু সংহার॥

অগ্নি দেহ ঘরে সব না করিহ ভয়।
আজি সব যবনের করিমু প্রলয় ॥
(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৩ অঃ)

তারপর সম্ভবতঃ নিত্যানন্দ নিমাইকে বলিলেন—

করিলা ত কাজির অনেক অপমান।
আর যদি ঘটে তবে সংহারিহ প্রাণ ॥

প্রাকৃতের চিন্তা ইহারা একেবারে ভুলিয়া যান নাই। ইহার একটা প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই হইবে, তাঁহারা জানিতেন। চাঁদ কাজি গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের দৌহিত্র। হুসেন সাহের ১৮টি পুত্র ছিল। কন্যা কয়টি ছিল, ইতিহাসে নাই। চাঁদ কাজির মাতা যে একটি কন্যা, ইহা আমরা পাইতেছি।

নিমাই ক্ষান্ত হইয়া সিমুলিয়া হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। কাজির ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া অদ্বৈত-বাঞ্ছিত চক্রধারী কৃষ্ণ-অবতারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট লীলা দেখাইয়া বাঙ্গালীকে চমকিত করিলেন। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

অদ্যাপিও চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যার ভাগ্যে থাকে সে দেখয়ে নিরন্তরে ॥
(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৩ অঃ)

প্রাকৃতের এই লীলা এখন অপ্রাকৃতে হইতেছে—ইহাই বলার উদ্দেশ্য। চাঁদ কাজির বাড়ী লুণ্ঠনের কথা জয়ানন্দ মাত্র দুই ছত্রে লিখিয়াছেন—"সিম্বলিয়া গ্রামেতে কাজির ঘর ভাঙ্গি। সিম্বলিয়া গ্রাম ছাড়ি পলাইল যবন"—(উত্তর খণ্ড)। লোচন কিছুই লেখেন নাই। অথচ তাঁহারা উভয়েই প্রসিদ্ধ চরিতকার, উভয়ের সম্মুখে বৃন্দাবনদাসের বিস্তৃত বর্ণনা উপস্থিত ছিল। উভয়েই উহা পাঠ করিয়াছেন, অথচ কেহই এত বড় ঘটনাটি বর্ণনা না করিয়া, ইহা অপেক্ষা কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা কি লীলার এত বড় একটা স্মরণীয় ও বরণীয় ঘটনা—যাহা প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতে স্থান পাইয়াছে—তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই? কেহ বলিতে পারেন যে—তৎকালীন, অর্থাৎ গ্রন্থ লিখিবার সময়, দুর্ব্বার

যবনরাজভীতি প্রযুক্ত জয়ানন্দ ও লোচন চাঁদ কাজির বাড়ী আক্রমণ ও লুণ্ঠন গোপন করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাহাদের স্বেচ্ছাকৃত, অনবধানতা বশতঃ নহে। এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে সত্য, কিন্তু তথাপি এই বৃহৎ ঘটনাটির অনুল্লেখের কারণ ঠিকমত বুঝা গেল না। এই অনুল্লেখ জয়ানন্দের, বিশেষতঃ লোচনের, গ্রন্থের অঙ্গহানি করিয়াছে।

কবিরাজ গোস্বামী চাঁদ কাজির বাড়ী লুণ্ঠনের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা পাঠ করিয়াই দিয়াছেন। তথাপি দুই বর্ণনায় বিস্তর প্রভেদ আছে। কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনদাসকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করিয়া প্রথমটা লিখিয়াছেন। ঘটনাটি সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রভু নাগরিয়া লোকদের সংকীর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। লোকেরা তুমুল সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিল। কীর্ত্তন শুনিয়া সকল যবন ক্রুদ্ধ হইয়া কাজির কাছে গিয়া নিবেদন করিল। কাজি সন্ধ্যাকালে নবদ্বীপ আসিয়া খোলকর্ত্তাল ভাঙ্গিয়া দিল এবং আদেশ দিল যে—নগরে কেহই সংকীর্ত্তন করিতে পারিবে না।

কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে॥
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইনু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু॥

(চৈঃ চঃ, আদি—১৭ পঃ)

এখানে কবিরাজ গোস্বামী ঠিক ভাবেই বৃন্দাবনদাসকে অনুসরণ করিয়াছেন। তারপর প্রভুর কাছে ভক্তেরা কাজির এই নিষেধ আজ্ঞা জানাইল। প্রভু তৎক্ষণাৎ কাজির এই নিষেধ আজ্ঞা অমান্য করিবার আদেশ দিলেন। এবং নিজে দলবলসঙ্গ নগরে নগরে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

প্রভু আজ্ঞা দিল যাহ করহ কীর্ত্তন।
মুঞি সংহারিমু আজি সকল যবন॥
নগরে নগরে আমি করিমু কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সভে নগর মণ্ডন॥

সন্ধ্যাতে দেউটি সভে জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখ কোন কাজি আসি মোরে মানা করে॥
এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌড়রায়।
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায়॥
আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস।
মধ্যে নাচেন আচার্য্য পরম উল্লাস॥
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌড়চন্দ্র।
তার সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ॥
বৃন্দাবনদাস চৈতন্য মঙ্গলে।
বিস্তারি বলিয়াছেন চৈতন্য কৃপাবলে॥

(চৈঃ চঃ, আদি—১৭ পঃ)

অথচ বৃন্দাবনদাস তিন সম্প্রদায়ের নৃত্যের বর্ণনা ঠিক এরকম দেন নাই। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে—আগে নৃত্য করিবেন আচার্য্য গোসাই, হরিদাস নয়। এরকম ভুলের কি যে হেতু, তা বুঝা কঠিন। কবিরাজ গোস্বামী অপেক্ষা এক্ষেত্রে বৃন্দাবনদাসই অধিক নির্ভরযোগ্য।

কবিরাজ গোস্বামী ইহার প্রত্যেকটি কথাই যে বৃন্দাবনদাসকে অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিতেছেন।

তারপর—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রভু কাজিদ্বার গেলা।
তর্জ্জ গর্জ্জ করে লোক করে কোলাহল।
গৌড়চন্দ্র বলে লোক প্রশ্রয় পাগল॥
কীর্ত্তন ধ্বনিতে কাজি লুকাইল ঘরে।
তর্জ্জন গর্জ্জন শুনি না হয় বাহিরে॥
উদ্ধত লোক কাজির ভাঙ্গে ঘর পুষ্পবন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন॥

(চৈঃ চঃ, আদি—১৭ পঃ)

যদিও কবিরাজ গোস্বামী এখানে বৃন্দাবনদাসের দোহাই দিয়াছেন, তথাপি এখানে তিনি বৃন্দাবনদাসকে অনুসরণ করেন নাই। বৃন্দাবনদাসের নিকট এই ঘটনায় আমরা যে চরিত্রাঙ্কন পাই—কবিরাজ

গোস্বামীর নিকট তাহা পাই না, অন্য রকম পাই। দুইজনের চরিত্রাঙ্কনে আদৌ মিল নাই। কবিরাজ গোস্বামী বলেন যে—উদ্ধত লোকেরা কাজির ঘর ও পুষ্পবন ভাঙ্গিয়াছে এবং প্রভু বলেন যে—"এই সব লোকেরা প্রশ্রয় পাইয়া পাগল হইয়াছে"। কাজির ঘর ও পুষ্পবন ভাঙ্গা ইত্যাদি ব্যাপারে কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে আড়ালে রাখিয়াছেন। এই সব ঘর-ভাঙ্গা ব্যাপারে প্রভুর যে কোন কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহার উল্লেখ মাত্রও কবিরাজ গোস্বামী করিলেন না। কেবল উদ্ধত লোকের দোষ দিলেন। ইহা ত বৃন্দাবনদাসের কথার অনুরূপ নয়! বৃন্দাবনদাসে স্পষ্ট আছে যে, প্রভু নিজেই বলিতেছেন যে—কাজির ঘর ভাঙ্গ। শুধু একবার বলিতেছেন না, বার বার বলিতেছেন—তারপর বাড়ীর ভিতরে অগ্নি দিতে বলিতেছেন।

ঘর ভাঙ্গ, ভাঙ্গ প্রভু বলে বার বার।
প্রভু বলে অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর ॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৩ অঃ)

ইহাতে যে চৈতন্য-চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, কবিরাজ গোস্বামীর নিকট আমরা সেই চরিত্র-অঙ্কন পাই না। তারপর বৃন্দাবনদাস নিশ্চয়ই প্রভু নিত্যানন্দের মুখে শুনিয়া লিখিয়াছেন যে—কাজি পশ্চাতের দ্বার দিয়া প্রাণভয়ে পালাইয়া গেল। সুতরাং তাহার সহিত প্রভুর আর দেখাসাক্ষাৎ বা কথাবার্ত্তা হইল না। যদি হইত তবে নিত্যানন্দ প্রভু তাহা নিশ্চয়ই জানিতেন এবং ঐ কথা বৃন্দাবনদাসকে নিশ্চয়ই বলিতেন। সেক্ষেত্রে বৃন্দাবনদাস উহা উল্লেখ না করিয়া পারিতেন না। কিন্তু তিনি কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

অথচ কবিরাজ গোস্বামী কাজির সহিত প্রভুর শাস্ত্র-বিচার সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। কাজিকে প্রভু 'ভব্য লোক পাঠাইয়া' ডাকিয়া আনিলেন।

ভব্য লোক পাঠাইয়া কাজি বোলাইল।
দূর হতে এলা কাজি মাথা নোয়াইয়া।
কাজিরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া ॥

(চৈঃ চঃ, আদি—১৭ পঃ)

আর বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

ক্রোধে বলে প্রভু আরে কাজি বেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেল মাথা॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৩ অঃ)

এই দুই চিত্র এক নয় এবং এই দুই চিত্র এত বিরোধী যে, একই সঙ্গে সত্য হইতে পারে না। ইহার একটি সত্য হইলে আর একটি মিথ্যা হয়। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনাই সত্য বলিয়া মনে হয়। কবিরাজ গোস্বামী কোন প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট এই ঘটনা শুনেন নাই, শুনিবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই। যে পর্য্যন্ত কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনদাসকে অনুসরণ করিয়াছেন, সে পর্য্যন্ত কোন অসঙ্গতি নাই। কিন্তু যেখানেই তিনি বৃন্দাবনদাসকে ছাড়িয়া কিম্বদন্তি বা কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, সেইখানেই চরিতচিত্রে অসামঞ্জস্য আসিয়া দেখা দিয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন যে, কাজি আসিয়া প্রভুকে বলিলেন—

গ্রাম সম্বন্ধে হয় আমার চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হইতে গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥

(চৈঃ চঃ, আদি—১৭ পঃ)

তারপর কাজি বলিল যে—আমি যেদিন গিয়া তোমাদের খোল-কর্ত্তাল ভাঙ্গিয়া আসিয়াছিলাম, সেইদিন রাত্রে এক নরদেহ সিংহমুখ আমার বুকে লাফ দিয়া পড়িল এবং বলিল—"ফারিমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে"—(চৈঃ চঃ, আদি—১৭পঃ)।

কাজি নিজের বুক খুলিয়া সিংহের নখচিহ্ন পর্য্যন্ত দেখাইল। "এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয়ে"—"এতবলি কাজি নিজ বুক দেখাইল"। প্রভু বলিলেন—তোমার কাছে আমি এক ভিক্ষা চাই ; নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন নিষেধ করিওনা। কাজি স্বীকৃত হইল।

প্রভু কহে এক দান মাগি তোমায়।
সংকীর্ত্তন বাদ যৈছে নহে নদীয়ায়॥

কাজি বলে মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক দিব কীর্ত্তন না বাধিবে॥

(চৈঃ চঃ, আদি—১৭ পঃ)

কবিরাজ গোস্বামী কাজিকে দিয়া কীর্ত্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইলেন—বৃন্দাবনদাসে ইহা নাই। এই ঘটনার পরেই কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে দিয়া বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণীকে উচ্ছিষ্ট দিয়া সম্মান করিলেন—"উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর কৈল সম্মান"। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে, বৃন্দাবনদাস তাঁহার মাতা নারায়ণীকে শ্রীবাসের বাড়ীতে অভিষেকের সময় প্রভুকে দিয়া ভোজনাবশেষ দেওয়াইয়াছেন। উহা অন্ততঃ কয়েক মাস আগের ঘটনা হইবে। এখানেও কবিরাজ গোস্বামী অপেক্ষা বৃন্দাবনদাসের বর্ণনাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও বৃন্দাবনদাসের জন্ম মাত্র কয়েক মাস (১৫১০ খৃঃ—অক্টোবর কিংবা নভেম্বর) পিছাইয়া পড়ে। অবশ্য তাহাতে কোনই ক্ষতি হয় না। উচ্ছিষ্ট ভোজনের ১০ মাস পরেই বৃন্দাবনদাসের জন্ম অনুমান করা স্বাভাবিক। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন।

(চৈঃ চঃ, আদি—৮ পঃ)

বৃন্দাবনদাস নিজেই একাধিক স্থানে লিখিয়াছেন—

অদ্যাপিও বৈষ্ণব মণ্ডলে যার ধ্বনি
চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—৫ অঃ)

নিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাস গ্রহণের পর, ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে) বাংলা দেশ পরিত্যাগ করিয়া নীলাচল গমন করেন।

সপ্তম বক্তৃতা

[নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ বিচার। নিত্যানন্দকে সন্ন্যাসের সংকল্প জ্ঞাপনে নিত্যানন্দের উত্তর। গদাধরের আপত্তির হেতু কি? সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য কথন ও তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন চরিতগ্রন্থের মতবাদের আলোচনা। শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার আপত্তি। নিমাই অদ্বৈতকে সন্ন্যাসের সংকল্প জ্ঞাপন করিয়াছিলেন কি-না? কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম কেন হইল? সন্ন্যাসের পর শ্রীচৈতন্য প্রথম হরিদাসের বাড়ী গিয়াছিলেন কি-না? শান্তিপুর অদ্বৈতভবনে শচীমাতার সহিত সাক্ষাৎ ও নীলাচল বাসের উপযোগীতা সম্বন্ধে কথোপকথন।]

নিমাই পণ্ডিত এইবার সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। আমরা সেই ঘটনার সম্মুখীন হইতেছি।

গয়া হইতে ফিরিয়া এই এক বৎসরকাল যে ইতিহাস রচিত হইল, একে একে আমরা তাহা দেখিয়া আসিয়াছি।

গয়ায় দীক্ষা লওয়ার পরেই নিমাইয়ের ভাবাবেশ হয় এবং তিনি সঙ্গীদের নবদ্বীপ ফিরিয়া যাইতে বলিয়া বলিলেন—"মুঞ আর না যাইমু সংসার ভিতরে"। তবে তিনি কোথায় যাইবেন?—মথুরা যাইবেন। কেন?—"প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা।" এক বৎসর পরে কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেও ভাবাবেশে ঠিক এই একই কথা বলিবেন। সন্ন্যাসের বীজ এবং সন্ন্যাসের কারণ গয়াতেই নিমাইয়ের মনে অঙ্কুরোদ্গম করিয়াছিল।

নিমাইয়ের মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় বিষ্ণুর নৈবেদ্য লইয়া শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত স্বচ্ছন্দে পরিহাস করেন। আবার আবেশের অবস্থায় কখন নিজেকে 'মুঞি সেই' অর্থাৎ আমিই-কৃষ্ণ বলেন; আবার কখনো বা নিজেকে বিরহিনী রাধিকা বলিয়া আবিষ্ট হন, খেদোক্তি করেন। "ক্ষণে কৃষ্ণ, ক্ষণে রাধা"—নরহরির এই বর্ণনা ঠিক বলিয়াই মনে হয়।

চাঁদ কাজির বাড়ী আক্রমণ সম্ভবতঃ ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের

কাছাকাছি হইবে। এখন ১৫১০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পুনরায় নিমাইয়ের মনে আবেশের ভাব দেখা দিল। আবেশের সময় তিনি নিজেকে সর্ব্বদাই অবতাররূপে ভাবিতেন। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—"মৎস্য, কূর্ম্ম, নরসিংহ, বরাহ, বামন। রঘু, সিংহ, বৌদ্ধ, কল্কি, শ্রীনন্দনন্দন। এইমত যত অবতার সকল। সব রূপ হয় প্রভু করি ভাব ছল"—(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৫অঃ)। তারপর—"মহামত্ত হৈল প্রভু হলধর ভাবে। মদ আন, মদ আন ডাকে উচ্চৈস্বরে।" নিত্যানন্দ ঘট ভরিয়া গঙ্গাজল দিলেন, নিমাই পান করিয়া—"হেন সে হুঙ্কার করে হেন সে গর্জ্জন। নবদ্বীপ আদি করি কাঁপে ত্রিভুবন।" এইরূপে তিনি আবেশে "প্রচণ্ড তাণ্ডব" করিতে লাগিলেন।

তারপর আবেশে বিরহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহা কৃষ্ণের জন্য গোপীদের বিরহ—"পূর্ব্বে যেন গোপীসব কৃষ্ণের বিরহে"। প্রাকৃতে লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর হইতেই এই বিরহ নিমাইয়ের মনে মগ্ন-চৈতন্যের রাজ্যে শিকড় গাড়িয়া রহিয়াছে। অপ্রাকৃতে তাহাই কৃষ্ণ-বিরহে ভাবাবেশে অঙ্কুরোদ্গম করিতেছে। ভাবাবেশে নিমাইয়ের এই বিহ্বলতা দেখিয়া "রোদন করেন গৃহে শচী জগন্মাতা"। আর বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা ত সহজেই অনুমান করা যায়।

একদিন গোপী ভাবে জগৎ ঈশ্বর
বৃন্দাবন গোপী গোপী বলে নিরন্তর।

দৈবে তখন এক পঢ়ুয়া আসিয়া ইহা শুনিয়া বলিল—

গোপী গোপী কেন বল নিমাঞি পণ্ডিত
গোপী গোপী ছাড়ি কৃষ্ণ বলহ ত্বরিৎ।

প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর দিলেন—যে কৃষ্ণ দস্যু, তাকে কোন্ জন ভজে?—বালীকে বিনা দোষে বধ করিয়াছে, সূর্পনখার নাক কাটিয়াছে, বলিকে পাতালে পাঠাইয়াছে ইত্যাদি; কি হইবে আমার তাঁহার নাম লৈলে?

এত বলি মহাপ্রভু স্তম্ভ হাতে লইয়া।
পড়ুয়া মারিতে যায় ভাবাবিষ্ট হইয়া॥

আথে ব্যাথে পড়ুয়া উঠিয়া দিল নড়।
পাছে ধায় মহাপ্রভু বলে ধর ধর॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৫ অঃ)

পড়ুয়া মহাত্রাসে প্রাণ লইয়া পালাইয়া গেল। ভক্তগণ দৌড়াইয়া গিয়া প্রভুকে ধরিয়া আনিয়া স্থির করিলেন। আবেশের ভাবে বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

পড়ুয়াটি অপর সকল পড়ুয়াগণকে গিয়া এই সংবাদ সবিস্তারে বর্ণনা করিল—"তাহার সর্ব্ব অঙ্গে ঘর্ম্ম, শ্বাস বহে ঘনে ঘন"। অপর পড়ুয়াসকল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—

কেহ বলে এত বা সম্ভ্রম কেন করি।
আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরি॥
তিঁহ সে ব্রাহ্মণ আমরা কি বিপ্র নহি।
তিঁহ মারিবেন আমরা কেনেই বা সহি॥
রাজা তো নহেন তিনি মারিবেন কেনে।
আমরাও তাহারে মারিব সর্ব্বজনে॥
যদি তেঁহ মারিতে ধায়েন পুনর্ব্বার।
আমরা সকলে তবে না সহিব আর॥
তিঁহো নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রপুত্র।
আমরাও নহি অল্প মানুষের সুত॥
হের সবে পড়িলাম কালি তাঁর সনে।
আজি তিঁহো গোসাঞি বা হইল কেমনে॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৫ অঃ)

এই সব পড়ুয়ারা ভক্ত নয়, নিমাইয়ের অবতারে তাহারা বিশ্বাস করে না। ভক্ত না হইলে অবতারে বিশ্বাস হয় না। বিশেষতঃ ইহারা নিমাইয়ের সমবয়স্ক—"পড়িলাম কালি তার সনে"—সমপাঠী।

"পাপী" পড়ুয়াগণের এই সকল যুক্তি "জানিলেন অন্তর্য্যামী শ্রীশচীনন্দন"। ইহা জানিয়া নিমাই নিত্যানন্দের হস্ত ধরিয়া নিভৃতে গিয়া বসিলেন এবং বলিলেন—

ভাল লোক তারিতে করিনু অবতার।
আপনে করিনু সব জীবের সংহার॥
দেখ কালি শিখা সূত্র সব মুড়াইয়া।
ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া॥
যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে॥
তবে মোরে দেখি সেই ধরিব চরণ।
এই মতে উদ্ধারিব সকল ভুবন॥
সন্ন্যাসীরে সর্ব্বলোক করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহ আর না করে প্রহার॥
সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি ঘরে ঘরে।
ভিক্ষা করি বুলো দেখি কে আমারে মারে॥
তোমারে কহিনু এই আপন হৃদয়।
গারিহস্থ সব মুঞি ছাড়িব নিশ্চয়॥
ইথে কিছু দুঃখ তুমি না ভাবিহ মনে।
বিধি দেহ তুমি মোরে সন্ন্যাস কারণে॥
যেরূপ করাহ তুমি সেই হইব আমি।
এতেক বিধান দেহ অবতার জানি॥
জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৫ অঃ)

সন্ন্যাসের কারণ বৃন্দাবনদাস সবিস্তারে লিখিয়াছেন। আর ইহা তিনি শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর মুখে শুনিয়াই লিখিয়াছেন। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। আমরা ইহার সহিত আরো কারণ অনুমান করিতে পারি। কারণগুলি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ১ম—দূরবর্ত্তী কারণ, ২য়—নিকটবর্ত্তী কারণ। সাত বৎসর পূর্ব্বে লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর নিমাই শচীমাতাকে বলিয়াছিলেন—"এই মত কাল গতি, কেহ কার নহে। অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে"—(চৈঃ ভাঃ, আদি—১২ অঃ)। প্রশ্ন হইবে—তবে পুনরায় বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ

করিলেন কেন? জয়ানন্দ বিষ্ণুপ্রিয়াকে দিয়াই ইহার উত্তর দিয়াছেন—"মায়ের অনুরোধে, বাপের সত্য পালিবারে—আমা বিভা কৈলে লোক ভণ্ডিবার তরে"—(চৈঃ মঃ—সন্ন্যাস খণ্ড)। জয়ানন্দের নিমাই, সন্ন্যাসের পূর্ব্বে বিষ্ণুপ্রিয়াকে সেই একই কথা বলিতেছেন—"শুন সতী বিষ্ণুপ্রিয়া, সব মিথ্যা কেহ কারো নহে"। সংসার মিথ্যা, এই জ্ঞান নিমাইয়ের মনে ৭ বৎসর যাবৎ স্থায়ী হইয়াছে। বিশেষতঃ সন্ন্যাসের বীজাণু এই প্রতিভাসম্পন্ন বংশে দেখা যাইতেছে। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে ইহা প্রত্যক্ষ। চৌদ্দ মাস পূর্ব্বে গয়াতে দীক্ষা লওয়ার পরেই নিমাই সঙ্গীদের বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বলিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি আর সংসারে যাইব না—"মুঞি আর না যাইমু সংসার ভিতরে"। তবে কোথায় যাইবেন?—মথুরায়। কেন?—"প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা।" এইখানেই প্রথম কৃষ্ণ-বিরহ সন্ন্যাসের কারণরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহা সব দূরবর্ত্তী কারণ, অথচ উপেক্ষণীয় নয়।

পঢ়ুয়াগণের সহিত কলহ, একটা আকস্মিক ঘটনা—নিকটবর্ত্তী কারণ। এই নিকটবর্ত্তী কারণের মধ্যে "জগৎ উদ্ধার" আছে। কেননা বৎসরেক কাল তিনি লোক তারিতে অবতার করিয়াছেন। অবতারের কার্য্য জীব উদ্ধার, সন্ন্যাস এই জীব উদ্ধারের সহায়ক। নিত্যানন্দকে প্রভু স্পষ্টই বলিলেন—"এতেক বিধান দেহ অবতার জানি"। লক্ষ্য করিবার বিষয়—নিমাই আগে অবতার হইয়াছেন, পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্বরূপ অবতার নহেন। নিমাই অবতার। দুই ভ্রাতার সন্ন্যাসে পার্থক্য আছে। বিশ্বরূপের সন্ন্যাস নিজের মোক্ষলাভ। নিমাইয়ের সন্ন্যাস জীব উদ্ধার। বৃন্দাবনদাস, বিশেষতঃ লোচন "প্রাণনাথ কৃষ্ণচন্দ্রকে" পাওয়াও সন্ন্যাসের অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী এই পথই অনুসরণ করিয়াছেন।

কবিরাজ গোস্বামী পঢ়ুয়াদের সহিত কলহের ঠিক পরেই কেশব ভারতীকে নবদ্বীপ আনিয়াছেন। লোচনও তাই করিয়াছেন। সুতরাং মনের এইরূপ বিচলিত অবস্থায় কেশব ভারতীকে দেখিয়া নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা জন্মিতে পারে। লোচন ও কবিরাজ গোস্বামী উভয়েই লিখিয়াছেন যে, নিমাই নবদ্বীপেই কেশব ভারতীকে বলিয়া-

ছিলেন—"কৃপা করি কর মোর সংসার মোচন"—(চৈঃ চঃ, আদি—১৭ পঃ)। "তোমার মত বেশ আমি কবে সে ধরিব"—(চৈঃ চঃ—মধ্য খণ্ড)। ইহাও একটি নিকটবর্ত্তী কারণ। অনেক দূরের ও নিকটের কারণ একত্র হইয়া একটি ঘটনা ঘটে।

নিমাই আবেশে মগ্ন অবস্থায় পঢ়ুয়াকে মারিতে গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পরে সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া ইহার জন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন বিস্তর—"ভাল লোক তারিতে করিনু অবতার"। এই অনুতাপের অবস্থায় কেশব ভারতীকে দেখিয়া তাঁহার সন্ন্যাসে অভিলাষ জন্মে। এই সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য দুইটি। ১ম—জীব উদ্ধার, ২য়—কৃষ্ণ-বিরহ।

নিমাই ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসের সঙ্কল্প করিতেছেন। মনে পড়ে, ৬ বৎসর বয়সে বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের পরে তিনি পিতামাতাকে বলিয়াছিলেন—"আমি ত করিব তোমা দুঁহার সেবন"—(চৈঃ চঃ, আদি—১৫ পঃ)। মনে পড়ে, ১৬ বৎসর বয়সে লক্ষ্মীকে "বিবাহ করিতে হৈল মন"। তখন বলিয়াছিলেন, "গৃহস্থ হইলাম এবে চাহি গৃহধর্ম্ম"—(চৈঃ চঃ, আদি—১৫ পঃ)। আর এখন ২৪ বৎসর বয়সে বলিলেন—"শুন নিত্যানন্দ মহাশয়, গারিহস্থ বাস আমি ছাড়িব নিশ্চয়"। মুকুন্দকে গিয়া বলিলেন, "গারিহস্থ আমি ছাড়িবাঙ সুনিশ্চিত"—(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৫ অঃ)। /বেচারী শচীমাতা ও বেচারী বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইয়ের জীবন-স্রোতের এই দুর্দ্দমনীয় গতিবেগ, ইহারা কেহই রোধ করিতে পারিলেন না। নবদ্বীপের তটপ্রান্তে কলকলনাদী গঙ্গার মত জীবন একটা স্রোত—দুর্ব্বার ইহার গতিবেগ—কোন পথে যে প্রবাহিত হইয়া কোথায় ইহার কি পরিণতি হয়, তা আগে হইতে কেহই বলিতে পারে না—যার জীবন সেও পারে না।/

নিত্যানন্দ বলিলেন—তুমি "স্বতন্ত্র", অর্থাৎ স্বাধীন। "তুমি যে করিব সে-ই হইব নিশ্চিত।" "যেরূপে করিবে তুমি জগৎ উদ্ধার। তুমি সে জানহ তাহা, কে জানয়ে আর।" জগৎ উদ্ধারের উপায় তোমার অবিদিত নয়। "ভাল হয় যেমতে, সে বিদিত তোমাত।" উপায় তুমিই ভালমত জান।

তথাপিহ কহ সর্ব্ব সেবকের স্থানে
কেবা কি বলয়ে তাহা শুনহ আপনে।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৫ অঃ)

আধুনিক গণতন্ত্র যুগে যেকোন সভ্য দেশ ইহা অপেক্ষা বড় কথা, সঙ্গত কথা নির্ব্বাচিত নেতাকে বলিতে পারে নাই। "এই মত নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করি ; চলিলেন বৈষ্ণব সমাজে গৌরহরি।" নবদ্বীপে বৈষ্ণব সমাজ এখন সংঘবদ্ধ, পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত।—ভবিষ্যৎ বিপ্লবের পথে বাহির হইবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতেছে, এমন সময় নিমাইয়ের সন্ন্যাস সেই ঘোর অন্ধকারময় বিপ্লবের পথে অকস্মাৎ বজ্রের নির্ঘোষ ও বিদ্যুৎ বিস্ফুরণ বলিয়া অনুভূত হইল।

নিত্যানন্দের কথামত নিমাই প্রথমেই মুকুন্দের বাড়ী গেলেন। গিয়া বলিলেন—মুকুন্দ! "গারিহস্থ আমি ছাড়িবাঙ সুনিশ্চিত ; , শিখা সূত্র ছাড়িয়া চলিব যে সে ভীত।" "শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনিয়া মুকুন্দ" যার পর নাই, কাকুতি করিয়া বলিল—যদি নিতান্তই এইরূপ করিবে, তবে "দিন কত এইরূপে করহ কীর্ত্তন"।

তারপর গদাধরের বাড়ী গিয়া বলিলেন—"না রহিব গদাধর আমি গৃহবাসে। যে-সে দিকে চলিবাঙ কৃষ্ণের উদ্দেশে॥ শিখা সূত্র আমি সর্ব্বথায় না রাখিব। মাথা মুড়াইয়া যে-সে দেশেরে চলিব॥" "শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনি গদাধর। বজ্রপাত হৈল যেন শিরের উপর॥" গদাধর পণ্ডিত ব্যক্তি। নিমাইয়ের কথার প্রতিবাদ করিলেন, বলিলেন—এ অশাস্ত্রীয় কাজ, বেদ বিরোধী ; হইতেই পারে না। "তোমার যে মত, এ বেদের মত নহে।" (গদাধরের মতে গৃহস্থ অবশ্যই বৈষ্ণব হইতে পারে। বৈষ্ণব হইতে গেলেই সন্ন্যাসী হইতে হইবে—এ কি কথা! গদাধর স্পষ্টই বলিলেন—"গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই"? গদাধরের অভিমত যে—অবশ্যই আছে। নহিলে আচার্য্য অদ্বৈত—যাঁহাকে নিমাই বলিয়াছেন "বৈষ্ণবের রাজা"—শ্রীবাসাদি দাঁড়ান কোথায়? তারপরে গদাধর বলিলেন, "প্রথমেই জননী বধের ভাগী হবে"। শেষ পর্য্যন্ত বলিলেন—"তথাপিও মাথা মুড়াইলে স্বাস্থ্য পাও ; যে তোমার ইচ্ছা তাই করে চলে যাও।" ইহা অভিমানের কথা।

আরো আপ্ত বৈষ্ণবের স্থানে স্থানে নিমাই তাঁহার সন্ন্যাসের সংকল্পের কথা বলিলেন। "সবেই শুনিয়া শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান—মূর্চ্ছিত পড়িলা, কারু দেহে নাহি জ্ঞান।" আপ্ত বৈষ্ণবেরা সকলেই মূর্চ্ছিত হইলেন।

নিত্যানন্দ ও গদাধরের প্রতিক্রিয়া একই ধরণের নয়, সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। গদাধর বলিলেন—তুমি "জননী বধের ভাগী হবে"। নিত্যানন্দও "মনে মনে গণে" "প্রভু গেলে আই প্রাণ ধরিবে কেমনে"। বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা কেহই উল্লেখ করিলেন না। নিত্যানন্দ বলিলেন—বিধি বা নিষেধ আমি কিছুই দিতে পারি না। তুমি জীব উদ্ধার করিবে, অবতারের ইহাই কারণ তাহা আমি জানি। অতএব সর্ব্ব সেবকের স্থানে জিজ্ঞাসা করিয়া যা করিলে জীব উদ্ধার হয়, তাই কর। গদাধরের কথা অন্যরূপ। গদাধর বলিলেন—তুমি প্রাণনাথ কৃষ্ণ পাইবে, ভাল কথা। কিন্তু শিখা-সূত্র না ঘুচাইলে, আর মাথা না মুড়াইলে কি কৃষ্ণ পাওয়া যাইবে না! এ কি কথা! "তোমার যে মত এ বেদের মত নয়।" গদাধরের মতে ইহা বেদ-বিরোধী কার্য্য। দুই মাস পরে নীলাচলে বাসুদেব সার্ব্বভৌম, ঠিক গদাধরের অনুরূপ কথাই বলিবেন। উভয়েই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি। সার্ব্বভৌম বলিবেন—"যদি কৃষ্ণ ভক্তি যোগে করিবে উদ্ধার; তবে শিখা-সূত্র ত্যাগে কোন লভ্য আর।" তোমার যে ভক্তির উদয় হইয়াছে তাতেই বুঝা যায় যে, তোমার উপরে কৃষ্ণের কৃপা হইয়াছে। অতএব—"পরম সুবুদ্ধি তুমি হইয়া আপনে। তবে তুমি সন্ন্যাস করিলা কি কারণে"—(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—৩ অঃ)। বিনা প্রতিবাদে নিমাইয়ের সন্ন্যাস তখনকার দিনেও গৃহীত হয় নাই। নিমাই নিত্যানন্দকে স্পষ্ট বলিলেন—"জগৎ উদ্ধার যদি চাহ করিবারে", তবে আমার সন্ন্যাসে বাধা দিও না। "লোক শিক্ষা নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস।" কেবল শাস্ত্র পড়িয়া জীব উদ্ধার হয় না, অথবা কৃষ্ণ পাওয়া যায় না। ইতিহাসে কোন অবতার পুরুষই তাহা করেন নাই বা পারেন নাই। নিমাই পণ্ডিত ব্যক্তি, তার অর্থ শাস্ত্রজ্ঞ। অপর কোন অবতার এতটা শাস্ত্রজ্ঞ দেখা যায় না। কিন্তু তিনি তদতিরিক্ত আরো কিছু। বাংলার ইতিহাসের বক্ষে তিনি কস্তুভ মণি, তিনি ইতিহাসের নিয়ামক অবতার পুরুষ।

বৃন্দাবনদাস কড়চা লেখক গোবিন্দের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—"গোবিন্দ পশ্চাতে আগে কেশব ভারতী"। বৃন্দাবনদাস গোবিন্দের উপস্থিতি স্বীকার করিয়াছেন। ইহা তিনি শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট হইতেই শুনিয়া লিখিয়াছেন। জয়ানন্দও গোবিন্দ কর্ম্মকারের উপস্থিতি লিখিয়া গিয়াছেন।

গঙ্গা পার হৈ-আ আগে রৈলা নিত্যানন্দ ॥
মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্ম্মকার।
মোর সঙ্গে আইস কাটোয়া গঙ্গাপার ॥

(চৈঃ মঃ—বৈরাগ্য খণ্ড)

কড়চা লেখক গোবিন্দ নিজেকে কর্ম্মকার বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যদি 'বৃন্দাবনদাস' ও 'জয়ানন্দ' বর্ণিত 'গোবিন্দ' না হন, তবে বুঝিতে হইবে যে—এই নকল গোবিন্দ, জয়ানন্দের গ্রন্থ পড়িয়া নিজের জাতি ঠিক করিয়াছেন। কিন্তু কড়চার গোবিন্দ যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তাহার যথেষ্ট প্রমান আছে। আর গোবিন্দের কড়চা যে আদ্যোপান্ত জাল নয়, তাহারও আভ্যন্তরিক প্রমান যথেষ্টই আছে।

এই প্রসঙ্গে কড়চায় যাহা আছে, তাহা অবিকল বৃন্দাবনদাসকে অনুকরণ করিয়া লেখা হইয়াছে। কড়চায় আছে—

অবধৌতে ডাকি প্রভু বলিলা বচন
সন্ন্যাস করিব মুহি, না কর বারণ।

তারপর—

মুকুন্দের কাছে প্রভু গেলেন চলিয়া।

বলিলেন—

শিখা সূত্র ত্যাগ করি সন্ন্যাস লইব।
তাহা না করিলে কিসে জীব উদ্ধারিব ॥

পরে আবার—

গদাধরের নিকটে
ধাইয়া গিয়া সব কথা কন অকপটে। (গোঃ কড়চা)

প্রথমে নিত্যানন্দ, পরে মুকুন্দ, পরে গদাধর—কড়চা হুবহু বৃন্দাবনদাসের অনুগামী! বৃন্দাবনদাসের "নিষেধ নাহি করিবে আমারে"

—কড়চায় "না কর বারণ"। 'শিখাসূত্র ত্যাগ', 'জীব উদ্ধার'—এসকল আক্ষরিক মিল।

লোচন বা জয়ানন্দে এরকম আক্ষরিক মিল পাওয়া যায় না।

বৃন্দবনদাসে আছে—"বজ্রপাত হৈল যেন শিরের উপর"। ইহার সরল অনুবাদ হইতেছে, কড়চার "আকশ ভাঙ্গিয়া তার মাথায় পড়িল"। বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন যে, শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে সন্ন্যাসের কথা নিমাই পণ্ডিত মাত্র পাঁচ জন অন্তরঙ্গকে বলিবার অনুমতি দিলেন—সর্ব্বসাধারণকে বলিতে নিষেধ করিলেন।

এ কথা ভাঙ্গিবে সবে পঞ্চজন ঠাঞি॥
আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, অপর মুকুন্দ॥

কড়চায় ইহার অবিকল প্রতিধ্বনি শুনা যায়। যথা—

সন্ন্যাস লইব কথা রাইখ সঙ্গোপন।
মুকুন্দ ও গদাধরে বোলো এবচন॥
জননীর কাছে কথা ইঙ্গিতে বলিবে।
ভক্ত মণ্ডলির মাঝে নাহি প্রচারিবে॥

লোচন বা জয়ানন্দে এই রকম ধ্বনি বা প্রতিধ্বনি নাই।

কড়চার গোড়ার দিকটায় যে কিছুটা ভেজাল আছে, একথা এখন প্রায় স্বীকৃত। জয়গোপাল গোস্বামী কড়চার গোড়ার দিকটার নষ্টাংশ উদ্ধার করিতে যাইয়া বৃন্দাবনদাসকে অনুকরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কেননা, কবিরাজ গোস্বামী মাত্র অর্দ্ধছত্রে সন্ন্যাস প্রসঙ্গ শেষ করিয়াছেন—"প্রভু করিল সন্ন্যাস"। সুতরাং কবিরাজ গোস্বামীকে অনুকরণ করা চলে না। যে বস্তু নাই তাকে অনুকরণ করিবে কিরূপে? অনন্যোপায় হইয়াই বৃন্দাবনদাসের শরণ নিতে হইয়াছে—নির্ব্বোধের কাজ করা হয় নাই। কড়চার বর্ণিত ঘটনা সত্য—যেহেতু বৃন্দাবন-দাসের বর্ণনাকে আমরা সত্য ইতিহাস বলিয়াই মানিয়া লইয়াছি। অনুকরণ মাত্রই মিথ্যা ইতিহাস নয়।

কড়চায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য "জীব উদ্ধার"। "সন্ন্যাস করিয়া জীব উদ্ধারিব আমি।" "শিখাসূত্র ত্যাগ করি সন্ন্যাস

লইব, তাহা না করিলে কিসে জীব উদ্ধারিব" (কড়চা—পৃঃ ৬-৭)। কৃষ্ণের বিরহে বিক্ষিপ্ত হইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি—একথা কড়চায় নাই।

বৃন্দাবনদাসের গদাধর সন্ন্যাসের যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, জয়ানন্দে আমরা সেই প্রতিবাদের জবাব পাই। জয়ানন্দ বৃন্দাবন-দাসের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই ইহা লিখিয়াছেন। গদাধরের প্রতিবাদ জয়ানন্দের অজ্ঞাত ছিল না। কেননা, জয়ানন্দ গদাধরের আদেশেই গ্রন্থ লিখিয়াছেন—"চিন্তিঞা চৈতন্য গদাধর পদদ্বন্দ"। জয়ানন্দ সন্ন্যাসের কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। প্রভু ইহা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলিতেছেন—

আমি যদি বৈরাগ্য না করিব সংসারে।
বেদ নিন্দা কলিযুগে ধর্ম্ম না প্রচারে॥
কুলধর্ম্ম যুগধর্ম্ম আমি না পালিব।
কেমতে সংসারে লোক ধর্ম্ম প্রচারিব॥
প্রভুর সন্ন্যাস কুলধর্ম্মের রাজত্ব।
তাহা না করিলে লোক না গাএ মহত্ত্ব॥
কুলধর্ম্ম না পালিলে বেদ নিন্দা হয়।
সে কারণে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস মনে লয়॥
ঈশ্বরের জন্ম কর্ম্ম লোক শিক্ষা হেতু।

(চৈঃ মঃ—বৈরাগ্য খণ্ড)

বৃন্দাবনদাসের গদাধর নিমাইকে বলিলেন যে—তোমার সন্ন্যাস হইতে পারে না। কেননা, ইহা অশাস্ত্রীয়—"তোমার যে মত সে বেদের মত নহে"। জয়ানন্দ প্রভুকে দিয়াই ইহার উত্তর দিলেন। প্রভু বলিলেন যে, সন্ন্যাস না নিলেই বেদের নিন্দনীয় কার্য্য করা হয়—"কুলধর্ম্ম না পালিলে বেদ নিন্দা হয়"। কুলধর্ম্ম কি ? যুগ ধর্ম্মই বা কি ? রাম ও কৃষ্ণ অবতারে যুগধর্ম্মের প্রয়োজন অন্যরূপ ছিল। ঐ দুই অবতারের কুলধর্ম্ম সন্ন্যাস ছিল না। কিন্তু এই কলি যুগ, ত্রেতা ও দ্বাপর হইতে ভিন্ন। এই কলিযুগের প্রয়োজন ভিন্ন। এই কলি যুগে যুগাবতারের কুলধর্ম্ম সন্ন্যাস। আর আমি এই যুগের যুগাবতার। অতএব আমি সন্ন্যাস নিয়া "কুলধর্ম্ম না পালিলে বেদ নিন্দা হয়"। জয়ানন্দ আরো বলিলেন যে—সন্ন্যাস "লোক শিক্ষা হেতু", "ধর্ম্ম প্রচার" হেতু। সন্ন্যাস না

নিলে "লোকে না গাএ মহত্ত্ব"। বহু লোকে যদি মহত্ত্ব না গায়, বহু লোক যদি আকৃষ্ট না হয়, তবে সেই সকল লোকের উদ্ধার হয় না। মহত্ত্ব গাওয়ার সহিত জীব উদ্ধার জড়িত। জয়ানন্দ জীব উদ্ধারের কথাই বলিলেন, কৃষ্ণ বিরহে বিক্ষিপ্ত হইয়া সন্ন্যাস লওয়ার কথা বলিলেন না।

জয়ানন্দ প্রভুকে দিয়া অদ্বৈত ও শ্রীবাসের নিকটেও সন্ন্যাসের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করাইলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, বৃন্দাবনদাস ইহা করান নাই। শ্রীবাস বলিলেন—তুমি নিজ মুখে বলিয়াছ যে সংকীর্ত্তনের চেয়ে ধর্ম্ম আর নাই, আবার এখন সেই সংকীর্ত্তন ছাড়িয়া বৈরাগ্য কর কেন? "আপনে শ্রীমুখে তুমি কহিলে সভারে। সংকীর্ত্তন বিনে ধর্ম্ম নাহিক সংসারে। হেন সংকীর্ত্তন ছাড়ি করহ বৈরাগ্য"—(চৈঃ মঃ —বৈরাগ্য খণ্ড)। অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ প্রভুকে বলিলেন—"ঈশ্বরে বৈরাগ্য কেন করে?" ইহা সহজ প্রশ্ন নয়। সম্ভবতঃ আচার্য্য অদ্বৈত এই প্রশ্ন করিয়া থাকিবেন। কেননা তিনিই সর্ব্বপ্রথম নিমাইকে জলতুলসী চরণে দিয়া ঈশ্বর করিয়াছেন। ঈশ্বর হওয়ার পরে ত আর কিছু হওয়া চলে না। তাহা হইলে ঈশ্বরকে খাটো করা হয়। নিমাই এক বৎসরকাল (১৫০৯ খৃঃ) ঈশ্বর হইয়া নবদ্বীপলীলা করিয়াছেন। তখন তাঁহার সন্ন্যাসের প্রয়োজন হয় নাই। এখন হঠাৎ সন্ন্যাসের কী প্রয়োজন হইল! লক্ষ্য করিবার বিষয়, সন্ন্যাসের পরে অবতার নয়— অবতারের পরে সন্ন্যাস।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভুকে মনুষ্য-বুদ্ধিতে সন্ন্যাসের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। জয়ানন্দের অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ প্রভুকে সম্পূর্ণ ঈশ্বর-বুদ্ধিতে সন্ন্যাসের প্রতিবাদ করিতেছেন। "ঈশ্বরে বৈরাগ্য কেন করে?"

প্রভু এসকলের উত্তরে বলিলেন—ইহা না করিয়া উপায় নাই। কেননা ইহা আমার স্বধর্ম্ম। "গৌরাঙ্গ বলেন আমার বৈরাগ্য স্বধর্ম্ম।" "বৈরাগ্য দাবাগ্নি মহাপুরুষ আশ্রয়।" কিন্তু এ কথায় "ঈশ্বরে বৈরাগ্য কেন করে?"—এর উত্তর পাওয়া গেল না। "ঈশ্বর" আর "মহাপুরুষ" এক নয়।

গোবিন্দের কড়চায় গদাধর বলিলেন—বিষ আন, আমি খাব। "আন বিষ শীঘ্র, মুহি পিব।" সাফ কথা। বেদ, শাস্ত্রতর্ক—এসব কোন হাঙ্গামাই নাই। গোবিন্দ শাস্ত্রজ্ঞ নয়—বস্তুতান্ত্রিক।

লোচন সন্ন্যাসের কিছু পূর্ব্বে শ্রীকেশব ভারতীকে নবদ্বীপ আনিলেন। নিমাই কেশব ভারতীকে দেখিয়া বলিলেন—"তোমার মত বেশ আমি কবে সে ধরিব"। নিজের বাড়ীতে আসিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন যে—"সন্ন্যাস করিব"। "সন্ন্যাসীরে মনে করি গেলা নিজ ঘর। ঘরে যাঞা মনে মনে অনুমান করি। দঢ়াইল সন্ন্যাস করিব গৌরহরি"—(চৈঃ মঃ—মধ্য খণ্ড)। গয়াতে দীক্ষা লইবার আগে যেমন নবদ্বীপে ঈশ্বর পুরীকে দেখিয়াছিলেন, তেমনি কাটোয়াতে সন্ন্যাস লইবার আগে নবদ্বীপেই কেশব ভারতীর সহিত নিমাইয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এবং কেশব ভারতীকে দেখিয়া নিমাইয়ের সন্ন্যাস করিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। শুধু তাই নয়। লোচনে সন্ন্যাসের কারণ যে কৃষ্ণ বিরহ,তাহা স্পষ্ট উল্লেখ করা হইল। জীব উদ্ধারের উল্লেখ দেখি না। "মোর কৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুল কলেবর। কৃষ্ণের বিরহে মোর পোড়ায় অন্তর। কৃষ্ণের বিরহে মোর ধক্ ধক্ প্রাণ।" অতএব—"ধরিয়া যোগীর বেশ যাব দেশে দেশে। যথা লাগি পাঙ প্রাণনাথের উদ্দেশে। ইহা বলি কান্দে প্রভু ধরণী পড়িয়া। নিজ অঙ্গ উপবীত ফেলিল ছিণ্ডিয়া।" কেশব ভারতীকেও নিমাই স্পষ্ট বলিলেন—"কোথা গেলে কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুঞি পাব।"

/সন্ন্যাসের কারণ জয়ানন্দ লিখিলেন 'জীব উদ্ধার'—আর লোচন লিখিলেন 'কৃষ্ণ বিরহ'। বৃন্দাবনদাসে এ দুই কারণেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।)

এক্ষণে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া কে কি বলিলেন, দেখা যাক। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, শচীমাতা ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

না যাইব আরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া
পাপিনী জীউ আছে তোর মুখ চাইয়া।
তোমার অগ্রজ আমা ছাড়িয়া চলিলা
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা।
তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিনু
তুমি গেলে ত্যাজিব জীবন তোমা বিনু।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৬ অঃ)

"বিবর্ণ হইলা শচী অস্থিচর্ম্মসার। শোকাকুলী দেবী কিছু না

করে আহার।" নিমাই মাতাকে জন্মান্তর রহস্য বলিয়া প্রবোধ দিলেন। বলিলেন—অন্যান্য অবতারে তিনিই তাঁহার জননী ছিলেন। "এইমত তুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে।" এই জন্মান্তর রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া বুদ্ধদেব গোপাকে প্রবোধ দিয়াছিলেন। বৈষ্ণবেরা অনেক কিছুর মত ইহাও বৌদ্ধদের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। বুদ্ধদেব গোপাকে প্রবোধ দিয়াছিলেন সন্ন্যাস হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া—আর নিমাই শচী-মাতাকে প্রবোধ দিতেছেন সন্ন্যাসের ঠিক পূর্ব্বক্ষণে।

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

না জাইহরে বাছা মায়েরে ছাড়ি-আ
কেমনে বঞ্চিব আমি তোমা-না দেখি-আ।
মিশ্র পুরন্দর লোকে শ্রবণে না শুনি
বিশ্বরূপ শোকে বাছা দগধে পরাণী।
হাড় জ্বর জ্বর হৈল লক্ষ্মী বহুর শোকে
শুনি কি বলিব মোরে নবদ্বীপের লোকে।
বিষ্ণুপ্রিয়া বহু মোর হবে অনাথিনী
প্রথম যৌবন যেন জ্বলন্ত আগুণি।
অষ্ট কন্যা তুই পুত্র হইল এই কুক্ষে
কোন ভাগ্যে নারায়ণ তোমা পুত্রে রক্ষে।
অষ্ট কন্যা মইলা বিশ্বরূপ হৈলা যতি
তোমা হেন পুত্রের মায়ের এতেক তুর্গতি।
আমার বচন রাখ কি কাজ সন্ন্যাসে
নিরবধি কীর্ত্তনে নাচহ গৃহবাসে।

(চৈঃ মঃ—বৈরাগ্য খণ্ড)

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—"ইতিহাস কথনে মায়েরে প্রবোধিল"। এই 'ইতিহাস কথন' বৃন্দাবনদাসের জন্মান্তর রহস্য উদ্ঘাটন। লোচন লিখিয়াছেন—

হা পুতির পুত মোর সোনার নিমাই
আমারে ছাড়িয়া তুমি যাবে কোন ঠাঁই।
বিষ খাঞা মরিব রে তোর বিদ্যমানে

(তোমার সন্ন্যাস কথা না শুনিব কানে।
আগে ত মরিব আমি, পাছে বিষ্ণুপ্রিয়া
পিতৃহীন পুত্র তুমি দিল দুই বিভা।
অপত্য সন্ততি কিছু না দেখিল ইহা

(চৈঃ মঃ—মধ্য খণ্ড)

তারপরে শচীমাতা বলিলেন—

মনের নিবৃত্তি কলিযুগে নাহি হয়
মনের চাঞ্চল্য সন্ন্যাসের ধর্ম্মক্ষয়।

এতটা শচীমাতা বলিলেন, কি লোচন বলিলেন—বুঝা যায় না। নিমাইকে শ্রীকৃষ্ণের মত অষ্টম গর্ভের পুত্র করিবার জন্য "সাত কন্যা মরি তোরে পাঞাছিনু কোলে" বলিয়া, লোচন এক কন্যাকে লুপ্ত করিয়াছেন।

নিমাই মাতাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন—

কে তুমি তোমার পুত্র কেবা কার বাপ
মিছা তোর মোর করি কর অনুতাপ॥
ক্ষণেক ভঙ্গুর এই অনিত্য সংসার।

তারপরে বলিলেন—

সন্ন্যাস করিব কৃষ্ণ প্রেমের কারণে।

(চৈঃ মঃ—মধ্য খণ্ড)

ইহার পরক্ষণেই শচীমাতা অকস্মাৎ দেখিলেন—"নব মেঘ জিনি দ্যুতি শ্যাম কলেবর। ত্রিভঙ্গ মুরলীধর বর পীতাম্বর।" বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার তনয়। বুঝিয়া বলিলেন—"এখনে আপন সুখে করগা সন্ন্যাস"। একথা লোচনের কল্পিত। নিমাই শচীমাতাকে বলিলেন—"যেদিন দেখিতে মোরে চাহ অনুরাগে। সেইক্ষণে তুমি মোর দরশন পাবে।" বৃন্দাবনদাস বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা উল্লেখই করেন নাই। অতএব কবিরাজ গোস্বামীও উল্লেখ করেন নাই। পড়ুয়াদের সহিত কলহ ব্যাপারে সন্ন্যাস লইবার যে আকস্মিক কারণ বৃন্দাবনদাস বর্ণনা করিয়াছেন, কবিরাজ গোস্বামী তাহা সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়াছেন—(চৈঃ চঃ, আদি—১৭ পঃ)। সুতরাং উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বৃন্দাবনদাস বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা উল্লেখ করিতে সঙ্কোচ করিয়াছেন—

ইহা প্রত্যক্ষ। উপেক্ষা হইতে এই সঙ্কোচ আসে নাই, সম্ভ্রম হইতেই আসিয়া থাকিবে। কিন্তু জয়ানন্দ ও লোচনে কি বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি এই সম্ভ্রম নাই?—নিশ্চয় আছে। অথচ ইহারা দুই জনে নিঃসঙ্কোচে বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা তাঁহারা দুই জনে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সমস্তটা সত্য ইতিহাস নয়। অথচ যাহা সত্য ইতিহাস নয়, তা উত্তম কবিতা হইয়াছে।

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুকে একখানি নূতন গামছা দিয়া চরণে ধরিয়া বলিলেন—তুমি যেখানে যাইবে আমি সঙ্গে যাইব, আমাকে ছাড়িয়া যেও না। দেখ রঘুনাথের সঙ্গে জানকী বনে গিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্রৌপদী বনে গিয়াছিলেন ইত্যাদি। তা' ছাড়া "সর্ব্ব সুখময় গৃহ, কি কার্য্য সন্ন্যাসে"। পৌষমাসে প্রবল শীত, প্রবাসে ইহা তোমার সহ্য হইবে না। "তপ্ত জলে স্নান তোমার অগ্নি জ্বলে পাশে।" আর দেখ—"কীর্ত্তন অধিক সে সন্ন্যাস ধর্ম্ম নহে"। শ্রীবাসও এই কথা বলিয়াছিলেন।

নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিলেন—তুমি কি করিয়া আমার সঙ্গে যাইবে? "স্ত্রী সঙ্গে সন্ন্যাস না হএ।". রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির সন্ন্যাসী হইয়া বনে গমন করেন নাই। আর তুমি এখানে না থাকিলে নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন বাদ পরিবে। "তুমি না থাকিলে হব সংকীর্ত্তন বাদ। নবদ্বীপ লৈঞা হবে বড়ই প্রমাদ।" তারপর সংসার অনিত্য—"কার মাতা পিতা পুত্র", "সব মিথ্যা কেহ কারো নহে।" বিশেষতঃ সন্ন্যাস না নিলে "কেমতে সংসারে লোকধর্ম্ম প্রচারিব"? লক্ষ্য করিবার বিষয়—স্ত্রীর নিকট "প্রাণনাথ কৃষ্ণচন্দ্র" পাইবার জন্য যে সন্ন্যাস, তাহার উল্লেখ মাত্রও করিলেন না। নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে গলার পৈতা খুলিয়া দিলেন—"এ কথা শুনিয়া সতী, বিষ্ণুপ্রিয়া মৌনব্রতী, যজ্ঞসূত্র লৈল হাথ পাতিঞা"।

জয়ানন্দের এই মৌনব্রতী বিষ্ণুপ্রিয়া সন্ন্যাস লওয়া হইলে পরে কিঞ্চিৎ মুখ খুলিয়াছিলেন—

মায়ের অনুরোধে বাপের সত্য পালিবারে
আমা বিভা কৈলে লোক ভণ্ডিবার তরে।

(চৈঃ মঃ—সন্ন্যাস খণ্ড)

ইহা খুব স্বাভাবিক হইয়াছে। গোবিন্দের কড়চাতে বিষ্ণুপ্রিয়ার বর্ণনা "লজ্জাবতী বিনয়িনী মৃদু মৃদু ভাষ"—ইহা যদি প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা নাও হয়, তথাপি কল্পনা অশোভন হয় নাই। এবং কল্পনা মাত্রই মিথ্যা হয় না। যিনি মৌনব্রতী, যিনি 'লজ্জাবতী বিনয়নী মৃদু মৃদু ভাষ', যিনি 'প্রথম যৌবনে জ্বলন্ত আগুনি'—তাহার পক্ষে স্বামীর সন্ন্যাসের পরে জয়ানন্দের বর্ণনা অতিশয় তেজোদৃপ্ত ও রমনীয় হইয়াছে।

জয়ানন্দ এই দুই ছত্রে বিষ্ণুপ্রিয়াকে যে ভাবে ফুটাইয়াছেন, তাহা আর কোন চরিত লেখক পারেন নাই। লজ্জাবতীর মনের প্রতিক্রিয়া খুব নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে বিষ্ণুপ্রিয়াকে মুখরা বলা চলে না, ইহা তাঁহার মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

জয়ানন্দে আরো একটি বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ধাত্রীমাতা নারায়নী, আর বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণী—এ দুইজনকে জয়ানন্দ পৃথক করিয়া কাঁদাইয়াছেন। ইহাও আর কেহ করেন নাই।

কান্দিতে লাগিলা ধাত্রী মাতা নারায়ণী।

* * *

গৌরাঙ্গ বৈরাগ্য দেখি কান্দে নারায়ণী।

(চৈঃ মঃ—বৈরাগ্য খণ্ড)

এই শেষোক্ত নারায়ণী বৃন্দাবনদাসের মাতা। কেননা, তৃতীয় অপর কোন নারায়ণীর কথা গ্রন্থে নাই—ইতিহাসে পাই না।

সন্ন্যাসের সময় নিমাই অপরাপরের সহিত এ দুই জনকেও পৃথক করিয়া "তর্পনে তুষিল"।

ধাত্রীমাতা নারারণী তর্পনের জলে

* * *

নারায়ণী শর্ব্বাণী সুভদ্রা চন্দ্রকলা।

(চৈঃ মঃ—সন্ন্যাস খণ্ড)

এখানেও শেষোক্ত নারায়ণী বৃন্দাবনদাসের মাতা। জয়ানন্দের বর্ণনা হইতে প্রমাণ হয়, বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণীর বয়স তখন মাত্র ৪ বৎসর ছিল না। বৃন্দাবনদাসের মাতা সম্পর্কে গদাধরের নিকট শুনিয়াই জয়ানন্দ লিখিয়াছেন। সুতরাং সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। নারায়ণীর বয়স,

বিষ্ণুপ্রিয়া হইতে কিছু বেশীই হইবে। ১ম—চারি বৎসরের শিশু গৌরাঙ্গের বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া কান্দিতে পারে না। ২য়—'তর্পণে তুষিবার' পাত্রী হইতে পারে না।

যে কারণে নরহরির শিষ্য লোচন, ঠিক সেই কারণেই গদাধরশিষ্য জয়ানন্দ গৌরাঙ্গের নদীয়ানাগর ভাবের প্রচারক। কিন্তু নিমাইয়ের সন্ন্যাস এই নদীয়ানাগরালি ভাবের সমাধি রচনা করিল। নদীয়া-নাগর ভাবের ভজনপদ্ধতি যে বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই, নিমাইয়ের সন্ন্যাসই তাহার কারণ। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—"বৈশ্য রমনী, দ্বিজ রমনী অনেক ; শ্রীঅঙ্গ পরশে তারা গোপী ভাব পাঞা ; নিত্য সেবা করে নিশি নিভৃতে আসিঞা। সে সব রমনী মনে অনঙ্গ বাড়িল ; বৈরাগ্য দেখিয়া নিজ মন্দির ছাড়িল।" "হেনকালে গৌরচন্দ্র কীর্ত্তনে নাচিতে"—এক মহা বৈরাগ্যসূচক শ্লোক পড়িলেন। ইহা ঐ সব নাগরীরা শুনিতে পাইল—"নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি, নৌ বনস্থো যতির্বা। নাহং বিপ্রো ন চ ভবপতি, র্ণাপি বৈশ্যো ন শূদ্রঃ।" "আমি কোন বর্ণ নহি, নহি গৃহস্থ। আমি সন্ন্যাসী নহি, নহি বাণপ্রস্থ। বহ্ম, ক্ষত্রি, বৈশ্য, শূদ্র চারি আমি নহি।" তবে আমি কি ?—"গোপীনাথের দাস অনুদাস।" তিনি গোপীনাথ যে-কৃষ্ণ, তাঁর দাসানুদাস। নাগরীরা এই শ্লোক শুনিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন, অতিশয় নিরাশ হইলেন—কেননা তাহারা অনেক আশা করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহারা ভাবিল নিমাই পণ্ডিত নাগর ভাব ছাড়িয়া "জ্ঞানী হৈল"। "এই শ্লোকে অনেকের মনোদোষ হৈল। সভে বলে নিমাই পণ্ডিত জ্ঞানী হৈল"—(চৈঃ মঃ—সন্ন্যাস খণ্ড)।

জয়ানন্দ নাগর ভাবের শেষ যেভাবে করিলেন, লোচন তাহা পারেন নাই। এক্ষেত্রে নাগরালি ভাবে, লোচন অপেক্ষা জয়ানন্দ একটু বেশী অগ্রসর।

লোচন মুকুন্দকে দিয়াই নাগরালি ভাবের সূত্রপাত করিলেন। মুকুন্দ বলিল যে—আমরা সব ধর্ম্ম ছাড়িয়া তোমার শরণ নিয়াছি। এখন তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে, "এ নহে উচিত প্রভু নিবেদিয়ু আমি"। মুকুন্দ আরো বলিলেন—"কুলবতী যেন কামে হঞা অচেতনে ;

পিরীতি করয়ে যেন পর পুরুষের সনে। কলঙ্কী করিয়া যেন ছাড়য়ে তাহারে ; সে নারী অনাথ শেষে হয় দুই কুলে।” তুমি আমাদের সেই দশা করিলে। বৃন্দাবনদাসের মুকুন্দ এরকমটি বলেন নাই। প্রত্যেক চরিত লেখক এসকল ক্ষেত্রে নিজ নিজ কল্পনার উপর নির্ভর করিয়াছেন। কল্পনা সকলের সমান হয় না।

লোচন অদ্বৈতকে আনেন নাই। বৃন্দাবনদাসও আনেন নাই। জয়ানন্দ অপর সকল আপ্ত বৈষ্ণবের সহিত দলে মিশাইয়া আনিয়াছেন—“একদিন গৌরাঙ্গ অদ্বৈতচন্দ্রে আনি”। ধারণা হয়, অদ্বৈতকে নিমাই সন্ন্যাসের সঙ্কল্প আগে জানিতে দেন নাই। বিশেষতঃ এই সময়টা অদ্বৈত শান্তিপুরে ছিলেন বলিয়া মনে হয়। নতুবা অদ্বৈতের প্রতিক্রিয়া বৃন্দাবনদাস সবিস্তারেই উল্লেখ করিতেন। কিন্তু বৃন্দাবনদাস অদ্বৈতের কথা কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই।

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় লোচনে কিছু বিশেষত্ব আছে। বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইকে বলিলেন—লোক মুখে শুনি, তুমি নাকি সন্ন্যাস করিবে? আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব—“আগুনিতে প্রবেশিব আমি”। নিমাই বলিলেন—যখন করি তোমাকে বলিব, “এখনে না মর মিছা শোকে”। বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইয়ের হাত বুকে নিয়া বলিলেন—“মিছা না বলিহ মোর ডরে।” “নিশ্চয় করিয়া কহ মোকে”। নিমাই বলিলেন—দেখ, “পতি সুত নারী পিতামাতা”—“পরিণামে কে হয় কাহার?” অর্থ—কেহ কারু নয়। “শ্রীকৃষ্ণ সভার পতি, আর সব প্রকৃতি।” বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে ইহা অতি সর্ব্বনাশের কথা। তারপরে নিমাই চতুর্ভুর্জ দেখাইলেন—“চতুর্ভুর্জ দেখে আচম্বিত।” বিষ্ণুপ্রিয়া চতুর্ভুর্জ দেখিয়াও “পতি বুদ্ধি নাহি ছাড়ে তভু।” বেচারী! লোচন শচীমাতাকেও শ্যাম-কলেবর, ত্রিভঙ্গ-মুরলীধর দেখাইয়াছিলেন। ইহা লোচনের বিশেষত্ব। যাহা হউক চতুর্ভুর্জ দেখিয়া অন্ততঃ “বিষ্ণুপ্রিয়া হেঠমুখী, ছল ছল করে আঁখি”। রাত্রিকালে নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে “অশেষ চুম্বন করি নানারস কৌতুক বিথারে।” “অনন্ত বিনোদ ক্রীড়া বিষ্ণুপ্রিয়া তুষিলা প্রকারে”—কোন গ্রন্থে আছে “তুষিলা শৃঙ্গারে”। ইহাও লোচনের বিশেষত্ব। লোচন আদ্যোপান্ত আদি রস।

পুনরায় বৃন্দাবনদাসে ফিরিয়া আসিতে হয়। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—"যে দিন চলিব প্রভু সন্ন্যাস করিতে; নিত্যানন্দ স্থানে তাহা কহিলা নিভৃতে।" শুধু পাঁচ জনকে ইহা জানাইতে বলিলেন—"আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ। শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য অপর মুকুন্দ।" লক্ষ্য করিবার বিষয় আচার্য্য অদ্বৈতকে বলা হইল না, শ্রীবাসকেও নয়।

প্রাতে সুকৃতি শ্রীধর এক লাউ হাতে উপস্থিত। "নিজ মনে জানে প্রভু কালি চলিবাঙ। এই লাউ ভোজন করিতে নারিলাঙ।" "হেনই সময়ে আর কোন ভাগ্যবান—দুগ্ধ ভেট রাখিয়া দিলেক বিদ্যমান।" নিমাই শচীমাতাকে বলিলেন—"দুগ্ধ লাউ পাক গিয়া করহ সকাল।"

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত প্রভু সকলের সঙ্গে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিলেন।—তারপরে ভোজন, তারপরে শয়ন।

চলিলা শয়ন ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
নিকটে শুইল হরিদাস গদাধর।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৭ অঃ)

"নিকটে"—বাহিরে বা দূরে নয়।

এই পরিস্থিতির মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর শয্যায় শয়ন করিতে পারেন না। লোচন বৃন্দাবনদাসের এই বর্ণনা পাঠ করিয়াও ইহার প্রতিবাদস্বরূপ লিখিয়াছেন—

শয়ন মন্দিরে সুখে শয়ন করিলা
তাম্বুল স্তবক করে বিষ্ণুপ্রিয়া গেলা।

(চৈঃ মঃ—মধ্য খণ্ড)

প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে 'আইস আইস' বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। "পরম পিরীতি করি বসাইল কোলে,"—"বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভু অঙ্গে চন্দন লেপিল"—"নানা রঙ্গ করিয়া মুখে তাম্বুল তুলিয়া দিল"। তারপরে প্রভু নিজে "বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গে বেশ করেন আপনি"।

অগোর কস্তুরী গন্ধ কুচোপরি লেপে
দিব্য বস্ত্রে রচিল কাঁচুলী পরতেখে।

তারপর মদনে মুগধ হইয়া রতির বিলাস আরম্ভ হইল—

হৃদয় উপরে থোয় না ছুয়ায় শয্যা
পাশ পালটিতে নারে দোঁহে এক মজ্জা।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়
রস অবসাদে দোঁহে সুখে নিদ্রা যায়।
রজনীর শেষে প্রভু উঠিয়া সত্বর
বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রা যায় অতি ঘোরতর।

(চৈঃ মঃ—মধ্য খণ্ড)

বিষ্ণুপ্রিয়াকে এইরূপ প্রসাদ করিবার কারণ সম্পর্কে পাছে কেহ অবিশ্বাস করেন, ইহা অনুমান করিয়া লোচন লিখিতেছেন—"যে জন যেরূপ ভজে তারে তেন প্রভু"। "আছিল অধিক করি পিরীতি বাঢ়ায়"—সন্ন্যাসের পূর্ব্ব রাত্রে প্রভু 'আছিল', অর্থাৎ ছলনা করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি অধিক পিরীতি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন,—একথা একজনে যদি বিশ্বাস করে তবে আর পাঁচজন অবিশ্বাস করিবে। লোচন স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা রহিত হইয়া আদি রসের উত্তম কবিতা লিখিয়াছেন,—কিন্তু উহা সত্য ইতিহাস নয়।

এই প্রসঙ্গে গোবিন্দের কড়চায় যে বর্ণনা আছে তাহা বৃন্দাবনদাসের অনুকরণ। বৃন্দাবনদাসের "রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর"—কড়চাতে "দ্বিতীয় প্রহর নিশা"। জয়ানন্দে এই প্রসঙ্গে লোচনকে কোন সমর্থন পাওয়া যায় না—উল্লেখই নাই। বৃন্দাবনদাসেও কোন সমর্থন নাই। গোবিন্দের কড়চাতেও কোন সমর্থন নাই। কবিরাজ গোস্বামী ত এসকল ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপই করেন নাই। সন্ন্যাসের পূর্ব্বরাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত প্রভুর শৃঙ্গার রস অস্বাদনের কথা, লোচন একা দলছাড়া হইয়া লিখিয়াছেন। সমস্ত চরিত লেখকেরা ইহার বিরোধী—বিরোধী না হইলে উল্লেখ থাকিত।

শচীমাতা জানেন যে, প্রাতে প্রভু গমন করিবেন। বৃন্দাবন-দাস বিষ্ণুপ্রিয়ার জানা বা না-জানা সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

আই জানে প্রাতে প্রভু করিবে গমন।
আইর নাহিক নিদ্রা কান্দে অনুক্ষণ॥

দণ্ড চারি রাত্রি আছে ঠাকুর জানিয়া।
উঠিলেন চলিবারে নাসাঘ্রাণ লইয়া॥
গদাধর, হরিদাস উঠিলেন জানি।
গদাধর বলেন চলিব সঙ্গে আমি॥
প্রভু বলে আমার নাহিক কারু সঙ্গ,
আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন।
দুয়ারে আসিয়া রহিলেন ততক্ষণ॥
জননীরে দেখি প্রভু ধরি তান কর।
বসিয়া কহেন বহু প্রবোধ উত্তর॥
বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন।
পড়িলাম, শুনিলাম তোমার কারণ॥
দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলা আমার।
আমি কোটি কল্পেও নারিব শোধিবার॥
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে সব মোর ভার॥
বুকে হাত দিয়া প্রভু বলে বার বার।
তোমার সকল ভার আমার আমার॥
যত কিছু বলে প্রভু শচী সব শুনে।
উত্তর না করেন কান্দে অঝোর নয়নে।
পৃথিবী স্বরূপা হৈল শচী জগন্মাতা॥
জননীর পদধূলি লই প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি তবে চলিলা সত্বরে॥
চলিলেন বৈকুণ্ঠ নায়ক গৃহ হইতে।
সন্ন্যাস করিয়া সব জীব উদ্ধারিতে॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৭ পঃ)

ভক্তেরা এসব বৃত্তান্ত কিছুই জানে না। শচীমাতা নির্বাক—"জড় প্রায় রহিলেন নাহি স্ফুরে কথা"।

বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার এই পটভূমিকায়, গোবিন্দের কড়চায় দেখিতে পাই—

আথি বিথি শচী দেবী বাহিরে আসিয়া
সম্মুখে দাণ্ডাল মাতা হস্ত প্রসারিয়া ॥
তারপরে জননীর ধরিয়া চরণ।
বিদায় লইয়া প্রভু করিলা গমন ॥
কান্দিতে লাগিল মাতা দ্বারে দাঁণ্ডাইয়া।
কাঠের পুতলী সম শচী দাঁণ্ডাইলা ॥
ঝর ঝর অশ্রুবারি পড়িতে লাগিলা।

(গোঃ কড়চা)

এই দুই বর্ণনার মধ্যে ঐক্য দেখা যায়। ঐক্যের কারণ, বৃন্দাবনদাসকে অনুকরণ।

জয়ানন্দে বিদায়ের প্রাক্কালে শচীমাতার সহিত এই সাক্ষাতের বিবরণ নাই—উল্লেখও নাই। লোচনে আছে—

সন্ন্যাসী না হও নিমাই বৈরাগী না হও।
অভাগী মায়েরে নিমাই ছাড়িয়া না যাও ॥—এই পর্য্যন্ত।

বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা অতিশয় জীবন্ত বর্ণনা।

বিদায়কালে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত সাক্ষাতের কথা কেহই কিছু বলেন না—সকলেই নীরব। কেবল লোচন বলেন—বিদায়ের কালে "বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রা যায় অতি ঘোরতর"।

নিমাই গৃহত্যাগ করিবার পর—"উষাকালে স্নান করি যতেক মহান্ত; প্রভু নমস্করিতে আইসেন প্রভু ঘরে"। তাঁহারা দেখেন যে, শচীমাতা বাহির দুয়ারে বসিয়া আছেন—"জড় প্রায় আই কিছু না স্ফুরে উত্তর"। শ্রীবাসের সঙ্গেই শচীমাতার প্রথমে দেখা হইল। শচীমাতা বলিলেন—"এতেক যে কিছু দ্রব্য আছয়ে তাঁহার। তোমা সবাকার হয় শাস্ত্র পরচার।" তোমরা এই সকল দ্রব্য লইয়া যাও—"মুঞি যাঙ চলিয়া"। "শুনিমাত্র ভক্তগণ প্রভুর গমন। ভূমিতে পড়িলা সবে হই অচেতন। কান্দিতে লাগিলা সবে করি আর্ত্তনাদ।" এই সবের মধ্যে "শ্রীআচার্য্য কান্দে হরিদাস"। শ্রীআচার্য্য—অদ্বৈত। অতএব বৃন্দাবনদাস শ্রীআচার্য্যকে নবদ্বীপেই রাখিয়াছেন। অথচ অদ্বৈতের সহিত সন্ন্যাসের পূর্ব্বে নিমাই পণ্ডিত কোন পরামর্শ করিয়াছেন বলিয়া,

বৃন্দাবনদাস উল্লেখ করেন নাই। এই ঘটনার পরেই হরিদাস ফুলিয়ায় আর অদ্বৈত শান্তিপুরে চলিয়া যান।

নিমাইয়ের গৃহত্যাগের কথা শুনিয়া "পাষণ্ডীগণ হাসে"। আবার নগরিয়াগণ কেহ বলে যে—চল, ঘরে আগুণ দিয়া, কাণে কুণ্ডল পরিয়া, যোগী হইয়া চলিয়া যাই। নাথ সম্প্রদায়ের যোগীরাই কাণে কুণ্ডল পরিত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকে গৌড়-বঙ্গে নাথ-যোগীরা একটি বড় বিশিষ্ট সম্প্রদায় ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে ইহার প্রমাণ পাই। ষোড়শ শতাব্দীর বৃন্দাবনদাসেও ইহার প্রমাণ পাই।

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

গঙ্গা পার হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর।
সেই দিন আইলেন কণ্টক নগর॥
আইলেন প্রভু যথা কেশব ভারতী।
মত্ত সিংহ প্রায় প্রিয়বর্গের সংহতি॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৭ অঃ)

কেশব ভারতীকে প্রভু বলিলেন—

অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
পতিত পাবন তুমি মহা কৃপাময়॥
তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রাণনাথ।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৭ পঃ)

লক্ষ্য করিবার বিষয়, "কৃষ্ণ প্রাণনাথ" পাইবার জন্যই আচার্য্য শঙ্কর-অনুগামী ভারতী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া, নিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া সর্ব্ব লোক বলিতে লাগিল—

কেমনে ধরিবে প্রাণ ইহার জননী।
আজি তানে পোহাইল কি কাল রজনী॥
আমা সবাকার প্রাণ বিদরে শুনিতে।
ভার্য্যা বা জননী প্রাণ ধরিব কেমতে॥

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৭ অঃ)

কেশব ভারতীকে প্রভু বলিলেন—"মায়া মোরে না কর প্রকাশ"।

"আজ্ঞা করিলেন চন্দ্রশেখরের প্রতি। বিধি যোগ্য যত কর্ম্ম সব কর তুমি। তোমারেই প্রতিনিধি করিলাম আমি।"

বৃন্দাবনদাস পুনরায় বলিতেছেন—"এ সকল লীলা জীব উদ্ধার কারণ"। কৃষ্ণ প্রাণনাথকেও পাওয়া চাই এবং জীব উদ্ধারও হওয়া চাই। সন্ন্যাসের এই দুই কারণ বৃন্দাবনদাসে সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে। অনেক কাঁদাকাটির মধ্য দিয়া নাপিত দিনাবশেষে ক্ষৌরকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিল— "শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান হইল"। প্রভু কেশব ভারতীকে বলিলেন—"প্রভু কহে স্বপ্নে মোরে কোন মহাজন। কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন। বুঝ দেখি তাহা তুমি হয় কিবা নহে। এত বলি প্রভু তার কর্ণে মন্ত্র কহে। ছলে প্রভু কৃপা করি তারে শিষ্য কৈল।" মন্ত্র গ্রহণের পর "দণ্ড কমণ্ডলু দুই শ্রীহস্তে উজ্জ্বল" ধারণ করিলেন। বৃন্দাবনদাস, নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট এই সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া লিখিয়াছেন—

নিত্যানন্দ স্বরূপ সে সব তত্ত্ব জানে।
তাঁহার আজ্ঞায় আমি কৃপা অনুরূপে॥
কিছুমাত্র সূত্র লিখিলাম এ পুস্তকে।

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৭ অঃ)

সুতরাং বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য—অপর চরিতকারদের অপেক্ষা বেশী নির্ভরযোগ্য।

সন্ন্যাসের পর নিমাই পণ্ডিতের নাম হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। "মূলে ভারতীর শিষ্য ভারতী সে হয়।" কিন্তু "ইহার সে নাম থুইবার যোগ্য নয়"। কেননা ইনি জগতেরে কৃষ্ণ বোলাইয়া চৈতন্য করাইলা, আর কীর্ত্তন প্রকাশিলা—অতএব ইহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

গোবিন্দ সন্ন্যাস প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন। কড়চালেখক গোবিন্দ সেই গোবিন্দ কি-না—ইহা লইয়াই তর্ক। সন্ন্যাস প্রসঙ্গেও কড়চা বৃন্দাবনদাসের অনুগামী। বৃন্দাবনদাসের "দিন অবশেষে" কড়চায় "দিবসের শেষ ভাগে" পরিবর্ত্তিত হইয়া "ক্ষৌর কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল"।

তিনটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১ম—গোবিন্দ "দেবা" নাপিতকে দিয়া শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান করাইলেন। জয়ানন্দ বলেন, নাপিতের নাম "কলাধর"। আমরা সেদিন কাটোয়া গিয়া দেখিলাম "মধু" নাপিতের

সমাধি রহিয়াছে। লোচন বলেন, নাপিতের নাম "হরিদাস"। এক নাপিতের এত নাম সম্ভব নয়।

একই নাপিতের নাম দেবা, কলাধর, মধু এবং হরিদাস হইতে পারে না। অথবা চারিটি পৃথক নাপিতে এক সঙ্গে কিংবা পরে পরে ক্ষৌর কর্ম্ম করে নাই। লোকের স্মরণে রহিয়াছে মধু নাম। সমাধি রহিয়াছে মধু নাপিতের। দেবা, কলাধর ও হরিদাস শুনা কথা অথবা কল্পনা। ২য়—"বিল্ববৃক্ষ তলে বসি কণ্টক নগরে" প্রভু "বেদান্তের সার" এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন—"এ সকল যাহা দেখ সব মিথ্যা হয়। প্রকৃতির ছায়া মাত্র বেদে ইহা কয়।" এই "বেদান্তের সার" বক্তৃতা সর্ব্বপ্রথম দিয়াছিলেন শচীমাতাকে, হঠাৎ লক্ষ্মীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া—"এই মত কাল গতি, কেহ কার নহে"। জয়ানন্দের নিমাই, সন্ন্যাসের পূর্ব্বে বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রবোধ দিতেছেন—"সব মিথ্যা কেহ কার নহে"। সন্ন্যাসের পূর্ব্বরাত্রিতে কাটোয়ায় যে বৈদান্তিক মায়াবাদের বক্তৃতা গোবিন্দ দেওয়াইলেন, তাহা অতিশয় সময়োপযোগী হইয়াছে। ৩য়—সন্ন্যাসের পরক্ষণেই গোবিন্দ বহু পণ্ডিতকে প্রভুর দর্শনে বাহির করিয়াছেন ; ইহা আর কেহ করে নাই—

বিস্তর পণ্ডিত চলে প্রভু দরশনে।
রুদ্রদেব রামরত্ন জগাই পণ্ডিত।
গঙ্গাদাস শম্ভুচন্দ্র ভুবনে বিদিত॥
ঈশান শঙ্কর বলরাম গদাধর।
পণ্ডিতের শিরোমণি চণ্ড চণ্ডেশ্বর॥
কাশীশ্বর ন্যায়রত্ন আর সিদ্ধেশ্বর।
পঞ্চানন বৈদান্তিক আর রত্নাকর॥

এই সকল খ্যাতনামা পণ্ডিতেরা শুধু কল্পনার মিথ্যা সৃষ্টি হইতে পারেন না। গোবিন্দ অন্ততঃ এক্ষেত্রে কাহারও অনুকরণ করেন নাই এবং করেন নাই বলিয়াই একটা সত্য ইতিহাস লিখিয়া থাকিবেন। গোবিন্দের এই সব পণ্ডিতেরা ভক্ত নহেন, কৌতূহলী দর্শক মাত্র। বিস্ময়ে অভিভূত, নিমাই পণ্ডিত কি একটা কাণ্ড করিয়া বসিল! জয়ানন্দ "চৈতন্যে অল্প ভক্তি" পণ্ডিতদের 'পাষণ্ড' বলিতে দ্বিধা করেন নাই, তা হউন তাঁহারা খুড়াজ্যাঠা আর হউন বা মহাশক্তিধর—

খুড়া-জ্যাঠা পাষণ্ড চৈতন্যে অল্প ভক্তি।
মহাপাষণ্ড তবো ধরে মহাশক্তি॥

(চৈঃ মঃ—বৈরাগ্য খণ্ড)

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, সন্ন্যাসের পূর্ব্বে গৌরচন্দ্র পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন—

গৌরচন্দ্র পিতৃশ্রাদ্ধ করিল একে একে।
বাপ জগন্নাথ মিশ্রে দেখিল অন্তরীক্ষে॥
পিতামহ জনার্দ্দন মিশ্র মহাশয়।
প্রপিতামহ রাজগুরু মিশ্র ধনঞ্জয়॥
দিগ্বিজয়ী রামকৃষ্ণ বৃদ্ধ প্রপিতামহ।
তার পিতা বিরুপাক্ষ কবীন্দ্র বিগ্রহ॥
তার পিতা ক্ষীরচন্দ্র সে অভিনব ব্যাস।
দিব্যরথে আইলা সভে দেখিতে সন্ন্যাস॥

(চৈঃ মঃ—সন্ন্যাস খণ্ড)

শ্রীচৈতন্যের বাপ-পিতামহাদির নাম এত বিস্তৃতভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আর কোন চরিত লেখক লেখেন নাই। নিমাই পণ্ডিত আরো অনেককে তর্পনে তুষিল। ইহাদের মধ্যে এক লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ব্যাতিরেকে অপর সকলেই জীবিত ছিলেন।

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী রথে অন্তরীক্ষে রৈল॥
গঙ্গাজল তর্পনে তুষিল শচীমাতা।
আমি সন্ন্যাসী মা বঞ্চিবে তুমি কোথা॥
বিদ্যাগুরু গঙ্গাদাস তর্পনে তুষিল।
ঈশ্বরপুরী মন্ত্রদাতা তাঁরে জল দিল॥
ধাত্রীমাতা নারায়ণী তর্পনের জলে।
বৈষ্ণবী মালিনী সীতা তুষিল সকলে॥
দুখী দাসী চন্দ্রশেখর আচার্য্য পুরন্দর।
তর্পনে তুষিল গঙ্গাজলে বিশ্বম্ভর॥
নারায়ণী শর্ব্বাণী সুভদ্রা চন্দ্রকলা।

(চৈঃ মঃ—সন্ন্যাস খণ্ড)

(বৃন্দবনদাসের মাতা নারায়ণীর সহিত জয়ানন্দ সর্ব্বদাই অপর কয়েকটি মহিলার নাম করেন। যথা—শর্ব্বাণী, সুভদ্রা, চন্দ্রকলা ইত্যাদি। ইহারা যে কে, জয়ানন্দ তাহা বলেন না; আর কী সূত্রেই যে এই সব মহিলারা নিমাই পণ্ডিতের নিকট তর্পন পাইবার অধিকারিণী তা'ও আমরা জানি না। অথচ এই সকল মহিলাদের নাম স্রেফ্ কল্পিত বা মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের ইতিবৃত্ত আমাদের অজ্ঞাত—এই পর্য্যন্ত।)

জয়ানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামের যে ব্যাখ্যা দিতেছেন, তাহা বৃন্দাবনদাস হইতে কিছুটা ভিন্ন।

পূর্ব্বে কৃষ্ণ ছিলা ইবে চৈতন্য সন্ন্যাসী॥
কৃষ্ণ হৈঞা চৈতন্য চৈতন্য করান।
তেঞিঃ কৃষ্ণ চৈতন্য সংসারে জেন গান॥

(চৈঃ মঃ—সন্ন্যাস খণ্ড)

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণ বোলাইয়া" লোককে চৈতন্য করেন। জয়ানন্দ লিখিতেছেন—"কৃষ্ণ হইয়া চৈতন্য করেন"। 'বোলাইয়া' আর 'হইয়া'—ইহার মধ্যে পার্থক্য আছে। অবতারের পরে সন্ন্যাস—জয়ানন্দ এই কথাটির উপর জোর দিতেছেন।)

বিষ্ণুপ্রিয়া যে প্রভুকে একখানা নূতন গামছা দিয়াছিলেন, প্রভু তাহা নিত্যানন্দকে দিয়া স্তুতি করিলেন। নিত্যানন্দ সেই গামছা গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিলেন। প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুভব কিছু প্রকাশ করিলেন না।

নূতন গামছা দিয়াছিলা বিষ্ণুপ্রিয়া।
স্তুতি কৈল নিত্যানন্দে সে গামছা দিয়া॥
সে গামছা নিত্যানন্দ গঙ্গায় সমর্পিল।
বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুভব কিছু না প্রকাশিল॥

আরেকটি কথা আছে—প্রভু নিত্যানন্দকে গোপনে বলিলেন যে, আচার্য্য গোসাঞি এই সন্ন্যাসের বিরোধী। আমরা প্রথম হইতেই ইহা অনুমান করিয়া আসিয়াছিলাম। "আচার্য্য গোসাঞির বিরোধ সঙ্গোপে কহিল"—(চৈঃ মঃ—সন্ন্যাস খণ্ড)। অপর কোন চরিতলেখক এই কথাটি এত পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। "ঈশ্বরে বৈরাগ্য কেন করে?"—এ প্রশ্ন বৈষ্ণবের রাজা আচার্য্য অদ্বৈত করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের অনুমান হয়।

জয়ানন্দ মুকুন্দকে দিয়াই সর্ব্বপ্রথম সন্ন্যাসের সংবাদ নবদ্বীপে পাঠাইলেন। কেননা, নিত্যানন্দ প্রভু কয়েক দিন পরে শচীমাতাকে নিবার জন্য নবদ্বীপ আসিবেন। শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া—ইহা শুনিয়া তাহাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। "শুনি মূর্চ্ছা গেল তবে অদ্বৈত গোসাঞি।" শ্রীবাস, মুরারি, বক্রেশ্বর—ইহারাও মূর্চ্ছা গেলেন। "গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পরে শ্রীগদাধর।" লক্ষ্য করিবার বিষয় গদাধর কাটোয়াতে সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল, প্রভু সঙ্গে নেন নাই। "হরিদাস ঠাকুর শুনি লাগিল সমাধি।" অতি সুন্দর চরিত্রাঙ্কন হইয়াছে। তারপরে জয়ানন্দ কুলবধূদের পর্য্যন্ত কান্দাইয়াছেন। "কুলবধূ কান্দে প্রভুর রূপ বিনাইয়া। কুলবধূজন কান্দে পরম রূপসী।" নিমাইয়ের ভুবন-ভুলান রূপ কুলবধূদেরও আকৃষ্ট করিয়াছিল। সন্ন্যাসের পর, শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপের কথা জয়ানন্দ বর্ণনা করিয়াছেন। শচীমাতা নিমাইয়ের "শয়ন মন্দিরের খাট, কৃষ্ণকেলী বসন, সোনার মাদুলী, ডাবর, বাটা, বাটী"—এসব দেখিয়া আগুনে পুড়িয়া যাইতে লাগিলেন। বলিলেন—"কি কৈল কেশব ভারতী"। এই সংক্ষিপ্ত কথা কয়টির মধ্যে অনুভব করি, শচীমাতা যেন পাথর হইয়া গিয়াছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া মাটিতে পড়িয়া কাঁন্দিতে লাগিলেন—"কোথা আছ প্রাণনাথ আমারে এড়িয়া"। বিষ্ণুপ্রিয়ার সংসার অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি হরি হরি বলিয়া নিজের কপালে ঘা মারিতে লাগিলেন। বিষ খাইয়া মরিতে চাহিলেন। খেদোক্তি করিলেন—

আর না দেখিব তোমার সরু পৈতা কান্ধে।
আর না দেখিব তোমার কেশের তেন ছান্দে॥
আর না দেখিব তোমার মদন মোহন নাট।
আর না শুনিব তোমার শ্রীভাগবত পাঠ॥
মায়ের অনুরোধে বাপের সত্য পালিবারে॥
আমা বিভা কৈলে লোক ভাণ্ডিবার তরে॥
যত দয়া প্রভু তোমার ইহাতেই সাক্ষী।

(চৈঃ মঃ—সন্ন্যাস খণ্ড)

বৃন্দাবনদাসে বিষ্ণুপ্রিয়া যৎকিঞ্চিৎ পাই। কবিরাজ গোস্বামীতে

পাই না। লোচনে পাই আদিরসের কবিতা। জয়ানন্দে পাই নিখুঁত, নিপুণ চরিত্রাঙ্কন। জয়ানন্দে অনেক নূতন ইতিহাস পাওয়া যায়, ইহা স্বীকৃত। অথচ জয়ানন্দ অনাদৃত, একথাও স্বীকৃত। বৈষ্ণব সমাজে ভক্ত পাঠক বেশী—ইতিহাসের তত্ত্ব কথা লইয়া অনুসন্ধিৎসু পাঠক কম। জয়ানন্দের অনাদৃত হইবার অন্যান্য কারণের মধ্যে ইহাও একটি কারণ। জয়ানন্দ ২০ বৎসর বয়সে প্রভুকে সন্ন্যাস দেওয়াইয়াছেন—এ ভ্রম অমার্জ্জনীয়। তথাপি জয়ানন্দ আমাদের নিকট আদৃত হইবার অনেক কিছুই দাবী করিতে পারেন।

লোচন লিখিয়াছেন—সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে এত বেশী প্রতিবাদ হইল যে, প্রভু বলিলেন "সন্ন্যাস করিব তার আছয়ে বিলম্ব"। "বৈরাগ্য আবেশ প্রভু পরিত্যাগ করি", ঘরে ঘরে গিয়া হাস্যপরিহাসে কথা কহে। এমন কি "সবলোক জানিলেক নহিব সন্ন্যাস"। এ সমস্তই ছলনা। বিষ্ণুপ্রিয়াকে সন্ন্যাসের পূর্ব্বরাত্রে যে এতটা "রতিবিলাস" দেখাইলেন, তাহার কারণ "বৈরাগ্য সময়ে প্রেমা উভারে অধিক"। লোচন জানিতেন যে, এই "রতিবিলাস" লোকে বিশ্বাস করিবে না। অতএব তিনি নানাবিধ কারণ আবিষ্কারে মন দিলেন।

শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ, লোচন বিস্তার করিয়াই লিখিয়াছেন। "শচীদেবী কান্দে কোলে করি বিষ্ণুপ্রিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া মরা যেন রহিল পড়িয়া।" শচীমাতা কান্দিলেন—"পঢ়িয়া শুনিঞা পুত্র ইহাই শিখিলা। অনাথিনী অভাগিণী মায়েরে করিলা।" বিষ্ণুপ্রিয়া "প্রভুর অঙ্গের মালা হৃদয়ে করিয়া। জ্বালহ আগুনি আমি মরিব পুড়িয়া।"

লোচনের ভনিতাযুক্ত (পদকল্পতরু—১৭৮৩ সংখ্যা) বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যায় আর একটি আক্ষেপ আছে—যাহা লোচনের গ্রন্থে নাই। কাজেই ইহা লোচনের কি-না, নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। "এই ত দারুণ শেল রইল সম্প্রতি। পৃথিবীতে না রইল তোমার সন্ততি।" বুদ্ধদেবের স্ত্রী গোপার অবলম্বন ছিল রাহুল—বিষ্ণুপ্রিয়ার রাহুল ছিল না। এ আক্ষেপটি খুব স্বাভাবিক এবং সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। জয়ানন্দের বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যায় এই আক্ষেপটি নাই।

লোচনের কেশব ভারতী, নিমাই পণ্ডিতকে সন্ন্যাস দিতে আপত্তি

করিলেন। "পঞ্চাশের উর্দ্ধ হৈলে রাগের নিবৃত্তি"—২৪ বৎসর সন্ন্যাসের বয়স নয়। বাসুদেব সার্ব্বভৌমও অনেক আপত্তির মধ্যে এ আপত্তি তুলিয়াছিলেন। তারপরে কেশব ভারতী বলিলেন—তোমার জননী আর স্ত্রীর নিকট হইতে অনুমতি লইয়া আইস। তারপর ভারতীর কর্ণে সন্ন্যাসের স্বপনে-পাওয়া মন্ত্র নিমাই বলিলেন। এবং সেই মন্ত্রই পুনরায় ভারতীর নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন। নিমাই সন্ন্যাসী হইলেন। লোচন "নবদ্বীপ হইতে গদাধর নরহরি"-কে আনিলেন। "ডাহিন বামেতে দোঁহে রহিল নিশ্চয়।" সন্ন্যাসের সময়েও রাস-বিনোদিয়া নৃত্য করাইলেন। লোচন বলেন—"আপনেই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বুঝায়ে সভারে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তেঞি বলি যে ইহারে।" লোচন আর একটি কথা লিখিয়াছেন—"বৃন্দাবন মাঝে কিবা রাধা হারাইয়া। তাঁর অন্বেষণে বুলে কান্দিয়া কান্দিয়া॥ সে বিরহে ভেল ইহার সন্ন্যাস কারণ।" প্রাকৃতে ইহা প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীর জন্য বিরহ বলিয়া আমরা প্রথম হইতেই অনুমান করিয়া আসিতেছি। লোচন আমাদের কথাই সমর্থন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এখন শঙ্কর সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী—মায়াবাদী। কিন্তু নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মবাদী নহেন—কৃষ্ণ অথবা রাধা প্রেমে উন্মত্ত সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য কাটোয়া ছাড়িয়া রাঢ় দেশে প্রবেশ করিলেন। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—"রাঢ়ে আসি গৌরচন্দ্র হইলা প্রবেশ"। প্রভু বলিলেন—"অরণ্যে প্রবিষ্ট মুঞি হইমু সর্ব্বথা। প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা।" গয়াতে দীক্ষা লওয়ার পরে ঠিক এইরূপ আবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ প্রাণনাথকে পাইবার জন্য বৃন্দাবন যাইবার সংকল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার মগ্ন-চৈতন্যের রাজ্যে একই বস্তু ক্রিয়া করিতেছে; সুযোগ ও সুবিধা মত উহা প্রকাশ পাইতেছে। আবেশের সময়ের ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও একটা সঙ্গতি পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীচন্দ্রশেখরকে প্রভু নবদ্বীপ পাঠাইলেন; ভক্তবৃন্দকে বলিয়া পাঠাইলেন, "কহিও সবারে আমি চলিলাম বনে"। প্রভু মত্ত-সিংহ প্রায় চলিয়াছেন—"নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ সংহতি। গোবিন্দ পশ্চাতে অগ্রে কেশব ভারতী"। প্রভু পশ্চিম মুখে চলিয়াছেন—"প্রভু বলে বক্রেশ্বর আছে যে বনে। তথায়ে যাইমু মুঞি থাকিমু নির্জ্জনে।" তারপর প্রভু নিজেই

পূর্ব্বমুখে চলিতে লাগিলেন। বলিলেন—"আমি চলিলাঙ নীলাচলে"। তারপর তিনি নিত্যানন্দকে নবদ্বীপ পাঠাইলেন এই বলিয়া—"সবার অপেক্ষা আমি করি শান্তিপুরে। রহিবাঙ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের ঘরে। তা সবা লইয়া তুমি আসিবা সত্বর। আমি যাই হরিদাসের ফুলিয়া নগর।" "চলিলেন মহাপ্রভু ফুলিয়া নগর।" সন্ন্যাস লওয়ার পর প্রভু সর্ব্বপ্রথম ফুলিয়াতে হরিদাসের আশ্রমে গেলেন। প্রভু ভোজনাদি কোথায় করিলেন, বৃন্দাবনদাস উল্লেখ করেন নাই। "ফুলিয়া নগরে প্রভু আছেন শুনিয়া" অনন্ত অর্ব্বুদ লোক খেয়াঘাটে পার হইয়া, কত বা নৌকাডুবি হইয়া—"হইতে লাগিল বড় লোকের গহন; ফুলিয়া পূরিল সব নগর কানন।" তারপর "চলিলেন শান্তিপুরে আচার্য্যের ঘরে"। এদিকে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ নবদ্বীপ আসিয়া দ্বাদশ উপবাসের পর শচীমাতাকে ভোজন করাইলেন—"দ্বাদশ উপাসে আই করিলা ভোজন"। প্রভু শান্তিপুর আসিয়া অদ্বৈতের সহিত মিলিত হইলেন,—"হেনই সময়ে শ্রীঅনন্ত নিত্যানন্দ; আইলা নদীয়া হইতে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ।" শচীমাতা নিশ্চয় আসিলেন, কিন্তু বৃন্দাবনদাস তাহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ কেন করিলেন না বুঝা গেলনা। তারপর প্রাতে "প্রভু বলে আমি চলিলাঙ নীলাচলে"। বৃন্দাবনদাসের শান্তিপুরের বর্ণনা অসম্পূর্ণ। ইহা কবিরাজ গোস্বামী পূরণ করিবেন।

গোবিন্দ, কড়চায় বলেন—অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে "শচীমাতা আসি দেখা দিলা"।

জয়ানন্দ বলেন, "সমুদ্রগড়ি পার হইয়া গেলা শান্তিপুরে"—"চৈতন্য রহিলা শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্রের বাড়ী।" সেখানে "ডাকিয়া আনি সভা শচী ঠাকুরাণী"—শচীমাতা আসিলেন। প্রভু বলিলেন, "আমা সঙ্গে চল সভে জাব উড্রদেশে।" আচার্য্যের গৃহে আনন্দে ভোজন হইল—"হরিদাস ঠাকুর আগু হবিষান্ন দিলা; আর যত মহান্ত সে প্রাঙ্গনে বসিলা।"

লোচন বলেন, প্রভু "রাঢ় দেশে না শুনিল কৃষ্ণ নাম গন্ধে"। রাঢ় দেশে তিন দিন ভ্রমণের পর প্রভু শ্রীচন্দ্রশেখরকে নবদ্বীপ পাঠাইলেন। তারপর নিত্যানন্দকে পাঠাইলেন—"যাহ নিত্যানন্দ নবদ্বীপ আজ তুমি। শান্তিপুরে সভারে দেখিয়ে আমি"—(চৈঃ মঃ—মধ্য খণ্ড)"। নিত্যানন্দ

প্রভু শচীমাতাকে লইয়া শান্তিপুর আসিলেন। কিন্তু তখনও প্রভু আসিয়া পৌঁছেন নাই। হেনই সময়ে প্রভু আসিলেন। "একদিঠে চাহে শচী গোরাচাঁদ মুখ।" শচীমাতা বলিলেন, "ঘরে লঞা যাব তোরে রাখিব সম্বরি। সন্ন্যাসের বেশ তোর সব পরিহরি।" শচীমাতার এই উক্তি খুব স্বাভাবিক হইয়াছে। "পাক কৈল শচীমাতা জগতজননী"—"ভোজন করায় অদ্বৈত বড় পরিপাটী।" লোচন এখানেও গদাধর নরহরিকে পাঠাইয়াছেন—"গদাধর নরহরি নাচে তারা পাশে।" তারপর প্রভু বলিলেন—আমি নীলাচল জগন্নাথ দেখিবারে যাইব। "নীলাচলে বাস আমি করিব সর্ব্বথা ; সর্ব্বদা আসিবে যাবে দেখা পাবে তথা।"

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, "সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলে বৃন্দাবন। রাঢ় দেশে তিন দিন করিল ভ্রমণ"—(চৈঃ চঃ, মধ্য—৩য় পঃ)। নিত্যানন্দ প্রভু সকলকে শিখাইয়া দিলেন—"বৃন্দাবন পথ প্রভু পুছেন তোমারে ; গঙ্গাতীরে পথ তবে দেখাইহ তারে।" প্রভু আবেশে গমন করিতেছেন। নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচন্দ্রশেখরকে বলিলেন যে—তুমি শান্তিপুর শ্রীঅদ্বৈতকে গিয়া বল যে, "সাবধানে রহে যেন নৌকা লয়ে তীরে" ; আমি প্রভুকে তাঁহার মন্দিরে লইয়া যাইতেছি। অদ্বৈতকে এই কথা বলিয়া—"তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন ; শচীমাতা লঞা এস আর ভক্তগণ।" এইখানে বৃন্দাবনদাসের সহিত মিল হইতেছে না। বৃন্দাবনদাস বলেন, প্রভু নিত্যানন্দকেই নবদ্বীপ পাঠাইয়াছিলেন। ইহা তিনি শ্রীপাদ নিত্যানন্দের মুখে শুনিয়াই লিখিয়াছেন। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন যে, নিত্যানন্দ প্রভু নিজে না আসিয়া চন্দ্রশেখরকে নবদ্বীপ পাঠাইলেন। চন্দ্রশেখরকে নবদ্বীপ পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয়—"মহাপ্রভু আগে আসি দিল পরিচয়॥ প্রভু কহে শ্রীপাদ তোমার কোথাকে গমন। শ্রীপাদ কহে তোমা সঙ্গে যাব বৃন্দাবন॥ প্রভু কহে কতদূর আছে বৃন্দাবন। তিঁহো কহেন কর এই যমুনা দরশন॥" "আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায়, যমুনা জ্ঞানে।" "হেনকালে আচার্য্য গোসাঞি নৌকাতে চড়িয়া। আইলা নূতন কৌপিন বহির্ব্বাস লঞা॥" শ্রীঅদ্বৈতকে দেখিয়া প্রভুর মনে সন্দেহ হইল। তিনি বলিলেন—"তুমি তো আচার্য্য গোসাঞি এথা কেনে আইলা। আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমতে জানিলা॥" "আচার্য্য কহে

তুমি যাঁহা সেই বৃন্দাবন। মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমা আগমন॥ প্রভু কহে নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা। গঙ্গাকে আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা॥" আচার্য্য বলিলেন—"প্রেমাবেশে চারি দিন আছ উপবাস। আজি মোর ঘরে ভিক্ষা চল মোর বাস॥" কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনদাসের ফুলিয়াগমন চাপা দিয়া যাইতেছেন। কিন্তু বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা পাঠ করিয়া কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে, রাঢ় দেশে তিন দিন ভ্রমণের পর প্রভু হরিদাসের ফুলিয়া নগরেই প্রথম গিয়াছিলেন, পরে ফুলিয়া হইতে শান্তিপুর গমন করেন। শান্তিপুরে—"এই মত দশ দিন ভোজন কীর্ত্তন"। "প্রভাতে আচার্য্যরত্ন দোলায় চড়াইঞা। ভক্তগণ সঙ্গে আইলা শচীমাতা লইঞা॥" "শচী আগে পড়িল প্রভু দণ্ডবৎ হৈয়া। কান্দিতে লাগিল শচী কোলে উঠাইয়া॥" "কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল। অঙ্গ মুছে মুখ চুম্বে করে নিরীক্ষণ॥" শচীমাতা কান্দিয়া বলিলেন—"বাছারে নিমাই; বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই। সন্ন্যাসী হইয়া মোরে না দিল দরশন। তুমি তৈছে হৈলে মোর হইবে মরণ।" "কান্দিয়া কহেন প্রভু শুন মোর আই। তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই॥ তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হইতে। কোটী জন্মে তোমা ঋণ না পারি শোধিতে॥ জানিয়া না জানি যদি করিলু সন্ন্যাস। তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস॥ তুমি যাহাঁ কহ আমি তাহাঞি রহিব। তুমি যেই আজ্ঞা কর সেই সে করিব॥" "বহুদিন আচার্য্য গোসাঞি কৈল সমাধান॥" শচীমাতা প্রতিদিন রন্ধন করেন ও ভক্তগণ লইয়া প্রভু ভোজন করেন।

শ্রীচৈতন্য সব ভক্তদের বলিলেন—"যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস। তথাপি তোমা সবা হৈতে নহিব উদাস॥ তোমা সব না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।" বলিলেন—তোমরা তো বুঝ, সন্ন্যাসের পর আত্মীয় কুটুম্ব লইয়া থাকা চলে না। কাজেই, এমন যুক্তি কর যাহাতে দুইদিক রক্ষা হয়। তারপর শচীমাতার সহিত অদ্বৈতাদির একটা গোপন পরামর্শ হইল। প্রভুর কথা, ভক্তগণ শচীমাতাকে নিবেদন করিল।

শচীমাতা বলিলেন—

শুনি শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিল॥

তিঁহ যদি ইহাঁ রহে তবে মোর সুখ।
তাঁর নিন্দা হয় যদি তবে মোর দুঃখ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয়॥
নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর।
লোক গতাগতি বার্ত্তা পাব নিরন্তর॥
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু তাঁর হবে আগমন॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৩য় পঃ)

হরিদাস করুণ বচনে বলিলেন—"নীলাচল যাবে তুমি মোর কোন গতি"। নীলাচল যাইবার শক্তি ত আমার নাই। প্রভু বলিলেন—"তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম"।

তারপর জননীরে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রভু ছত্রভোগ পথে নীলাদ্রি গমন করিলেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহ) তিনি শান্তিপুর পরিত্যাগ করিলেন।

কেননা, ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মাঘ (ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ) প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য রাত্রিশেষে গৃহত্যাগ করিয়া কাটোয়া যাত্রা করিলেন। ২৯শে মাঘ সংক্রান্তির দিন প্রাতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। ফাল্গুনের প্রথম তিন দিন রাঢ়ে ভ্রমণ করিলেন। বৃন্দাবনদাস শচীমাতার "দ্বাদশ উপাসে"-র কথা লিখিয়াছেন। ৯ই ফাল্গুনের আগে দ্বাদশ উপবাস হয় না। সুতরাং শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ৯ই ফাল্গুন নবদ্বীপ আসিয়া শচীমাতাকে ভোজন করাইয়া, তাঁহাকে লইয়া শান্তিপুর অভিমুখে রওনা হইলেন। ৯ই কিংবা ১০ই ফাল্গুন শচীমাতা আচার্য্য অদ্বৈতের গৃহে সন্ন্যাসী নিমাইয়ের সহিত মিলিত হইলেন। কবি কর্ণপুর চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে লিখিয়াছেন—শান্তিপুরে প্রভু তিন দিন মাত্র ছিলেন (জনন্যা প্রমোদার্থং ত্রীন দিবসান তত্রস্থিত্বা)। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, দশ দিন ছিলেন—"এই মত দশ দিন ভোজন কীর্ত্তন!" এই দশ দিনের কথা তিনি কাহার নিকট শুনিয়া লিখিলেন, জানা যায় না। ফুলিয়ার কথা কবিরাজ গোস্বামী উল্লেখ মাত্রও করিলেন না। ফুলিয়া বাদ দিয়া, ১লা ফাল্গুন হইতে

তিন দিন রাঢ়ে ভ্রমণ করাইয়া, পরে ৪ঠা ফাল্গুন হইতে শান্তিপুরে, ১০ দিন না হউক অন্ততঃ ৮ দিন হইতে পারে। কিন্তু ফুলিয়া বাদ দিলে চলিবে না। সুতরাং কবিরাজ গোস্বামীর ১০ দিনের কথা, হিসাবে মিলে না।

কবি কর্ণপূরের গ্রন্থ পাঠ করিয়াও কবিরাজ গোস্বামী তিন দিনের স্থানে দশ দিন কেন করিলেন, ইহা এক সমস্যা। অবশ্য শচীমাতা আসিয়া পৌঁছিবার দু'চার দিন পূর্ব্বে প্রভুর আগমণ অসম্ভব নয়। তিন দিন রাঢ়ে ভ্রমণ, এক দিন ফুলিয়ায় অবস্থান, ৫ই কিংবা ৬ই ফাল্গুন শান্তিপুরে আগমন—এরূপ হিসাব করিলে, শচীমাতার আগমণের পর তিন দিন এবং আগে ৩।৪ দিন ধরিয়া নিলে কবিরাজ গোস্বামীর ঠিক দশ দিন না হইলেও কাছাকাছি যায়।

আবার কবিরাজ গোস্বামীই লিখিয়াছেন যে, ফাল্গুনের শেষে প্রভু নীলাচলে আসিয়া দোলযাত্রা দেখিলেন। সুতরাং বৃন্দাবনদাসের "দ্বাদশ উপবাস" আর কবি কর্ণপূরের "ত্রীন দিবসান" একত্র করিয়া অন্ততঃ ১২ই ফাল্গুনে প্রভুকে নীলাচলে রওনা করাই সঙ্গত। কেননা ইহার পরে রওনা হইলে পদব্রজে "মত্ত-সিংহ প্রায়" দ্রুতগতি সত্বেও ফাল্গুনের শেষে আসিয়া নীলাচলে পৌঁছিয়া দোলযাত্রা দেখা যায় না। "ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস।" "ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল"—(চৈঃ চঃ, মধ্য—৭ পঃ)।

অষ্টম বক্তৃতা

[শ্রীচৈতন্যের নীলাচল গমন ও নীলাচল বাসের হেতু কি? ভুবনেশ্বরে চৈতন্যদেবের শিব পূজা উপলক্ষে দামোদর পণ্ডিতের প্রতিবাদ এবং মুরারি গুপ্তের সমর্থনের হেতু কি? ঐ শিবস্তোত্র চৈতন্যদেবের নিজের রচিত কি-না? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও বাসুদেব সার্ব্বভৌমের মধ্যে কথোপকথন সম্পর্কে চরিতগ্রন্থে বিভিন্ন মত ও তাহার সামঞ্জস্য।]

শান্তিপুর হইতে প্রভু নীলাচলে চলিলেন। কাটোয়ায় সন্ন্যাসের পর প্রভুর বেশ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। চাঁদ কাজির বাড়ী লুণ্ঠনের দিন আমরা প্রভুকে দেখিয়াছি,—কুঞ্চিত কেশদামে মালতী ফুলের মালা—চন্দনে চর্চ্চিত দেহ— অধরে তাম্বুল—বাম স্কন্ধে কুঙ্কুমে রঞ্জিত সরু পৈতা—কৃষ্ণকেলি বসন পরিধানে। আজ সে বেশ নাই। শিখাসূত্র মুড়াইয়া গেরুয়া বসন পরিধান করিয়াছেন,—একহাতে দণ্ড আর এক হাতে কমণ্ডলু—'ছেঁড়া কাঁথা, মুড়ো মাথা, করঙ্গ লইয়া হাতে'। জয়ানন্দ বিষ্ণুপ্রিয়াকে দিয়া বিলাপ করাইয়াছেন—

> সে হেন চাঁচর কেশে কি কৈলে গোসাঞি
> কোথা আছ প্রাণনাথ আর দেখা নাই।
> সোণার অঙ্গে রাঙ্গা বসন কেমন শোভা করে
> সিন্দুরিয়া মেঘে যেন সুমেরু শিখরে।
> আর না দেখিব তোমার সরু পৈতা কান্ধে
> আর না দেখিব তোমার কেশের তেন ছান্দে।

(চৈঃ মঃ—সন্ন্যাস খণ্ড)

—বিষ্ণুপ্রিয়ার এই বিলাপ অপর কোন চরিতগ্রন্থে নাই।

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে—ভক্তেরা কিন্তু এই সময় প্রভুকে নীলাচল যাইতে নিষেধ করিল। কেননা তখন উড়িষ্যা ও বাংলা দেশের মধ্যে যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। দুই রাজ্যে লোক যাতায়াত নিষেধ হইয়াছে। তখন গৌড়ে রাজা হুসেন শাহ, আর উড়িষ্যায় রাজা প্রতাপরুদ্র।

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন (বিজয় খণ্ড)—ইহার দুই চারি বৎসর পরে প্রভু যখন নীলাচলে বাস করিতেছিলেন, তখন প্রতাপরুদ্র গৌড় জয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভু নিষেধ করায় প্রতাপরুদ্র গৌড় আক্রমণ না করিয়া বিজয়নগরে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন।

প্রতাপরুদ্র গৌড় জিনিতে করে আশ
শুনিয়া গৌড়েন্দ্র তারে করেন উপহাস।
চৈতন্যদেবে রাজা আজ্ঞা মাগিল
প্রভু বলেন প্রতাপরুদ্রে কুবুদ্ধি লাগিল।
প্রভু নিবারিল সে শুনিয়া প্রতাপরুদ্র
বিজয়া নগরে গেলা করিবারে যুদ্ধ।

(চৈঃ মঃ—বিজয় খণ্ড)

বৃন্দাবনদাসে পাই যে—প্রভু যখন নীলাচলে গিয়া উপনীত হইলেন প্রতাপরুদ্র তখন নীলাচলে ছিলেন না, যুদ্ধ করিতে বিজয়নগরে গিয়াছিলেন।

যে সময়ে ঈশ্বর অহিলা নীলাচলে।
তখনে প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে॥
যুদ্ধ রসে গিয়াছেন বিজয় নগরে।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—২য় অঃ)

বৃন্দাবনদাস ও জয়ানন্দ উভয়েই দুই দুই বার প্রতাপরুদ্রকে বিজয় নগরে যুদ্ধ করিতে পাঠাইতেছেন। জয়ানন্দ বলিতেছেন যে, প্রতাপরুদ্র গৌড় জিনিতেও আশা করিয়াছিল। প্রভুর নীলাচল গমনকালে, বৃন্দাবনদাসের মতে, বাংলা দেশ ও উড়িষ্যার মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল। হুসেন সাহই উড়িষ্যার উত্তরাংশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ভক্তেরা প্রভুকে বলিলেন—

তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময়
সে রাজ্যে এখন কেহ পথ নাহি বয়।
দুই রাজ্যে হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ
মহাদস্যু স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ।
যাবৎ উৎপাত নাহি উপশম হয়

তাবৎ বিশ্রাম কর যদি চিত্তে লয়।
প্রভু বলে যে-সে কেনে উৎপাত না হয়
অবশ্য চলিব মুঞি কহিনু নিশ্চয়। *

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—২য় অঃ)

আচার্য্য অদ্বৈত, প্রভুকে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভু সে নিষেধ মানিলেন না—'চলিলেন নীলাচলে না হৈলা নিবৃত্ত'। চৈতন্য-চরিত্রে আমরা দৃঢ়তার পরিচয় পাইলাম। একদিকে যেমন দৃঢ়তা, তেমনি অন্য দিকে কোমলতায় পরিপূর্ণ। ভক্তদের একে একে প্রত্যেককে প্রভু আলিঙ্গন করিয়া বিদায় লইলেন।

প্রত্যেকে প্রত্যেকে ধরি আলিঙ্গন করে।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—২য় অঃ)

প্রভুর সঙ্গে চলিলেন—

নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ গোবিন্দ
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—২য় অঃ)

---

* ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর শেষে প্রভু নীলাচল যাত্রা করিলেন। এই সময় হুসেন শাহ উড়িষ্যার উত্তরাংশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্র এই সময় উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমান্তে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। সুতরাং প্রতাপরুদ্রের অনুপস্থিতিতে হুসেন শাহ উড়িষ্যার উত্তরাংশ আক্রমণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। প্রভু যখন নীলাচলে পৌছিয়া সার্ব্বভৌমের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, প্রতাপরুদ্র তখনও বিজয়নগরে কৃষ্ণদেবের সহিত যুদ্ধরসে মগ্ন আছেন। প্রভু দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যাওয়ার পর এবং তাঁহার দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে ব্যাপৃত থাকাকালীন প্রতাপরুদ্র রাজধানীতে ফিরিয়া আক্রমণকারী হুসেন শাহের পশ্চাৎ ধাবন করিয়া হুগলী জেলার মন্দারণগড় পর্য্যন্ত পৌছিলেন। কথিত আছে, প্রতাপরুদ্র তাঁহার মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধর ভৈই'র বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজিত হইয়া হুসেন শাহর সহিত তাড়াতাড়ি সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা সত্য ইতিহাস বলিয়াই প্রমাণিত হইতেছে।

ইহার পরে প্রভুর সহিত প্রতাপরুদ্রের প্রথম মিলন হয় প্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর। জয়ানন্দের বর্ণনায় দেখিতে পাই, প্রতাপরুদ্র পুনরায় একবার হুসেন শাহর গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য প্রভুর পরামর্শ

ইহারা ছাড়াও প্রভুর সঙ্গে আরো যাহারা ছিলেন, তাহাদের কথা অপর চরিতগ্রন্থে পাওয়া যায়।

প্রভু ছত্রভোগ আসিলেন। ইহা ডায়মণ্ডহারবারের অন্তর্গত। এখানে তন্ত্রোক্ত ৫২-পীঠের অন্তর্গত ত্রিপুরাসুন্দরী নামক পীঠস্থান আছে। সেই স্থানের অধিকারী রামচন্দ্র খান প্রভুর সহিত আসিয়া মিলিত হইল। প্রভু রামচন্দ্র খানকে বলিলেন—আমি কাল প্রত্যুষে কিরূপে নীলাচলে যাইব বল? রামচন্দ্র খান বলিল—

রামচন্দ্র খান বলে শুন মহাশয়
যে-আজ্ঞা তোমার সেই কর্ত্তব্য নিশ্চয়।
সবে প্রভু হইয়াছে বিষম সময়
সেদেশে এদেশে কোন পথ নাহি বয়।

চাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভু প্রতাপরুদ্রকে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিতে নিষেধ করিয়া কাঞ্চী (বিজয়নগর) জয় করিতে পরামর্শ দিলেন। প্রভু স্পষ্টই বলিলেন যে, গৌড় আক্রমণ করিলে—

উড্রদেশ উচ্ছন্ন করিবেক যবনে।
জগন্নাথ নীলাচল ছাড়িব এতদিনে॥
লজ্জা পাবে প্রতাপরুদ্র আমার বাক্য ধর।
গৌড়মুখে শয়ন ভোজন পাছে কর॥
কাঞ্চীদেশ জিনি কর নানা রাজ্য।
গৌড় জিনিবে হেন না দেখি সে কার্য্য॥
গৌড়েশ্বর অবশ্য আসিব নীলাচলে।
তুমি ছাড়িবে প্রলয় হইবে উৎকলে॥
প্রভু নিবারিল সে শুনিয়া প্রতাপরুদ্র।
বিজয়া নগরে গেলা করিবারে যুদ্ধ॥ (জয়ানন্দ—বিজয় খণ্ড)

সুতরাং প্রতাপরুদ্র গৌড়দেশ আক্রমণ না করিয়া পুনরায় কৃষ্ণদেব রায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে বিজয়নগরে গেলেন। জয়ানন্দ সত্য ইতিহাসের কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস ও জয়ানন্দ উভয়েই গৌড়, উৎকল ও বিজয়নগরের যুদ্ধবিগ্রহের কথা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তৎকালীন ইতিহাসে ও জগন্নাথ মন্দিরের মাদলা পাঞ্জিতে তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। ঐ মাদলা পাঞ্জিতে হুসেন শাহকে "গউড় পাতিশা, অমুরা সুরথান" অর্থাৎ 'আমীর সুলতান' বলা হইয়াছে।

রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে
পথিক পাইলে জাশু বলি লয় প্রাণে।
কোন দিগ দিয়া বা পাঠাও লুকাইয়া
তাহাতে ডরাঙ প্রভু শুন মন দিয়া।
মুঞি সে রক্ষক এথা সব মোর ভার
নাগালি পাইলে আগে সংশয় আমার।

*　　　*　　　*

জাতি প্রাণ ধন কেনে আমার না যায়
রাত্রে আমি তোমায় পাঠাইব সর্ব্বথায়।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—২য় অঃ)

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, নীলাচলগমনে প্রভুর সঙ্গে ছিলেন। বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ প্রভুর শেষ সাক্ষাৎ-শিষ্য। সুতরাং এসকল কথা নিত্যানন্দ প্রভুর নিকটে শুনিয়া তিনি লিখিয়াছেন। অপর চরিতকারগণের এরূপ সৌভাগ্য হয় নাই।

দুই রাজ্যের যুদ্ধবিগ্রহের আশঙ্কার মধ্যেও যেসময় পথচলাচল অতিশয় বিঘ্নসঙ্কুল ছিল, প্রভু তাহা গ্রাহ্য না করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র খান ঘাটে নৌকা আনিলেন, প্রভু গিয়া নৌকার উপর উঠিলেন। উঠিয়াই প্রভু মুকুন্দকে কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু নৌকার নাবিক অর্থাৎ মাঝি নিষেধ করিল।

অবোধ নাবিক বলে হইল সংশয়
বুঝিলাম আজি আর প্রাণ নাহি রয়।
কূলেতে উঠিলে বাঘে লইয়া পালায়
জলেতে পড়িলে কুম্ভীরেতে ধরি খায়।
নিরন্তর এ পানিতে ডাকাইত ফিরে
পাইলেই ধন প্রাণ দুই নাশ করে।
এতেকে যাবৎ উড়িয়ার দেশ পাই
তাবৎ নীরব হও সকল গোসাঞি।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—২য় অঃ)

নাবিক মুসলমান ছিল কি-না বুঝা গেল না—জলও আছে আবার পানিও আছে। হুসেন শাহর আমলেও দেশে যে শুধু স্থলদস্যু ছিল তা নয়, জলদস্যুও ছিল। নাবিকের কথায় প্রভু হুঙ্কার করি সকলকে বলিলেন—কেন, ভয় কর কার? মুকুন্দকে বলিলেন, কীর্ত্তন বন্ধ করিও না।

হেনমতে মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন রসে
প্রবেশ হইলা আসি শ্রীউৎকল দেশে।
নৌকা হৈতে মহাপ্রভু উঠিলেন তটে
প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র উড্রদেশে।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—২য় অঃ)

গৌড়দেশে প্রভু আচার্য্য অদ্বৈত ও যবন হরিদাসের ভক্তিতে কৃষ্ণের অবতার হইয়াছেন ; অবতারের উদ্দেশ্য জীব উদ্ধার, পতিত উদ্ধার—পাষণ্ডী দলন ও যবন রাজভীতি দূরীকরণ। চাঁদ কাজির বাড়ী লুণ্ঠনে, বৃন্দাবনদাস ও কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনার অনৈক্যের মধ্য দিয়াও আমরা তাহা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। প্রভু বার বার হুঙ্কার করিয়াছেন—'মুঞি সেই, মুঞি সেই' অর্থাৎ আমি কৃষ্ণের অবতার। 'সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিমু'—একথা তাঁহার শ্রীমুখে গৌড়ের ভক্তবৃন্দ বার বার শুনিয়াছে। তাঁহার অস্ত্র হইতেছে—সংকীর্ত্তন। 'সংকীর্ত্তন প্রারম্ভে মোহার অবতার', সুতরাং জলদস্যু ভয়ে ভীত হইয়া তিনি উড্রদেশে প্রবেশমুখে সংকীর্ত্তন বন্ধ করিতে পারেন না। সংকীর্ত্তন সঙ্গে করিয়াই প্রভু উড্রদেশে প্রবেশ করিলেন।

তারপর সুবর্ণরেখায় আসিয়া নদীতে প্রভু স্নান করিলেন। মত্ত-সিংহ প্রায় প্রভু ছুটিয়া চলিয়াছেন। নিত্যানন্দ প্রভু কিছুটা পাছে পড়িয়াছেন, শুধু জগদানন্দ প্রভুর সঙ্গে আছেন।

রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দ চন্দ্র
সংহতি তাঁহার সবে শ্রীজগদানন্দ।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—২য় অঃ)

সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান করিয়া, প্রভু নিত্যানন্দের আগমণের জন্য অপেক্ষা করিলেন। জগদানন্দ, প্রভুর সন্ন্যাসের দণ্ড বহন করেন। তিনি উহা নিত্যানন্দ প্রভুর হাতে দিয়া ভিক্ষায় বাহির হইলেন।

দণ্ড হাতে করি হাসে নিত্যানন্দ রায়
দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায়।
অহে দণ্ড আমি যারে বহয়ে হৃদয়ে
সে তোমারে বহিবেক এ ত যুক্তি নহে।
এত বলি বলরাম পরম প্রচণ্ড
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি করি তিন খণ্ড।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—২য় অঃ)

নিত্যানন্দ প্রভু, মহাপ্রভুর প্রতি অত্যধিক স্নেহ অনুরাগ বশতঃই দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

নিত্যানন্দ প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে আপনি
কি লাগি ভাঙ্গিলা দণ্ড কহ দেখি শুনি ?
নিত্যানন্দ বলে ভাঙ্গিয়াছি বাঁশখান
না পার ক্ষমিতে কর যে শাস্তি বিধান (প্রমাণ ?)।
প্রভু বলে যহি সর্ব্বদেব অধিষ্ঠান
সে তোমার মতে কি হৈল বাঁশখান।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—২য় অঃ)

দণ্ড ভঙ্গ সম্বন্ধে সকল চরিতকার কিছু একমত নহেন। গোবিন্দ তাঁহার কড়চাতে এবং জয়ানন্দ, ইহার উল্লেখমাত্র করেন নাই। লোচনের বর্ণনা বৃন্দাবনদাসের অনুরূপ নয়। লোচন বলেন (চৈঃ মঃ—মধ্য খণ্ড)—জগদানন্দ নয়, প্রভু নিজেই নিত্যানন্দের হাতে দণ্ড দিয়াছিলেন। অবশ্য কবিরাজ গোস্বামীও সেই কথাই বলেন।

নিত্যানন্দ হাতে দণ্ড দিয়া গৌর হরি
কিছু আগে গেলা নিত্যানন্দ পাছু করি।

(চৈঃ মঃ, মধ্য—পৃঃ ৭৬)

দণ্ড ধারণ সন্ন্যাসের চিহ্ন। প্রভুর সন্ন্যাসে নিত্যানন্দ এবং অপর সকল ভক্ত অতিশয় দুঃখিত। সুতরাং নিত্যানন্দ—

ভাঙ্গিলেন দণ্ড থুঞা উরুর উপর।

ভাঙ্গিয়া ফেলিল দণ্ড ভক্তগণ দুঃখে
দণ্ড নহে শেল সে আছিল মোর বুকে।

(চৈঃ মঃ, মধ্য—পৃঃ ৭৬)

লোচন ও প্রভুকে দিয়া বলাইলেন—

মোর দণ্ডে বৈসে যত মোর দেবগণ
হেন দণ্ড ভাঙ্গি কি সাধিলে প্রয়োজন।

নিত্যানন্দ উত্তর দিলেন—

তোর দণ্ডে বৈসে যদি তোর দেবগণে
কাঁধে করি লৈয়া যাহ সহিব কেমনে ?

(চৈঃ মঃ, মধ্য—পৃঃ ৭৬)

বৃন্দাবনদাস প্রভুর জলেশ্বর গ্রামে আসিবার ঠিক পূর্ব্বক্ষণে দণ্ড ভগ্ন করাইলেন, কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী তাহা করিলেন না। দণ্ড ভগ্ন করাইয়া বৃন্দাবনদাস প্রভুকে জলেশ্বর, জাজপুর, কটক, সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বরে ক্রমে ক্রমে আনিলেন। অথচ কবিরাজ গোস্বামী ভুবনেশ্বরের পরেও কমলপুরে প্রভুকে আনিয়া ভার্গীনদীতে স্নান করাইয়া তবে নিত্যানন্দের হাতে দণ্ড দিলেন। কোন্ স্থানে দণ্ড ভগ্ন হইল,—বর্ণনা একরূপ নয়।

কমলপুরে আসি ভার্গীনদী স্নান কৈল
নিত্যানন্দের হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল।
কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে
এথা নিত্যানন্দ প্রভু কৈল দণ্ড ভঙ্গে।
তিন খণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়া

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৬ষ্ঠ পঃ)

বৃন্দাবনদাস ও লোচন দণ্ড ভঙ্গের যে কারণ দিয়াছেন এবং যে প্রকারে দণ্ড ভঙ্গ হইল লিখিয়াছেন—কবিরাজ গোস্বামী সেরূপ লেখেন নাই। তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা লিখিয়াছেন। প্রভু প্রেমাবেশে পড়িয়া যাইতে ছিলেন, নিত্যানন্দ অমনি প্রভুকে ধরিতে গিয়া দুইজনেই জড়াজড়ি অবস্থায় দণ্ডের উপর পড়িয়া গেলেন। দুই জনের ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হইল।

নিত্যানন্দে কহে প্রভু, দেহ মোর দণ্ড
নিত্যানন্দ বলে দণ্ড হৈল তিন খণ্ড।
প্রেমাবেশে পড়িলে তুমি, তোমারে ধরিনু
তোমা সহ সেই দণ্ড উপরে পড়িনু।
দুই জনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল
সেই খণ্ড কাঁহা পড়িল কিছুনা জানিল।
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড
যে উচিত হয় মোর কর তাহা দণ্ড।

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৬ষ্ঠ পঃ)

প্রভু দুঃখিত হইলেন—

ঈষৎ ক্রোধ করি কিছু কহিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি মোর সবে হিত কৈলা
সবে দণ্ড ধন ছিল তাহা না রাখিলা।

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৬ষ্ঠ পঃ)

প্রভু বলিলেন—আমি তোমাদের সহিত জগন্নাথ দেখিতে যাইব না, হয় তোমরা আগে যাও আর না হয় আমি একা আগে যাই। প্রভুর একাকী আগে যাওয়াই স্থির হইল।

দণ্ড ভঙ্গ ঘটনাটি সামান্যও বটে, আবার সামান্য নাও বটে। কিন্তু কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, সমস্ত ঘটনাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইলে শুধু একখানি চরিতগ্রন্থের উপর নির্ভর করা নিরাপদ নয়। পরস্পর-বিরোধী দুইটি দার্শনিক তত্ত্বও যেমন একসঙ্গে সত্য হইতে পারে না, তেমনি পরস্পর-বিরোধী দুইটি ঘটনাও একসঙ্গে সত্য হইতে পারে না—তা ক্ষুদ্রই হউক আর বৃহৎই হউক।

তারপর বৃন্দাবনদাস প্রভুকে জলেশ্বর আনিলেন। জলেশ্বরে ব্রাহ্মণেরা শিবপূজা করিতেছিলেন, প্রভু তা দেখিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং ভক্তদিগকে বলিলেন—

শিবের অমান্য করে ব্যর্থ তার সব।

জলেশ্বর গ্রামে রাত্রে থাকিয়া, প্রভাতে বাঁশদহ পথে চলিলেন।

পথে যাইতে এক শাক্ত সন্ন্যাসী প্রভুকে তাঁহার মঠে গিয়া আনন্দ করিতে বলিল। শাক্তেরা মদিরা পানকে আনন্দ বলে।

শাক্ত বলে চল ঝাট মঠেতে আমার
সবেই আনন্দ আজি করিব অপার।
পাপী শাক্ত মদিরারে বলয়ে আনন্দ

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—২য় অঃ)

প্রভু শাক্তকে বলিলেন—তুমি আগে গিয়া সব প্রস্তুত কর, আমি যাইতেছি।

হেনমতে শাক্তের সহিত রস করি
আইলা রেমুনা গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।

তারপর প্রভু জাজপুর আসিলেন। এখানে একটি রহস্যজনক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল—অলৌকিক কিছু নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যে ও গুরুত্বে তাহা বিশেষ স্মরণীয় এবং আলোচনার যোগ্য। এক জয়ানন্দ ব্যতীত অপর কোন চরিতলেখকই ইহার সন্ধান দেন নাই বা দিতে পারেন নাই।

জাসপুরে আসিয়াই প্রভু সকল ভক্তবৃন্দকে ছাড়িয়া একাকী এক দিনের জন্য লুকাইয়া গিয়া সকল দেবালয় ও পুণ্যস্থান দেখিয়া পুনরায় ভক্তবৃন্দের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন—

সবা ছাড়ি একা পলাইলেন আপনে।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—২য় পঃ)

ভক্তেরা সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। নিত্যানন্দ প্রভু সকলকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—

—সবে স্থির কর চিত্ত।
জানিলাম প্রভু গিয়াছেন যে নিমিত্ত।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—২য় পঃ)

নিত্যানন্দ প্রভু কি জানিতেন, বৃন্দাবনদাস তাহা আমাদিগকে খুলিয়া বলেন নাই। কিন্তু এইখানে জয়ানন্দ এক নূতন কথা বলিয়াছেন। উহা প্রাচীন ইতিহাস, অথচ অতিশয় প্রয়োজনীয় কথা। জয়ানন্দ বলেন যে, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ উৎকলের জাজপুরে বাস করিতেন।

রাজা ভ্রমরের (কপিলেন্দ্র দেবের উপাধি—ভ্রমর) ভয়ে জাজপুর হইতে তাঁহারা শ্রীহট্টে পলায়ন করেন। তাহা হইলে দাঁড়ায় এই—চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ উড়িয়া ছিলেন। মাত্র কয়েক পুরুষে তাঁহারা শ্রীহট্টের বাঙ্গালী হইয়াছেন। এই নিমিত্তই কি প্রভু একাকী একদিন পালাইয়া গিয়া জাজপুরে পূর্ব্বপুরুষের বসতিস্থান অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলেন, এবং সেই পূর্ব্বপুরুষদের বংশে পরম বৈষ্ণব কমললোচনের গৃহে একদিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন ? আর কোন তীর্থস্থানে ত কোনদিন তিনি ভক্তদের ছাড়িয়া একা পালাইয়া যান নাই। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

> চৈতন্য গোসাঞির পূর্ব্বপুরুষ আছিল জাজপুরে
> শ্রীহট্ট দেশেরে পালায়া গেলা রাজা ভ্রমরের ডরে।
> সেই বংশে পরম বৈষ্ণব কমললোচন তাঁর নাম
> পূর্ব্ব জন্মের তপে গোসাঞি তাঁর ঘরে করিলা বিশ্রাম।

জয়ানন্দের কথা সত্য হইলে, ইহা অনেকের কাছে গর্ত্ত হইতে সর্প আবিষ্কারের মত মনে হইতে পারে যে—মহাপ্রভু বংশপরম্পরায় বাঙ্গালী নহেন, উড়িয়া। অবশ্য বাঙ্গালী হইয়াও তৎকালে উড্রদেশে, জাজপুরে বাস করিতে পারে—ইহা সম্ভব। অসম্ভব কিছু নয়।

প্রভু না হয় গিয়া কমল লোচনের ঘরেই একদিন বিশ্রাম করিলেন। কিন্তু ভক্তদের নিকট ইহা তিনি লুকাইতে চাহিলেন কেন ? এইখানেই রহস্য থাকিয়া গেল।

জাজপুরের পর প্রভু কটক আসিলেন এবং ক্রমে সাক্ষী গোপালের স্থানে গেলেন।

"তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর।" ভুবনেশ্বর তীর্থকে গুপ্ত কাশী বলা হয়। কেননা এখানে ঊনকোটী শিবলিঙ্গ আছে। কাশীতে এক কোটী আছে, ভুবনেশ্বরে একটি কম আছে। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

> আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র
> শিবপূজা করিলেন লই ভক্তবৃন্দ।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—২য় অঃ)

লোচন, ভুবনেশ্বর সম্পর্কে কিছু বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন।

ভুবনেশ্বরে শিব দেখিয়া প্রভুর শরীর অবশ হইয়া গেল, নয়নে জল ঝরিতে লাগিল। প্রভু শিবের একটি স্তোত্র পাঠ করিলেন—

"নমো নমস্তে ত্রিদিবেশ্বরায়, ভূতাদিনাথায় মৃড়ায় নিত্যম্।
গঙ্গা তরঙ্গোত্থিত বালচন্দ্রচূড়ায় গৌরী নয়নোৎসবায়।
সন্তপ্তচামীকরচন্দ্রনীলপদম্ প্রবালাম্বুদ কান্তি বস্ত্রৈঃ।
সুনৃত্যরঙ্গেষ্টবরপ্রদায়, কৈবল্যনাথায়, বৃষধ্বজায়॥"

এক লোচন ভিন্ন, অপর কোন চরিতকার এই স্তবটির উল্লেখ করেন নাই। কেহ কেহ বলেন, প্রভু নিজে এই স্তোত্রটি রচনা করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য কিছুই নয়। দাক্ষিণাত্য ও বোম্বাই প্রদেশ ভ্রমণকালে প্রভু একটি শিবমন্দিরও পূজা না করিয়া অতিক্রম করেন নাই। প্রভুর এই শিবপূজা লইয়া দামোদর আর মুরারিতে কথা হইল। লোচন লিখিয়াছেন—

মুরারিরে পুছিলা পণ্ডিত দামোদর
শিবের নির্ম্মাল্য কেন লইল ঈশ্বর।
অগ্রাহ্য শিবের নির্ম্মাল্য ভৃগু শাপে
তবে কেন পরিগ্রহ কৈল প্রভু আপে।
আপনে ব্রহ্মণ্যদেব এই মহাপ্রভু
জানিয়া শুনিয়া কেনে লঙ্ঘিলেক তবু।

(চৈঃ মঃ—মধ্য খণ্ড)

মুরারি কহিলেন, হরি-হর ভেদ নাই।

শিবের নির্ম্মাল্য খায় অভেদ চরিত
সে জনে অধিক হরি হরের পিরীত।

—দামোদর সন্তুষ্ট হইলেন।

বৃন্দাবনদাসও অনুরূপ কথাই লিখিয়াছেন—

শিব প্রিয় বড় কৃষ্ণ তাহা বুঝাইতে
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের সাক্ষাতে।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—২য় অঃ)

ভুবনেশ্বরে শিবের কাছে বৃন্দাবনদাস প্রভুকে দিয়া নৃত্য করাইলেন, আর লোচনদাস এক অতি অনুপম স্তব পাঠ করাইলেন।

লোচন, মুরারি আর দামোদরকেও প্রভুর সঙ্গে আনিয়াছেন। জয়ানন্দকে জাজপুরে আমাদের প্রয়োজন ছিল, আর লোচনকে ভুবনেশ্বরে আমাদের প্রয়োজন ছিল। সে প্রয়োজন শেষ হইয়াছে, আবার আমরা বৃন্দাবনদাসে ফিরিয়া যাইতেছি।

ভুবনেশ্বর হইতে প্রভু কমলপুরে আসিয়াই শ্রীজগন্নাথ দেবের—

দেউলের ধ্বজ মাত্র দেখিলেন দূরে।

দেখিয়াই—

অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুঙ্কার
বিশাল গর্জ্জনে কম্প সর্ব্বদেহভার।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—২য় অঃ)

তারপর সর্ব্ব সেবকেরে বিনয় করিয়া বলিতে লাগিলেন—তোম্‌রা ত আমাকে জগন্নাথ দেখাইয়া বন্ধুর কাজ করিলে—

এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে
আমি বা যাইব আগে তাহা বল মোরে।
মুকুন্দ বলেন, তবে আগে তুমি যাও
ভাল বলি চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য —২য় অঃ)

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীমূর্ত্তি জগন্নাথ—

দেখিমাত্র প্রভু করে পরম হুঙ্কারে।
ইচ্ছা হইল জগন্নাথ কোলে করিবারে॥
লম্ফ দেন বিশ্বম্ভর আনন্দে বিহ্বল।

লম্ফ দিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অজ্ঞ পড়িহারি সব উঠিল মারিতে
আস্তে ব্যস্তে সার্ব্বভৌম পড়িলা পৃষ্ঠেতে।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম সেইকালে জগন্নাথ দেখিতে আসিয়াছিলেন। প্রভু অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন—

শেষে সার্ব্বভৌম যুক্তি করিলেন মনে
প্রভু লই যাইবারে আপন ভবনে।

সার্ব্বভৌম বলে ভাই পড়িহারিগণ
সবে তুলি লহ এই পুরুষ রতন।

পড়িহারিরা প্রভুকে তুলিয়া লইয়া চলিল—

পিপীলিকাগণ যেন অন্ন যায় লৈয়া।
সর্ব্বলোকে ধরি সার্ব্বভৌমের মন্দিরে
আনিলেন কপাট পড়িল তার দ্বারে।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—২য় অঃ)

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিত্যানন্দ প্রভু অপর ভক্তগণকে লইয়া সার্ব্বভৌমের বাড়ীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় এক জনকে সঙ্গে দিয়া নিত্যানন্দ প্রমুখ সকলকে জগন্নাথ দর্শন করাইতে পাঠাইয়া দিলেন।

যে মনুষ্য যায় দেখাইতে জগন্নাথ
নিবেদন করেন করিয়া যোড় হাত।
স্থির হই জগন্নাথ সবেই দেখিবা
পূর্ব্ব গোসাঞির মত কেহ না করিবা।
যে মতে তোমার করিলেন একজনে
জগন্নাথ দৈবে রহিলেন সিংহাসনে।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—২য় অঃ)

ভক্তেরা শুনিয়া হাসিলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে—কোন চিন্তা নাই, তাঁহারা স্থির হইয়াই জগন্নাথ দেখিবেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন যে, সার্ব্বভৌম তাঁহার পুত্র চন্দনেশ্বরকে জগন্নাথ দেখাইতে সঙ্গে দিয়াছিলেন। অতঃপর সকলে সমুদ্রে স্নান করিয়া আসিলে, প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সার্ব্বভৌম মহাশয় বহুবিধ মহাপ্রসাদ আনিয়া প্রভুর সম্মুখে রাখিলেন।

মহাপ্রসাদেরে প্রভু করি নমস্কার
বসিলা ভুঞ্জিতে লই সর্ব্ব পরিবার
প্রভু বলে বিস্তর নাফরা মোরে দেহ
পীঠাপানা ছেনাবড়া তোমরা সে লহ।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—২য় অঃ)

কবিরাজ গোস্বামীও বৃন্দাবনদাসকে অনুসরণ করিয়া একইরূপ লিখিয়াছেন—

বহুত প্রসাদ সার্ব্বভৌম আনাইলা।
সার্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে।
পীঠাপানা দেহ তুমি ইহা সবাকারে

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৬ষ্ঠ পঃ)

কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর নীলাদ্রি গমনের বর্ণনা, বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে পাঠ করিয়া তাঁহারি উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন। নূতন কোন কথা আমরা চৈতন্য চরিতামৃতে পাই না। কবিরাজ গোস্বামী স্পষ্ট লিখিয়াছেন—

চৈতন্য মঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রি গমন
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৩য় পঃ)

কবিরাজ গোস্বামীর সময়ে, অন্ততঃ ১৬১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম ছিল চৈতন্য মঙ্গল। পরে পরিবর্ত্তন করিয়া চৈতন্য ভাগবত নাম রাখা হয়। এই পরিবর্ত্তন কে করিয়াছিল, কবে করিয়াছিল, এবং কেন করিয়াছিল—তাহার সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম বলিয়াছেন। কোন্‌টি সত্য ঠিক অনুমান করা কঠিন।

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

নীলাদ্রি গমন, জগন্নাথ দরশন
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর মিলন।
এ সকল লীলা শ্রীব্যাস বৃন্দাবন
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন উত্তম বর্ণন।
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি
দম্ভ করি বর্ণি যদি নাহি তৈছে শক্তি।

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৪র্থ পঃ)

আমরা মূলতঃ বৃন্দাবনদাসকেই অনুসরণ করিরা প্রভুকে নীলাচল আনয়ন করিয়াছি। জয়ানন্দ ও লোচনে জাজপুর ও ভুবেনেশ্বর সম্পর্কে যে কিছু নূতন কথা আছে, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি।

গোবিন্দ এবং তাঁহার কড়চা অদ্যাপি এক কণ্টকপূর্ণ সমস্যা। গোবিন্দকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রাচীনেরা, অপর চরিত লেখকেরা, বিশেষতঃ বৃন্দাবনদাস ও জয়ানন্দে তাঁহার সবিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাই। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ সংহতি
গোবিন্দ পশ্চাতে, আগে কেশব ভারতী।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—১ম অঃ)

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

গঙ্গা পার হৈয়া আগে রৈলা নিত্যানন্দ।
মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্ম্মকার
মোর সঙ্গে আইস কাটোআ গঙ্গাপার।

(চৈঃ মঃ, বৈরাগ্য খণ্ড—পৃঃ ৮৩).

তারপর সন্ন্যাস খণ্ডে আছে—

আগম নিগম গীতা গোবিন্দের কান্ধে।
করঙ্গ কৌপীন কটি সূত্র তাহে বান্ধে।

(চৈঃ মঃ, সন্ন্যাস খণ্ড—পৃঃ ৮৬)

গোবিন্দ, কড়চায় নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

পেছনে পেছনে আমি খড়ি লৈয়া যাই।

যদি পরবর্ত্তী কেহ ইহা বৃন্দাবনদাস এবং জয়ানন্দকে অনুকরণ করিয়াই লিখিয়া থাকেন, তথাপি ইহা মিথ্যা কথা নহে। সুতরাং কড়চার নীলাদ্রি গমনের বর্ণনা অনৈতিহাসিক মনে করিবার কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার সহিত গোবিন্দের বর্ণনার মিল রহিয়াছে, গরমিল দেখি না। বৃন্দাবনদাস যদি সত্য ইতিহাস লিখিয়া থাকেন, তবে গোবিন্দও সত্য ইতিহাসই লিখিয়াছেন।

এইবার নীলাচলে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সহিত প্রভুর শাস্ত্র বিচার, কথোপকথন ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ—এই সকল বিষয়ে বৃন্দাবনদাস ও কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা মিলাইয়া দেখিতে হইবে। যদিও কবিরাজ গোস্বামী "সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর মিলন" বর্ণনায় বৃন্দাবনদাসের উপরেই নির্ভর করিয়াছেন, তথাপি আমরা দেখিব যে এই দুই মহাগ্রন্থকারের একই

ঘটনার উপরে বর্ণনা একরূপ নহে। শাস্ত্রবিচার সম্পর্কে মারাত্মক ভেদ আছে। ঐশ্বর্য্য প্রকাশ সম্পর্কেও ভেদ আছে। ভেদ যখন আছে, তখন অবশ্য এই ভেদের কারণও আছে। বিনা কারণে এই দুই মহাগ্রন্থকার বিভিন্ন বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই।

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, প্রভু একদিন সার্ব্বভৌমকে লইয়া নিভৃতে বসিলেন—

প্রভু বলে শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
জগন্নাথ দেখিতে যে আইলাম আমি
উদ্দেশ্য আমার মূল এথা আছ তুমি।
জগন্নাথ আমারে কি কহিবেন কথা
তুমি সে আমার বন্ধু জানিবে সর্ব্বথা।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—৩য় অঃ)

সার্ব্বভৌম, প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ আদৌ পছন্দ করেন নাই। এইক্ষণে সাহস পাইয়া বলিলেন—

পরম সুবুদ্ধি তুমি হইয়া আপনে
তবে তুমি সন্ন্যাস করিলে কি কারণে ?

(সন্ন্যাসে অহংকার বাড়ে। তা'ছাড়া সন্ন্যাসী নিজেকে ঈশ্বর মনে করে—"আপনারে বলে নারায়ণ", অথচ "জীবের স্বভাবধর্ম্ম ঈশ্বর ভজন" কিরূপে হয় ?)

"যদি বল শঙ্করের মত সেহ নহে"—তথাপি দাস্যভাব যে শঙ্করের মত, তা শঙ্করের বাক্য হইতেই প্রমাণ হয়।

যেন সমুদ্রের সে তরঙ্গ লোকে বলে
তরঙ্গের সমুদ্র না হয় কোন কালে।
এই শঙ্করের বাক্য, এই অভিপ্রায়
ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্য্যে মুড়ায়।
না বুঝিয়া শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়
ভক্তি ছাড়ি মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায়।

অতএব তোমারে সে কহি এই আমি
হেন পথে প্রবিষ্ট হইলা কেনে তুমি ?

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—৩য় অঃ)

সার্ব্বভৌম বলিলেন যে, দাস্য বা ভক্তিই শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়। তাঁর অভিপ্রায় না বুঝিয়া, ভক্তি ছাড়িয়া, মাথা মুড়াইয়া লোকে দুঃখ পায়। তারপরে সার্ব্বভৌম বলিলেন—

যদি বল মাধবেন্দ্র আদি মহাভাগ
তাঁহারাও করিয়াছে শিখাসূত্র ত্যাগ।
তথাপিও তোমার সন্ন্যাস করিবার
এ সময়ে কেমতে হইবে অধিকার।
সে সব মহান্ত শেষ ত্রিভাগ বয়সে
গ্রাম্যরস ভুঞ্জিয়া সে করিলা সন্ন্যাসে।
যৌবন প্রবেশ মাত্র সকলে তোমার
কেমতে হইবে সন্ন্যাসের অধিকার।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—৩য় অঃ)

তা'ছাড়া যে ভক্তি তোমার শরীরে হইয়াছে, তাতে সন্ন্যাসের কোনই প্রয়োজন ছিল না এবং নাই।

ইহা শুনিয়া প্রভু উত্তর করিলেন—

প্রভু বলে শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়
সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া
বাহির হইনু শিখাসূত্র মুড়াইয়া।
সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—৩য় অঃ)

তারপর—

প্রভু বলে মোর এক আছে মনোরথ
তোমার মুখেতে শুনিবাঙ ভাগবত।

সার্ব্বভৌম বলে তুমি সকল বিদ্যায়
পরম প্রবীণ আমি জানি সর্ব্বথায়।
কোন্ ভাগবত অর্থ না জান বা তুমি
তোমারে বা কোন্ রূপে প্রবোধিব আমি।
বল দেখি সন্দেহ তোমার কোন্ স্থানে
আছে তাহা যথা শক্তি করিব বাখানে।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—৩য় অঃ)

প্রভু আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিলেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ে নির্গন্থা অপ্যরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্য হৈতুকীং ভক্তিমিথং ভূতগণো হরি॥

সার্ব্বভৌম ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া চুপ করিলেন—

ত্রয়োদশ প্রকার শ্লোকার্থ বাখানিয়া
রহিলেন আর শক্তি নাহিক বলিয়া।

তারপর প্রভু বলিলেন—

এবে শুন আমি কিছু করিয়ে ব্যাখ্যান

* * *

তখন বিস্মিত সার্ব্বভৌম মহাশয়
আরো অর্থ নরের শক্তিতে কভু হয়!!
ব্যাখ্যা শুনি সার্ব্বভৌম পরম বিস্মিত
মনে ভাবে এই কিবা ঈশ্বর বিদিত।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—৩য় অঃ)

সার্ব্বভৌম যখন প্রভুর ব্যাখ্যা শুনিয়া পরম বিস্মিত এবং মনে ভাবিতেছেন এই ব্যক্তি ঈশ্বরবিদিত কি-না, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে প্রভু ভাবাবেশে মগ্ন হইয়া ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। নবদ্বীপলীলায় ইহা তিনি পূর্ব্বেও করিয়া আসিয়াছেন, এবং অল্প কয়েকদিন পরে রামানন্দ-মিলন সময়েও এইরূপে তিনি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিবেন। ইহা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক—নূতন কিছুই নহে।

শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার
আত্মভাবে হইলা ষড়ভূজ অবতার।

প্রভু বলে সার্ব্বভৌম কি তোর বিচার
সন্ন্যাসে আমার নাহি হয় অধিকার।
সন্ন্যাসী কি আমি হেন তোর চিত্তে লয়
তোর লাগি এথা আমি হইনু উদয়।
সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মুঞি বই নাহি আর।
সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব
চিন্তা কিছু নাহি তোর পড় মোর স্তব।
অপূর্ব্ব ষড়ভূজ মূর্ত্তি কোটী সূর্য্যময়
দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্ব্বভৌম মহাশয়।

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—৩য় অঃ)

একটা অলৌকীক অদ্ভুত ঘটনা হঠাৎ ঘটিয়া গেল। লক্ষ্য করিতে হইবে প্রভুর অবতারের শ্রীমূর্ত্তি ষড়ভূজ। আর অবতারের উদ্দেশ্য সাধুর উদ্ধার, দুষ্টের বিনাশ। নবদ্বীপে এই পরিকল্পনাই হইয়াছিল। রামানন্দ-মিলন এখনো হয় নাই। রামানন্দ-মিলনে অবতারের শ্রীমূর্ত্তির পরিবর্ত্তন হইবে, অবতারের উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তন হইবে। বৃন্দাবনদাস সার্ব্বভৌম-মিলনে নবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারকেই ঘোষণা করিলেন।

যখন এই ঘটনা ঘটিল, নিত্যানন্দ প্রভু তখন মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলেই উপস্থিত ছিলেন। ইহা রামানন্দ-মিলনের কয়েকদিন মাত্র আগের ঘটনা। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা শেষ হইল। এখন দেখিতে হইবে আমরা ইহাতে পাইলাম কী।

১ম, সার্ব্বভৌম মহাশয় প্রভুকে শাঙ্কর বেদান্তী বলিয়া ভ্রম করিতেছেন এবং শাঙ্কর বেদান্তকে ভক্তি পথে ব্যাখ্যা করিতেছেন।

২য়, প্রভু ভাগবত পাঠ শুনিতে চাহিলেন—বেদান্ত নয়।

৩য়, প্রভু সার্ব্বভৌমকে ষড়ভূজ দেখাইলেন। প্রভুর সন্ন্যাসের অধিকার লইয়া সার্ব্বভৌমের মনে যে সন্দেহ হইয়াছিল, তার শেষ উত্তরে প্রভু দেখাইলেন যে তিনি সন্ন্যাসের উর্দ্ধে অবতার পুরুষ।

৪র্থ, তাঁহার অবতারের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন—সাধুর উদ্ধার, দুষ্টের বিনাশ

এইবার দেখা যাক কবিরাজ গোস্বামী কি বলেন। প্রভু সার্ব্বভৌমকে বলিতেছেন—

তুমি জগৎ-গুরু সর্ব্বলোক হিতকর্ত্তা
বেদান্ত পড়াও, সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা।
আমি বালক সন্ন্যাসী, ভালমন্দ নাহি জানি
তোমার আশ্রয় নিল গুরু করি মানি।
আজি হয়েছিল মোর বড়ই বিপত্তি
তাহাতে করিলা তুমি আমার অব্যাহতি।
ভট্ট কহে একেলে তুমি না যাইহ দর্শনে
আমা সঙ্গে যাবে কিবা মম লোক সনে।
প্রভু কহে মন্দির ভিতরে না যাইব
গরুড়ের পাশে রহি দর্শন করিব।

তারপর সার্ব্বভৌম গোপীনাথ আচার্য্যকে বলিলেন—

আমার মাতৃষ্বসা-গৃহ নির্জ্জন স্থান
তাহা বাসাদেহ কর সর্ব্ব সমাধান।

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৬ষ্ঠ অঃ)

গোপীনাথ আচার্য্য সেইরূপ করিলেন। তারপর প্রভুর বিষয় সার্ব্বভৌম সমস্ত শুনিয়া বলিলেন যে—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নামটি বেশ ; কিন্তু কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস নিয়াছেন, ভারতী সম্প্রদায় উত্তম নয়, মধ্যম। বিশেষতঃ ইহার প্রৌঢ় যৌবন—

'কেমনে সন্ন্যাস ধর্ম্ম হবেক রক্ষণ।
নিরন্তর ইহাকে আমি বেদান্ত শুনাইব
বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব।'

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৬ষ্ঠ অঃ)

এইখানে বৃন্দাবনদাস হইতে কবিরাজ গোস্বামী একেবারে বিপরীত কথা বলিলেন।

আমরা দেখিয়াছি বৃন্দাবনদাস সার্ব্বভৌমকে শাঙ্কর বেদান্তের অদ্বৈতমার্গের অতিশয় বিরোধী করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। আর এখানে কবিরাজ গোস্বামী সার্ব্বভৌমকে শাঙ্কর বেদান্ত পথে অদ্বৈতমার্গী

বলিয়া চিত্রিত করিলেন। একি সঙ্গে অদ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদ-বিরোধী হওয়া সার্ব্বভৌমের পক্ষে সম্ভব নয়। আরো বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা সম্পূর্ণ জানিয়া শুনিয়াও এই বিরোধীতা করিলেন। নিশ্চয় ইহার কোন কারণ ছিল। কী সে কারণ?

তারপর সত্যসত্যই সার্ব্বভৌম প্রভুকে বেদান্ত পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। এখানে বেদান্ত অর্থই শঙ্করপন্থী অদ্বৈত বেদান্ত বুঝিতে হইবে। সেই অর্থেই ইহার উল্লেখ হইয়াছে।

বেদান্ত পড়াতে তবে আরম্ভ করিলা।

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৬ষ্ঠ অঃ)

সার্ব্বভৌম বলিলেন—

বেদান্ত শ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ।

বৃন্দাবনদাস এই বেদান্ত পাঠ ও বেদান্ত শ্রবণের কথা কিছুই লেখেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে, প্রভু সার্ব্বভৌমের নিকট ভাগবত পাঠ শুনিতে চাহিয়াছিলেন।

তোমার মুখেতে শুনিবাঙ ভাগবত।

বলা বাহুল্য, শঙ্করাচার্য্য ভাগবতের ভাষ্য করেন নাই। কেননা ভাগবতের অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্য দেহরক্ষা করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী ষট্-সন্দর্ভে এই ভ্রম করিয়া, কেন শঙ্করাচার্য্য ভাগবতের ব্যাখ্যা করেন নাই তার জন্য কল্পিত কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উপনিষদ আর তার শাঙ্কর ভাষ্য বেদান্ত নামে আখ্যাত। আর ভাগবত পুরাণ! ভাগবতকে বেদান্তের ভাষ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন শ্রীজীব গোস্বামী। কিন্তু তাহা মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরে।

সাতদিন পর্য্যন্ত এইরূপ বেদান্ত শ্রবণের পর প্রভু কিছুই বলেন না, কেবল মৌন হৈয়া শুনেন। অষ্টম দিবসে সার্ব্বভৌম প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি—

বুঝ কি-না বুঝ ইহা জানিতে না পারি।

প্রভু কহিলেন—আমি মূর্খ, শুধু সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বলিয়া শ্রবণ মাত্র করি—

তুমি যেই অর্থ কর বুঝিতে না পারি,
প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল,
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল।
ভাষ্য কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া,
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ,
স্বকল্পিত ভাষ্য মেঘে কর আচ্ছাদন।

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৬ষ্ঠ অঃ)

এখানে কবিরাজ গোস্বামী সার্ব্বভৌমকে স্পষ্টই শাঙ্কর বেদান্তী চিত্রিত করিয়া প্রভুকে দিয়া শাঙ্কর বেদান্ত খণ্ডন করাইতেছেন। বৃন্দাবনদাস ঠিক ইহার উল্টা করিয়াছেন।

তারপর আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যাও কবিরাজ গোস্বামী, বৃন্দাবনদাসকে অনুসরণ করিয়া করাইলেন। সার্ব্বভৌম নয় প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন, আর প্রভু অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। সার্ব্বভৌম আশ্চর্য্য হইলেন এবং প্রভুকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জানিয়া নিজেকে ধিক্কার দিলেন। ঠিক এই সময়—

কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন।
নিজরূপ প্রভু তারে করাইল দর্শন
চতুর্ভুজ রূপ প্রভু হইলা তখন।
দেখাইলা তাঁরে আগে চতুর্ভুজ রূপ
পাছে শ্যামবংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ।

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৬ষ্ঠ অঃ)

ইহা বৃন্দাবনদাস দেখান নাই। বৃন্দাবনদাস চতুর্ভুজ এবং পরে শ্যামবংশীমুখ, অতএব দ্বিভূজ দেখান নাই। তিনি ষড়ভূজ দেখাইয়াছেন। নবদ্বীপে অদ্যাপি বৃন্দাবনদাসবর্ণিত ষড়ভূজ মহাপ্রভুর শ্রীমুর্ত্তিই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ঐতিহ্যই চলিয়া আসিতেছে। কবিরাজ গোস্বামী সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে, ইচ্ছা করিয়াই, বৃন্দাবনদাস হইতে ভিন্ন বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

লোচনও ষড়্ভূজ দেখাইয়াছেন এবং ষড়্ভূজের একটা ব্যাখ্যাও দিয়াছেন—

হেনই সময়ে প্রভু ষড়্ভূজ শরীর
দেখিয়া ত সার্ব্বভৌম আনন্দে অস্থির।
উর্দ্ধ দুই করে ধরে ধনু আর শর
মধ্য দুই করে ধরে মুরলী অধর।
নম্র দুই করে ধরে দণ্ড কমুণ্ডল
দেখি সার্ব্বভৌম হৈলা প্রেমায় বিহ্বল।

(চৈঃ মঃ, মধ্য—শেষ পৃষ্ঠা)

রামলীলাতে ধনুকধারী, কৃষ্ণলীলায় বংশীধারী, গৌরলীলায় করঙ্গধারী—ইহাই ষড়্ভূজের প্রচলিত ব্যাখ্যা। ষড়্ভূজের অন্য রকম ব্যাখ্যাও আছে।

প্রভুর ষড়্ভূজ আর চতুর্ভূ্জ এবং 'পাছে শ্যামবংশীমুখ দ্বিভূজ'—ইহার মধ্যে দুইটি বিভিন্ন যুগ ও বিভিন্ন স্থানের ব্যবধান রহিয়াছে। বৃন্দাবনদাস যখন গৌড়ে বসিয়া গ্রন্থ লেখেন তখন বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সিদ্ধান্ত-সকল লিপিবদ্ধ হয় নাই: সুতরাং ১৬১৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গৌড়ে তাহা আসে নাই। আর যদি বা আসিত, তাহা হইলেও বৃন্দাবনদাস তাহা গ্রহণ করিতেন কি-না সন্দেহ। কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনে বসিয়া গোস্বামীদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃন্দাবনদাসের পরে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সম্ভবতঃ ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। শ্রীচৈতন্য অবতারের ব্যাখ্যা সম্পর্কে গৌড়ীয় আর বৃন্দাবনের গোস্বামী সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ এক নহে। বৃন্দাবনদাস প্রচার করিয়াছেন গৌড়ীয় ব্যাখ্যা, আর কবিরাজ গোস্বামী প্রচার করিয়াছেন বৃন্দাবনীয় ব্যাখ্যা। গৌড়ীয় ব্যাখ্যায় শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণের অবতার, অতএব তিনি নিজেই উপাস্য—যিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ, আবার তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। বৃন্দাবনীয় ব্যাখ্যায় শ্রীচৈতন্যকে অবলম্বন করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলিত পরমরূপ উপাস্য বলা হইয়াছে। উপাসনার অবলম্বন আর উপাস্য, এ দুইয়ে পার্থক্য আছে।

নবম বক্তৃতা

[শ্রীচৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ—বিভিন্ন গ্রন্থের বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য। রামানন্দের সহিত সাক্ষাতের মূল কোথায়? শ্রীচৈতন্য অবতারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রামানন্দ রায়ের নূতন ব্যাখ্যা কী? রামানন্দ রায় ঐ ব্যাখ্যা কোথায় পাইলেন? নবদ্বীপের ভক্তমণ্ডলীতে রামানন্দের ব্যাখ্যা তখন সম্পূর্ণ অবিদিত। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণান্তর বোম্বাই প্রদেশে ভ্রমণের উদ্দেশ্য কী? শ্রীচৈতন্যদেব সমাজসংস্কারক ছিলেন কি-না? নীলাচলে পুনরাগমন।]

সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য এইবার দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বাহির হইতেছেন। তিনি মাত্র দুই মাস হইল সন্ন্যাসী হইয়াছেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মাঘ কাটোয়াতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। ফাল্গুনের শেষে নীলাচলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। চৈত্র মাসে বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিয়াছেন। এখন বৈশাখ প্রথমে দাক্ষিণাত্য গমন করিতেছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে প্রেরণা অথবা উত্তেজনার বশে তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন তাহা তাঁহাকে বদ্ধদরজায় ধ্যানের আসনে আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। তিনি মত্ত সিংহ-প্রায় গতিতে ছুটিয়াছেন। তিনি পাতঞ্জল নির্দ্দিষ্ট সমাধির উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই; কলির জীবকে—বিশেষতঃ স্ত্রী, শূদ্র, মূর্খ আদিকে—উদ্ধার করিবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের উদ্দেশ্য, ঐ সকল দেশের লোকদের মধ্যে তাঁহার প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার। ২৪ বৎসর বয়সের কোন বাঙ্গালী যুবক ইতিপূর্ব্বে ইতিহাসে এরূপ গৌরবময় দুঃসাহসের কার্য্য করেন নাই। কাটোয়া হইতে পুরী—পুরী হইতে রামেশ্বর সেতুবন্ধ—পুনরায় বোম্বাই প্রদেশের দ্বারকা, সোমনাথ প্রভৃতি তীর্থে তিনি ঝড়ের মত প্রবাহিত হইয়া ছুটিয়াছেন। এই ঝটিকা-গতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

গোবিন্দের কড়চা বলিতেছে, পুরীতে তিনি তিনমাস ছিলেন—ফাল্গুনের শেষ, চৈত্র ও বৈশাখের প্রথম ভাগ। মাস গণনায় তিনমাসই হয়, কিন্তু দিন গণনায় ছয় সপ্তাহের বেশী হয় না। অর্থাৎ পুরীতে অবস্থান দেড় মাসের বেশী কিছুতেই নয়। কবি কর্ণপুর বলেন, পুরীতে মাত্র ১৮ দিন

ছিলেন। এ কথায় নির্ভর করা যায় না। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন যে, বৈশাখের প্রথমে তিনি পুরী ত্যাগ করেন। গোবিন্দের কড়চায় বলে, ৭ই বৈশাখ তিনি পুরী ত্যাগ করেন। এখানে তারিখ সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী অপেক্ষা গোবিন্দ অধিকতর নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। তীর্থ-ভ্রমণ ও প্রচার শেষ করিয়া আবার যখন সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য পুরীতে ফিরিলেন, তখনও কবিরাজ গোস্বামী কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ দেন নাই। কিন্তু গোবিন্দ দিয়াছেন—১৫১২ খৃষ্টাব্দে, মাঘের তৃতীয় দিনে "গোঁরা রায় পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন"। সুতরাং এই ভ্রমণ ও প্রচারে তাঁহার ১ বৎসর ৮ মাস ২৬ দিন অতিবাহিত হইল। ভ্রমণের কাল ১৫১০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে ১৫১২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত।

কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে দিয়া বলাইয়াছেন—

সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে॥

* * *

বিশ্বরূপ উদ্দিশ্যে অবশ্য আমি যাব।
একাকী যাইব কাহ সঙ্গে না লইব॥
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ।
নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবৎ॥
বিশ্বরূপ সিদ্ধপ্রাপ্তি জানেন সকল।
দক্ষিণ দেশ উদ্ধারিতে করে এই ছল॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৭ম পঃ)

বিশ্বরূপের অন্বেষণে যাওয়ার কথা কেবল এক কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, অপর কেহ লেখেন নাই। তবে একথা সত্য যে, বিশ্বরূপ সন্ন্যাসের পর শঙ্করারণ্য নাম গ্রহণ করিয়া দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন এবং অতি অল্পদিন পূর্ব্বেই বোম্বাই-এর অন্তর্গত পাণ্ডুপুর তীর্থে—যেখানে বিট্ঠল দেবের মন্দির আছে, সেই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধি প্রাপ্তি হইয়াছে; অর্থাৎ তিনি দেহ রক্ষা করিয়াছেন। আরেকটি লক্ষ্য করিবার বিষয়, প্রভু নবদ্বীপের কোন ভক্তকেই সঙ্গে লইতেছেন না। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলেন, প্রভু তাহাকেও অনুমতি দেন নাই।

এখন প্রশ্ন—প্রভুর সঙ্গে কে গেল ? কবিরাজ গোস্বামী বলেন, কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণ জলপাত্র ও বহির্বাস বহিবার জন্য সঙ্গে গিয়াছিল। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের অনুরোধে প্রভু ইহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। গোবিন্দের কড়চায় বলে যে—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ কৃষ্ণদাসের কথা ঠিকই বলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভু তাহাতে সম্মত হন নাই। কড়চায় লিখিয়াছে—প্রভু “বারণ করিলা”। আর এক তৃতীয় মত আছে যে, কৃষ্ণদাস গোদাবরী তীর পর্য্যন্ত সঙ্গে গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। এক গোবিন্দই আগাগোড়া সঙ্গে ছিল। এই ঘটনার ১০৪ বৎসর পরে কবিরাজ গোস্বামী লোকপরম্পরা শুনিয়া লিখিয়াছেন, এবং কোন প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হইতে ইহা তিনি শুনেন নাই। প্রভুর দেহরক্ষার পর (১৫৩৩ খৃঃ) এবং প্রতাপরুদ্রের দেহরক্ষার পূর্ব্বে (১৫৩৯।৪০ খৃঃ) কবি কর্ণপুর চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক লেখেন। কবিরাজ গোস্বামী এই সব ক্ষেত্রে কবি কর্ণপুরকে অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু কবি কর্ণপুর কৃষ্ণদাসের সঙ্গে যাইবার কথা লেখেন নাই। অন্যান্য চরিতগ্রন্থেও কৃষ্ণদাসের উল্লেখ নাই।

বৃন্দাবনদাস প্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ আদৌ বর্ণনা করেন নাই। শুধু এক ছত্রে ইহার উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন—

শেষখণ্ডে সেতুবন্ধে গেলা গৌররায় ॥

(চৈঃ ভাঃ, আদি—১ম অঃ)

শেষখণ্ডে অনেক কথাই বৃন্দাবনদাস লেখেন নাই। নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া তিনি প্রভুর লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। নবদ্বীপের ভক্তমণ্ডলীর সহিত লীলার যে অংশ জড়িত নয়, তাহা তিনি বাদ দিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী বলেন, চৈতন্যলীলার আদি ব্যাস বৃন্দাবনদাসের নিকট লীলার সমস্ত ভাণ্ডারই উন্মুক্ত ছিল ; তিনি কিছু গ্রহণ করিয়াছেন এবং কিছু গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং ইচ্ছা করিয়াই বাদ দিয়াছেন। ইহাতে নবদ্বীপের ভক্তমণ্ডলীর সহিত সংশ্লিষ্ট উপাখ্যান যেরূপ নিপুণ হস্তে নিখুঁত ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, সেইরূপ সমস্ত জীবনচরিত সমগ্রভাবে পরিস্ফুট হয় নাই। বৃন্দাবনদাসের অঙ্কিত শেষ খণ্ড অসম্পূর্ণ। এবং ইহা সম্পূর্ণ করিবার জন্যই কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য চরিতামৃত লিখিবার

প্রয়োজন হইয়াছিল। প্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ও প্রচার একটি স্মরণীয় ইতিহাস। যে গ্রন্থে ইহার বর্ণনা নাই সে গ্রন্থকে অসম্পূর্ণ জীবনচরিত না বলিয়া উপায় কি? এই একই কারণে, বৃন্দাবনদাস রামানন্দ-মিলন ও রূপ-সনাতন শিক্ষা সবিস্তারে বর্ণনা করেন নাই।

জয়ানন্দ অতি সংক্ষেপে গৌরাঙ্গের দক্ষিণযাত্রা শেষ করিয়াছেন। প্রভু বিজয়ানগর দিয়া গোদাবরী, কাবেরী নদী পার হইয়া সেতুবন্ধ গিয়াছিলেন। পুরী গোঁসাই ও রামানন্দের সহিত প্রভুর মিলন হইয়াছিল। ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। "গৌরাঙ্গ চলিলা সেতুবন্ধে"—এই পর্য্যন্ত।

লোচন লিখিয়াছেন, "সেতুবন্ধ দেখিবারে চলিলা ঠাকুর"। বৃন্দাবন-দাসও লিখিয়া গিয়াছেন "সেতুবন্ধে গেলা গৌররায়'। লোচন লিখিয়াছেন যে, পঞ্চবটী দেখিয়া প্রভু প্রেমে অচেতন হইয়াছিলেন। কাবেরী নদীর তীরের শ্রীরঙ্গনাথ দেখিয়াছিলেন। সেখানে চাতুর্মাস্য করিয়াছিলেন। পরমানন্দ পুরীর সহিত প্রভুর দেখা হইয়াছিল। তারপর সেতুবন্ধ গিয়া রামেশ্বর লিঙ্গকে বার বার প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈষ্ণবতা শৈব ভাবকে কুত্রাপি বর্জ্জন করে নাই। লোচন প্রথমেই জিয়ড় পর্ব্বতের নৃসিংহ সম্পর্কে এক গল্প রচনা করিয়াছেন। রামানন্দ-মিলনে লোচন লিখিয়াছেন—

পুনর্ব্বার হইলা প্রভু শ্যাম কলেবর।
ত্রিভঙ্গ মুরলীমুখ বর পীতাম্বর॥
রাধা বামে পরমসুন্দরী মহামতি।
চৌদিকে বেঢ়িয়া গোপী বরাঙ্গ যুবতী॥

(চৈঃ মঃ—শেষ খণ্ড)

ইহা যদি কবিরাজ গোস্বামীর ভাব লইয়া পরে লোচনে প্রক্ষিপ্ত না হইয়া থাকে, তবে ইহা কবিরাজ গোস্বামীর রামানন্দ-মিলনের পূর্ব্বাভাস স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু আমার ধারণা, লোচনে ইহা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। লোচনে এইরূপ বহু প্রক্ষিপ্ত আছে।

গোবিন্দের কড়চায় প্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আদ্যোপান্ত বর্ণিত হইয়াছে। গোবিন্দ এই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে আগাগোড়াই

সঙ্গে ছিলেন বলিয়া দাবী করেন। সুতরাং ইহা প্রতক্ষ্যদর্শীর বর্ণনা। এবং এই বর্ণনা ১৫১২ খৃষ্টাব্দে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। পরে এই কড়চার অনুলিপি যাহারা করিয়াছিলেন, তাহাদের হাতে পরিয়া চৈতন্য চরিতামৃত হইতে কড়চায় অনেক কিছু কাঁচা হাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। তথাপি কড়চার বর্ণনা কোন মিথ্যা ঘটনা বা ইতিহাসের বর্ণনা নহে। ইহা একটি সত্য ইতিহাসকেই লিপিবদ্ধ করিয়াছে—তাহা যে-ই করিয়া থাকুক এবং যবেই করিয়া থাকুক। বিশেষতঃ ইহা প্রতক্ষ্যদর্শীর বর্ণনা বলিয়া যথেষ্ঠ আভ্যন্তরিক প্রমাণ আছে। সমস্ত কড়চাখানি মিথ্যা বা জাল বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা যুক্তিযুক্ত নয়।

কবিরাজ গোস্বামী এই কড়চা দেখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না, কোন প্রমাণ নাই। এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণিত চিত্র অপেক্ষা কড়চার বর্ণিত চিত্র কিছুটা ভিন্ন। পাঠ করিলেই বুঝা যায়। (কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় ঈশ্বরভাবের প্রাবল্য খুব বেশী। আবার কড়চায় ঈশ্বরভাব রক্ষিত হইয়াও মানবীয়ভাব সহজ, সরল ও স্বাভাবিকতায় বেশী ফুটিয়াছে। কড়চার বর্ণিত শ্রীচৈতন্য চিত্রের ইহা একটি বিশেষত্ব। ভক্তের মনে কড়চার চরিতচিত্র যদি কোনস্থানে আঘাতও দিয়া থাকে তথাপি ঐতিহাসিক অথবা সাহিত্যিকের নিকট কড়চার চিত্র উপেক্ষিত হইবে না, বরং আদরনীয়ই হইবে। প্রত্যেক চরিতগ্রন্থেই চরিত্র-চিত্র অঙ্কনে বিশেষত্ব আছে। কড়চাতেও বিশেষত্ব আছে।

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

যেসময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
তখনে প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে॥
যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়নগরে।
অতএব প্রভু নাহি দেখিলা সেবারে॥

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—২য় অঃ)

সেতুবন্ধ হইতে ফিরিবার পর (১৫১২ খৃঃ) প্রতাপরুদ্রের সহিত প্রভুর প্রথম মিলন হয়।

আমরা এক্ষণে কবিরাজ গোস্বামীকেই অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতেছি।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যাইবেন শুনিয়া সার্ব্বভৌম প্রভুকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। "দিন পাঁচ" প্রভু সার্ব্বভৌমের বাড়ী থাকিয়া সার্ব্বভৌমের ব্রাহ্মণী যাঠীর মাতার উত্তম রন্ধনে ভোজন করিয়া নীলাচল পরিত্যাগ করিলেন। সার্ব্বভৌম পরিবারের সহিত প্রভুর ঘনিষ্টতা প্রথম দর্শন হইতে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সার্ব্বভৌম প্রভুকে বলিলেন—

রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী তীরে।
অধিকারী হয়েন তিঁহো বিদ্যানগরে॥
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তিঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম॥
পাণ্ডিত্য ও ভক্তিরস দুঁহের তিঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥
অলৌকীক বাক্য চেষ্টা তার না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া॥
তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তাঁর তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তার যেমন মহত্ত্ব॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৭ম পঃ)

প্রভুর সহিত রামানন্দ রায়ের মিলন এক অতি স্মরণীয় ঘটনা। সার্ব্বভৌম ইহার সূত্রপাত করিয়া দেন। প্রভু গোদাবরী তীরে আসিয়া, বসিয়া নামসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রামানন্দ দোলায় চড়িয়া স্নান করিতে আসিলেন। সঙ্গে বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন তর্পন করাইতে। বাদকেরা বাজনা বাজাইতেছে। স্নান শেষ হইল। রায় প্রভুকে দেখিলেন।

সূর্য্যশতসম কান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ পদ্মলোচন॥
দেখিয়া তাহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥

উঠি প্রভু কহে উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।
তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ॥
তথাপি পুছিল তুমি রায় রামানন্দ।
তিঁহো কহে হই মুঞি দাস শূদ্র মন্দ॥
তবে তারে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্য দোহে অচেতন॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৭ম পঃ)

এদিকে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা ভাবিতে লাগিলেন—

এইত সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন॥
এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য— ৮ম পঃ)

প্রভু রায়কে বলিলেন যে—সার্ব্বভৌম তোমার গুণের কথা সমস্তই আমাকে বলিয়াছে এবং তোমাকে মিলিবার জন্য বিশেষ করিয়া আমাকে বলিয়া দিয়াছে। তোমাকে মিলিবার জন্যই আমার এখানে আগমন। ভাল হইল, অনায়াসেই তোমার দর্শন পাইলাম। রায় কহিলেন—সার্ব্বভৌমের কৃপায় তোমার দর্শন পাইলাম, আজ আমার মনুষ্যজন্ম সফল হইল।

সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিহ্ন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তার প্রেমাধীন॥
কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজসেবক বিষয়ী শূদ্রাধম॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয়।
তোমার কৃপায় তোমায় করায় সদয়॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৮ম পঃ)

প্রভু কহিলেন, "তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন"। ব্যবস্থা হইল। সন্ধ্যা আগত। প্রভু সন্ধ্যাস্নানকৃত্য করিয়া বসিয়া আছেন এমন সময় রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণকর্ম্মার্পণ সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্ম ত্যাগ ভক্তি সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্যপ্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তভাব সর্ব্ব সাধ্য সার॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৮ম পঃ)

ভগবান আমার কান্ত, প্রিয়তম—এইভাবে তাহাকে ভজনা করিবে। এবং এই ভজনই শ্রেষ্ঠ। পরে রসতত্ত্বের সাধনাঙ্গে একটি বিশ্লেষণমূলক বিচার ও মীমাংসা হইল। রায় কহিলেন—

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়॥
কিন্তু যার যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তারতম॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে সর্ব্বরসে।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
যদ্যপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবী সঙ্গে তার বাড়য়ে মাধুর্য্য॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৮ম পঃ)

যার যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম। সুতরাং সকলকেই মধুর রসের ভজন করিতে বলা হইল না। রসের ভজনে অধিকারী ভেদ আছে।

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিনে নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৮ম পঃ)

রায় আশ্চর্য্য হইলেন। এতদিন ধরিয়া রসের ভজন তিনি করিতেছেন, কিন্তু এর পরেও জিজ্ঞাসা করিতে পারে এমন লোক পৃথিবীতে আছে তিনি ভাবিতেও পারেন নাই। রায় কহিলেন—

ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের নাহিক উপমা।

রায়ের কথায় প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন; বলিলেন যেজন্য তোমার কাছে আসা তা আমার সার্থক হইল। কৃপা করিয়া আর একটু বল—কৃষ্ণের স্বরূপ কী, রাধার স্বরূপ কী; রস কোন তত্ত্ব, প্রেম কোন তত্ত্ব-রূপ ?

রায় একে একে সব কথারই উত্তর দিলেন। শ্রীজীবের ষট্‌-সন্দর্ভের ও শ্রীরূপের রসতত্ত্বের মতানুযায়ী, কবিরাজ গোস্বামী রায়ের মুখ দিয়া সব কথা বলাইলেন। রায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—এ উত্তম, আর একটু আগে বল—

প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর।
রায় কহে ইহা বই বুদ্ধি-গতি নাহি আর॥

প্রভু স্পষ্টই শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্ভোগের বর্ণনা শুনিতে অভিলাষী।

রায় কহিলেন, এর পরে আর কথা চলেনা ; প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের এক গীত আমি রচনা করিয়াছি, তাতে তোমার সুখ হয় কি না-হয় জানি না। যদি বল, তবে গাই। রায় গাহিলেন—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥—ইত্যাদি

জয়দেববর্ণিত সম্ভোগের দৈহিক বর্ণনা ছাড়িয়া, মনোরাজ্যে রায় বিলাসবিবর্ত্তকে প্রতিষ্ঠা করিলেন। জয়দেব অপেক্ষা রায়ের এইখানে উৎকর্ষ ও কৃতিত্ব।

প্রভু ধৈর্য্য ধরি এই গীত শুনিতে পারিলেন না। রাধা-প্রেমের আবেশ হইল। তিনি গান বন্ধ করিবার জন্য হাত দিয়া রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন—

প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল।

তারপর রায় বলিলেন যে—মধুর রসের অবলম্বন হইতেছে রাধাকৃষ্ণলীলা। দাস্য-বাৎসলাদি রসে এই লীলার স্বাদ পাওয়া যায় না। কেবল সখিগণের ইহাতে অধিকার। সখীরাই এই লীলা পরিপুষ্ট করে, বিস্তার করে—এই লীলার মাধুরী আস্বাদন করে। রাধাকৃষ্ণ যে কুঞ্জে বিহার করেন, সেই কুঞ্জ সেবার অধিকার একমাত্র সখীগণেরই আছে। অন্যান্য রসের অধিকারী যে ভক্তগণ, তাদের এই সর্ব্বোচ্চ অধিকার নাই।

রায় এক্ষণে সখীর স্বভাব সম্বন্ধে প্রভুকে বলিতেছেন—

সখীর স্বভাব এই অকথ্য কথন।
কৃষ্ণ সহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন ॥
কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজসুখ হৈতে তাতে কোটি সুখ পায় ॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেম কল্প-লতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥
কৃষ্ণ লীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সুখ হইতে পল্লবাদ্যের কোটী সুখ হয় ॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৮ম পঃ)

রায় আরো বিস্তার করিয়া বলিতেছেন—

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥
নানা ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মসুখসঙ্গ হৈতে কোটী সুখ পায়॥

*

সহজে গোপীর প্রেম, নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম॥
সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদ ধর্ম্ম ত্যজি সে কৃষ্ণকে ভজয়॥
রাগানুগা মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাব-যজ্ঞ দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষৎ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাহাঞি সেবন।
সখী ভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
গোপী-অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিলা ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৮ম পঃ)

রায়ের কথা শুনিয়া প্রভু পরম পরিতুষ্ট হইলেন। কেননা—

এতশুনি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে গলাগলি করেন ক্রন্দন॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৮ম পঃ)

মহাপ্রভুচিহ্নিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্ম্মকথা আমরা রায় রামানন্দের কথোপকথনে স্পষ্টরূপে জানিতে পারিলাম, এবং এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিতরকার কথা—তত্ত্ব কথা।

ইহার পর রায় প্রভুর রূপান্তর দেখিতে পাইলেন। প্রভুর আর সন্ন্যাসীমূর্ত্তি নাই। তার পরিবর্ত্তে শ্যামগোপরূপ দেখিতেছেন। অথচ গৌর কান্তিতে সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা। কাজেই রায় জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহার অর্থ কি? প্রভু প্রথমে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, রাধাকৃষ্ণে তোমার প্রেম অত্যন্ত গাঢ়। আর প্রেমের এই স্বভাব যে, স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি বাহ্য বস্তুতে প্রেমাস্পদকেই সে সর্ব্বক্ষণ দেখে।

শ্রীরাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়।

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৮ম পঃ)

রায় সন্তুষ্ট হইলেন না। বলিলেন, তুমি আমার সঙ্গে চাতুরী করিতেছ।

রায় কহে প্রভু মোরে ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজ রূপ না করিহ চুরি॥
শ্রীরাধার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥
নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
আনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৮ম পঃ)

ধরা পড়ার পর আর চাতুরী চলে না।

তবে হাসি তারে প্রভু দেখাল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৮ম পঃ)

রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপং।

একাধারে এই অভেদাত্মক যুগলরূপ দেখিয়া রায় উন্মত্তের মত ধরিতে গেলেন। কিন্তু পারিলেন না। মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু তাহাকে স্পর্শ করিয়া চেতন করিলেন এবং সেই সঙ্গে বলিলেন—

গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্র সুত বিনা তিঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥
তার ভাবে ভাবিত করি আত্মমন।
তবে কৃষ্ণমাধুর্য্য-রস করি আস্বাদন॥
(চৈঃ চঃ, মধ্য—৮ম পঃ)

রায় যাহা সন্দেহ করিয়াছিলেন—প্রভু তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন।

প্রভু যখন রায়ের মুখে কৃষ্ণ-কথা শুনিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন রায় কিঞ্চিৎ কুণ্ঠা প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই। কেননা, তিনি শূদ্র আর বিষয়ী অর্থাৎ গৃহী। অন্যদিকে প্রভু শুধু ব্রাহ্মণ নন্—সন্ন্যাসী। রায় রামানন্দ বাঙ্গালী কায়স্থ বলিয়া শুনা যায়।

রায়ের মুখে নিজের স্তব শুনিয়া প্রভু বলিলেন—আমাকে সন্ন্যাসী জানিয়া তুমি অনর্থক স্তবস্তুতি কর কেন? আর নিজেকে শূদ্র ভাবিয়াই বা সঙ্কোচ কর কেন?

তোমারি ঠাঞি আইলাম মহিমা শুনিয়া।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া॥
কিবা বিপ্র, কিবা 'ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়?
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥
সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
কৃষ্ণরাধা-তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন॥
(চৈঃ চঃ, মধ্য—৮ম পঃ)

শূদ্র যদি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হয় তবে তিনি অবশ্যই গুরু হইতে পারিবেন। রায়কে প্রভু নিজে গুরুর আসন দিতেছেন। রায় বলিলেন—

রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি।
তুমি যেই কহাও সেই কহি বাণী॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকপাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট॥

হৃদয়ে প্রেরণ কর, জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভাল-মন্দ কিছুই না জানি॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৮ম পঃ)

সখীভাব একটা নূতন কথা। রায় ইহা আমাদিগকে প্রথম শুনাইলেন। মহাপ্রভুও, কবিরাজ গোস্বামীর মতে, এই সখীভাবের তত্ত্বকথা মানিয়া লইলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে কিম্বা বিষ্ণু, হরিবংশ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আমরা বৃন্দাবনের যে গোপিনীদের পাই—রায় কথিত এই সখীতত্ত্ব তাহা হইতে ভিন্ন। এখন প্রশ্ন—রায় ইহা পাইলেন কোথায়? ইহা কি সহজিয়া মত? সহজিয়া হইলে, ইহা কোন্ সহজিয়া—বৌদ্ধ না বৈষ্ণব?

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৮ম পঃ)

(আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥)

(চৈঃ চঃ, আদি—৪র্থ পঃ)

কাম হইতে প্রেম ভিন্ন। "কামদাবানল রতি সে শীতল" (সহজিয়া চণ্ডীদাস)—সহজ মতে কাম আর রতি ভিন্ন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন যে—"ইহারা (বৌদ্ধ সহজিয়ারা) যে সহজ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সে ধর্ম্ম এখনও চলিতেছে। তবে ইহার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। তখন সহজিয়ারা আপনারাই সহজভাবে মত্ত থাকিতেন। এখন সহজিয়ারা দেবতাদের সহজ ভাবে ভোর হইয়া থাকেন। তখন তাঁহারা নিজেরাই যুগনদ্ধ ক্রীড়া করিতেন। এখন তাঁহারা দেবতাদের যুগনদ্ধ ক্রীড়া দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করেন"—("নারায়ণ", সম্পাদক শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ, ১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩২২ সাল—পৃঃ ১০৬৭)।

দেবতাদের যুগনদ্ধ ক্রীড়া দেখিয়া সহজ ভাবে ভোর হইয়া থাকার অর্থই তো রায়কথিত সখীভাব। সখীভাবে রায়ের মতে—"রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার", অথচ "কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন"।

শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুসরণ করিলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, রামানন্দ কথিত সখীভাব বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র। কিন্তু ইহা সামান্য

রূপান্তর নয়, যেহেতু বৌদ্ধ সহজিয়ারা নিজেরাই যৌন ক্রীড়ায় মত্ত। বৈষ্ণবেরা সখীভাবের সাধনায় নিজেরা যৌন ক্রীড়া হইতে সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত এবং দূরে অবস্থিত, এই কথাটার উপরেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

বৌদ্ধ সহজিয়া আর রায় কথিত সখীভাবে বিস্তর প্রভেদ—সামান্য প্রভেদ নয়। অতএব সিদ্ধান্ত—সহজ মত বৌদ্ধ হইতে বৈষ্ণবে আসিয়া রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে।

নবদ্বীপে শ্রীবাসের বাড়ীতে মহাপ্রভুর যে অবতারের অভিষেক হইয়াছিল, তাহা কৃষ্ণের অবতার। আচার্য্য অদ্বৈত মহাপ্রভুকে নবদ্বীপ লীলায় কৃষ্ণের অবতার করিয়াছিলেন। যবন হরিদাসও মহাপ্রভুকে কৃষ্ণের অবতার করিয়াছিলেন। নদীয়াবাসী লীলার সহচর ও সহচরীগণ মহাপ্রভুকে কৃষ্ণের অবতার করিয়া নিজেরা তদনুরূপ অবতার হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ বলরাম হইয়াছিলেন—গদাধর পণ্ডিত রাধিকা হইয়াছিলেন; কৃষ্ণ অবতারের উদ্দেশ্য ছিল, পাষণ্ডীদলন আর যবনরাজভীতি দুরীকরণ। অদ্বৈত শিব হইয়াছিলেন,—হরিদাস ব্রহ্মা হইয়াছিলেন,—বৃন্দাবনদাসের মাতা কৃষ্ণলীলার অম্বিকার ভগ্নী কিলিম্বিকাই গৌরাঙ্গ লীলায় নারায়ণী।

গোদাবরী তীরে মহাপ্রভুর অবতার কৃষ্ণ হইতে রাধিকার দিকে মুখ ফিরাইলেন। রামানন্দ-মিলনে দেখিতে পাই, তিনি রাধিকার অবতার—উদ্দেশ্য নিজরস আস্বাদন। দ্বাপরে কৃষ্ণ হইয়া রাধিকাকে যে প্রেমরস দিয়াছেন, সেই নিজের-দেওয়া রস গৌরাঙ্গ-অবতারে নিজে রাধিকা ভাবে ভাবিত হইয়া নিজে আস্বাদন করিবেন। নবদ্বীপের কৃষ্ণ অবতার অস্বীকার করিলে বিষম অসঙ্গতি দেখা দেয়। কাজেই সঙ্গতি রক্ষার জন্য রসরাজ ও মহাভাব, দুই একরূপ করা হইল। রসরাজ কৃষ্ণ, মহাভাব শ্রীরাধিকা; অন্তরকৃষ্ণ-বহির্গৌরাঙ্গ ইহাই চলিত কথা। কৃষ্ণ হইতে রাধিকায় রূপান্তর, নবদ্বীপ হইতে নীলাচল লীলায় মহাপ্রভুর ধর্ম্মজীবনে বিকাশ পথে এক অতি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। বৃন্দাবনদাস মহাপ্রভুর এই রাধিকাভাবটী তাহার এতবড় বৃহৎ গ্রন্থে আদৌ অঙ্কিত করেন নাই। কেননা ইহা শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রবর্ত্তিত তৎকালীন গৌড়ীয় ব্যাখ্যা নয়।

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ-মিলন কথা করিল প্রচারে॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৮ম পঃ)

স্বরূপ দামোদরের কড়চা একটি সম্পূর্ণ পৃথক গ্রন্থে আমি কোথাও দেখিতে পাই নাই। কবি কর্ণপুর, কবিরাজ গোস্বামী, এমন কি ভক্তি রত্নাকরেও—স্বরূপ দামোদরের কড়চা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকগুলির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। যদি পরবর্ত্তীয়দের দ্বারা এই শ্লোকগুলি মূল কড়চা হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও প্রমাণ হয়—দামোদর স্বরূপের একটি মূল সংক্ষিপ্ত কড়চা গ্রন্থ ছিল। "স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা, রঘুনাথ বৃত্তিকার"। রঘুনাথের নিকট হইতেই কবিরাজ গোস্বামী, স্বরূপের কড়চা সম্পর্কে সমস্ত জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু রামানন্দ-মিলনের বেশীর ভাগ কথা কবিরাজ গোস্বামী কবি কর্ণপুরের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য ও শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক হইতে অবিকল বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন। ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁহার অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ 'শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান' গ্রন্থে (৩৩২-৩৪১ পৃঃ) ইহা অতি নিপুণভাবে আক্ষরিক মিল দেখাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন। অথচ বিনয়ী বৈষ্ণব কবিরাজ গোস্বামী কবি কর্ণপুরের নিকট এই ঋণ কুত্রাপি স্বীকার করেন নাই। এজন্য ডাঃ মজুমদার মনক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। কবি কর্ণপুরের নাম অনুল্লেখের কারণ আমরাও খুজিয়া পাইতেছি না। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা আবশ্যক—কবিরাজ গোস্বামী রামানন্দ-মিলনে সখী ভাবের যে অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা তিনি কবি কর্ণপুর হইতে গ্রহণ করেন নাই। সখীভাব শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণেও নাই। ইহা কবিরাজ গোস্বামীর নূতন কথা—নূতন তত্ত্ব-কথা।

গোবিন্দের কড়চায় রামানন্দ-মিলন চৈতন্য চরিতামৃত হইতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। রায় যখন প্রভুর চরণে পতিত হইলেন তখন চৈতন্য চরিতামৃত বলে—"উঠি প্রভু কহে, উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ"। কড়চায় বলে—"প্রভু কহে রায় তুমি কহ কৃষ্ণ কথা"।

প্রভু যখন রায়কে কৃষ্ণের স্বরূপ ও রাধার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন চৈতন্য চরিতামৃত বলে—

রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি।
তুমি যেই কহাও সেই কহি বাণী॥

*　　*　　*

হৃদয়ে প্রেরণ কর জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৮ম পঃ)

কড়চায় বলে—

রায় বলে প্রভু মুঞি কিছুই না জানি।
তুমি না বলালে মোরে নাহি সরে বাণী॥

*　　*　　*

হৃদয়ে থাকিয়া তুমি সমস্ত পড়াও।
মূকজনে কৃপাকরি বাচাল করাও॥

(গোঃ কঃ—২১ পৃঃ)

"কৃষ্ণ", "কৃষ্ণ"—"রায় বলে", "রায় কহে"—"আমি কিছুই না জানি", "মুঞি কিছুই না জানি"—"বাণী", "বাণী"—"হৃদয়", "হৃদয়" ইত্যাদি।

গোবিন্দ যখন প্রভুকে নীলাচলে ফিরাইয়া আনিলেন, তখন সার্ব্বভৌমকে দিয়া বলাইলেন—

যে না বুঝে তার কাছে কর ভারিভুরি।
মোর কাছে নিজরূপ না করিহ চুরি॥

*　　*　　*

তব বক্ষে স্বর্ণ পাঞ্চালিকা আছে লেখা।
যার তেজে কালরূপ নাহি যায় দেখা॥

(গোঃ কঃ—৮৫ পৃঃ)

কবিরাজ গোস্বামী রায় রামানন্দকে দিয়া বলাইয়াছেন—

রায় কহে প্রভু মোরে ছাড় ভারিভুরি।
মোর কাছে নিজরূপ না করিহ চুরি॥

তোমার সম্মুখে দেখ কাঞ্চন পাঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৮ম পঃ)

স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, চৈতন্য চরিতামৃত হইতে কড়চায় ইহা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অন্যথা এরূপ আক্ষরিক মিল সম্ভব নয়। গোবিন্দ, রায়ের কথা সার্ব্বভৌমকে দিয়া বলাইয়াছেন—এই যা।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন—"প্রাচীন হাতের লেখা পুঁথি (কড়চা) মুদ্রাযন্ত্রে উঠাইবার সময় দুই একটি শব্দ কমাইয়া বাড়াইয়া নিয়মিত করা হইয়াছে।" আমাদের ধারণা, বড় কাঁচা হাতে কাজটি হইয়াছে। তথাপি গোবিন্দের সমস্ত কড়চাটিকে উপেক্ষা করিবার মত দুঃসাহস আমার নাই। গোবিন্দের কড়চায় মানবীয় ভাবে যে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন একটি চরিতচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন লেখা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বাংলা সাহিত্যে চরিত শাখায় এই কড়চা জাল বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলে ঠিক কাজ করা হইবে না। বিশেষতঃ এই কড়চায় চরিতচিত্র অঙ্কন পদ্ধতি কিছু ভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে মিথ্যা ইতিহাস কিছু লিখিত হয় নাই। প্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ মিথ্যা ইতিহাস নয়।

গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দকে ছাড়িয়া প্রভু ত্রিমন্দ নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে বহু বৌদ্ধ বাস করে। বৌদ্ধরা আসিয়া প্রভুর সহিত ধর্ম্মের বিচার করিল। ঐ দেশের যে রাজা, তিনি মধ্যস্থ হইলেন। বৌদ্ধরা বিচারে পরাস্ত হইল।

রায়ের নিকট হইতে লইয়া বিদায়।
ত্রিমন্দ নগরে প্রভু প্রবেশ করয়॥
বহু বৌদ্ধ বাস করে ত্রিমন্দ নগরে।
আসিয়া মিলিল সবে গৌরাঙ্গ সুন্দরে॥
বৌদ্ধগণ সহ প্রভু বিচার করিলা।
ত্রিমন্দের রাজা আসি মধ্যস্থ হইলা॥

বৌদ্ধগণ বিচারেতে পরাস্ত মানিল।
পণ্ডিত দর্শক সবে হাসিতে লাগিল॥

(গোঃ কঃ—২৩ পৃঃ)

কবিরাজ গোস্বামী তীর্থগুলি কোন্‌টার পর কোন্‌টা, ঠিকমত বলিতে পারেন না। শুধু নাম মাত্র উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—

সেই সব তীর্থের ক্রম কহিতে না পারি।

* * *

অতএব নাম মাত্র করিয়ে গণন।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৯ম পঃ)

অতএব কেবল কবিরাজ গোস্বামীকে অনুসরণ করিলে তীর্থগুলির যথাযথ ভ্রমণতালিকা পাওয়া যাইবে না। গোবিন্দের কড়চায় ত্রিমন্দ নগরে প্রভু কর্ত্তৃক বৌদ্ধদিগের যে পরাজয়ের কথা আছে, কবিরাজ গোস্বামীও তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।

তর্কপ্রধান বৌদ্ধ শাস্ত্র নবমতে।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু না পারে স্থাপিতে॥

* * *

সব বৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৯ম পঃ)

মথুরা বা বৃন্দাবনের পথে মহাপ্রভু শুধু মুসলমান পাঠানদিগকেই বৈষ্ণব করেন নাই, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে তিনি বৌদ্ধদেরও বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। তাহার বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে, ভিন্ন ধর্ম্ম বা ভিন্ন জাতিকে বর্জ্জন করা হয় নাই। যেকোন ধর্ম্ম এবং যেকোন জাতির লোককে, স্ত্রী পুরুষ সমান অধিকার দিয়া বৈষ্ণব করিয়াছেন। ইহা শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষত্ব। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর গৌড় দেশে প্রচার আরম্ভের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের এই ঘটনা। সেতুবন্ধ যাইবার পথে প্রভু—

তার্কিক মীমাংসক যত মায়াবাদীগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম॥

নিজ নিজ শাস্ত্রোদ্‌গ্রাহে সবেই প্রচণ্ড।
সর্ব্বমত দুষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড॥

*　　　*　　　*

শিবকাঞ্চী আসিয়া কৈল শিব দরশন।
প্রভাতে বৈষ্ণব কৈল শাক্ত শৈবগণ॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৯ম পঃ)

তারপর কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি দরশন।
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৯ম পঃ)

গোবিন্দও শৃগালী-ভৈরবীর কথা লিখিয়াছেন, তা ছাড়া আর এক সিদ্ধেশ্বরী-ভৈরবীর কথা লিখিয়াছেন—যাহা কবিরাজ গোস্বামী লেখেন নাই। গোবিন্দ সিদ্ধেশ্বরী ভৈরবীর কথা কল্পনা করিয়া লিখিয়াছেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই—

(সিদ্ধেশ্বরী নামে এক ভৈরবী সুন্দরী।
তেজস্বিনী মহাতপা যেন মহেশ্বরী॥

*　　　*　　　*

শতবর্ষ বয়ঃক্রম হয়েছে তাঁহার।
তথাপি না চিনা যায় হেরিলে আকার॥
শৃগালী-ভৈরবী নামে আর এক মুরতি।
নদীর কুলেতে হয় তাহার বসতি॥
ভক্তি সহকারে করি শৃগালী দরশন।
কাবেরীর কুলে গেল শচীর নন্দন॥)

(গোঃ কঃ—৩৩ পৃঃ)

মহাপ্রভু হিন্দু ধর্ম্মের বিভিন্ন শাখার শৈব ও শাক্তদিগকে বৈষ্ণব করিতেছেন, অথচ তিনি শিব পূজাও করিতেছেন ও শক্তি মূর্ত্তির নিকটেও প্রণাম করিতেছেন। বিভিন্ন দার্শনিক পণ্ডিতদিগকেও তিনি তর্কে পরাস্ত করিয়া নিজের মতে আনয়ন করিতেছেন। ইহার পর যখন তিনি মথুরা

বৃন্দাবনের পথে মুসলমান পাঠানদিগকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন তখন তিনি কোরানকেই অবলম্বন করিয়া তর্ক ও বিচার করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে শাস্ত্রবিচারে নিমাই পণ্ডিত ঘোর তার্কিক অধ্যাপক ছিলেন। সেই প্রচণ্ড তর্কশক্তি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারে তিনি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে রামানুজী বৈষ্ণবসকল বাস করেন। তাহাদিগকে শ্রীবৈষ্ণব বলা হয়। সেখানে এক ভট্ট গৃহে প্রভু চার মাস থাকিলেন। ঐ ভট্ট শ্রীবৈষ্ণব লক্ষ্মী-নারায়ণ সেবা করেন। শ্রীরাধা-কৃষ্ণ হইতে লক্ষ্মী-নারায়ণে কিছু ভেদ আছে, ইহা বুঝাইবার জন্য প্রভু ঐ ভট্টের সহিত পরিহাসচ্ছলে তর্ক করিলেন এবং নারায়ণ হইতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রীবৈষ্ণবকে তিনি তাঁহার গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সিদ্ধান্তে আনিবার চেষ্টা করিলেন—

প্রভু কহে ভট্ট তোমার লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী।
কান্তবক্ষস্থিতা পতিব্রতা শিরোমণি॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ-গোচারণ।
সাধ্বী হঞা কেন চাহে তাহার সঙ্গম॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৯ম পঃ)

ভট্ট কহিলেন, কৃষ্ণ আর নারায়ণে ভেদ নাই। অতএব ইহাতে লক্ষ্মীর পতিব্রতা ধর্ম্ম নষ্ট হয় না এবং ইহাতে দোষ নাই।

প্রভু কহে দোষ নাহি ইহা আমি জানি।
রাস না পাইল লক্ষ্মী শাস্ত্রে ইহা শুনি॥

*　　*　　*

শ্রুতি পায় লক্ষ্মী না পায় ইথে কি কারণ।
ভট্ট কহে ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৯ম পঃ)

নারায়ণে ঐশ্বর্য্য আছে, কৃষ্ণ মাধুর্য্যের ধুর্য্য। কাজেই—

নারায়ণ হইতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ।
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৯ম পঃ)

কৃষ্ণের মাধুর্য্য লোভেই লক্ষ্মী নারায়ণকে ছাড়িয়া কৃষ্ণ সঙ্গম চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রাসে লক্ষ্মীর স্থান হয় নাই, যেহেতু লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্য জ্ঞান ছিল। ঐশ্বর্য্য জ্ঞান থাকিলে মহাপ্রভুর কৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে না। বিশেষতঃ লক্ষ্মী গোপীদের অনুগত হন নাই। তিনি গোপীদের হইতে নিজেকে পৃথক ভাবিয়াছেন। নিজেকে গোপীদের অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালিনী ভাবিয়াছেন—

গোপীরাগানুগতা হঞা না কৈল ভজন।

অতএব লক্ষ্মী কৃষ্ণসঙ্গম পাইলেন না। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্য বড়। প্রভু শ্রীবৈষ্ণবের নিকট গৌড়ীয় বৈষ্ণবের এই অভিনব সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন।

যদিও প্রভু অষ্টভূজা দেবীর নিকট প্রণাম করিয়াছেন, তথাপি তিনি বুদ্ধদেবের মত বলি প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন—

পরম বৈষ্ণবী দেবী মাংস নাহি খায়।
তবে কেন বলিদানে ভুলাও তাহায়॥

(গোঃ কঃ—৬০ পৃঃ)

তিনি বলিলেন—

পশু ছাড়ি দেহ মুঞি চক্ষে দেখে যাই॥

*　　　*　　　*

বলির ছাগল তবে ব্রাহ্মণ ছাড়িল॥
দেবীর সম্মুখে প্রভু আটিয়া বসিল।
জোর হস্তে ভবানীর স্তব আরম্ভিল॥

(গোঃ কঃ—৬০ পৃঃ)

বলি বাদ দিয়া যেসব কালীপূজা এখন হয়, প্রভুই তাহা প্রবর্ত্তন করেন।

প্রভু শুধু ধর্ম্ম সংস্কারক নন, সমাজ সংস্কারেও চেষ্টা করিয়াছিলেন। খাণ্ডবার পথে যাইতে জিজুরীতে খাণ্ডবা নামে এক দেবতা আছেন; দরিদ্র পিতারা সেই খাণ্ডবার সহিত কন্যার বিবাহ দেয়। কিন্তু ঐ খাণ্ডবার নারীগণ বেশ্যাবৃত্তি করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিত। প্রভু বলেন—

কেমন নিঠুর পিতা বলিতে না পারি।
কেমনে মুরারী করে আপন কুমারী॥

*　　　*　　　*

মুরারী পল্লীর মধ্যে মোর প্রভু গিয়া।
পবিত্র করিল সবে হরিনাম দিয়া॥

(গোঃ কঃ—৫৫ পৃঃ)

পন্থভীল ও নারোজী প্রভৃতি দস্যুদলপতিদিগকে প্রভু দলবলসহ দস্যুবৃত্তি ছাড়াইয়া বৈষ্ণব করিলেন। তিনি দস্যুকে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করাইতেছেন, বেশ্যাকে বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করাইতেছেন। মহাপ্রভুর প্রথম প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের এইসকল দিক আবর্জ্জনার স্তূপে এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রভু সেতুবন্ধে গিয়া রামেশ্বর শিব পূজা করিলেন।—

গোবিন্দের কড়চায় দেখিতে পাই—প্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে পরে মহানদী পার হইয়া বোম্বাই প্রদেশের আমেদাবাদ গিয়া পৌঁছিলেন, পরে সোমনাথ গেলেন। গুজরাটে আসিয়া বরোদা নগরে গেলেন। নর্ম্মদায় স্নান করিলেন—প্রভাস, দ্বারকা ও রৈবতক নামক পর্ব্বতে গেলেন। বিন্ধ্যগিরি পর্ব্বতে গেলেন—তারপর বিদ্যানগর ফিরিয়া আসিয়া রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহাকে তীর্থ যাত্রার সকল কথা প্রভু কহিলেন এবং কর্ণামৃত ও ব্রহ্ম সংহিতা, এই দুই পুঁথি রায়কে দিয়া বলিলেন—তুমি যে প্রেম সিদ্ধান্ত কহিলে, এই দুই পুস্তকে সেই রস সাক্ষী দিবে। পরমানন্দে পাঁচ-সাতদিন রায়ের সহিত কাটিয়া গেল। রায় কহিলেন—

রামানন্দ কহে প্রভু তোমার আজ্ঞা পাঞা।
রাজাকে লিখিনু আমি বিনয় করিয়া॥
রাজা মোরে আজ্ঞা দিল নীলাচলে যেতে।
চলিবার উদ্যোগ আমি লেগেছি করিতে॥
প্রভু কহে এথা মোর এ নিমিত্ত আগমন।
তোমা লঞা নীলাচলে করিব গমন॥
রায় কহে প্রভু আগে চল নীলাচলে।
মোর সঙ্গে হাতী ঘোড়া সৈন্য কোলাহলে॥

দিন দশ ইহা সবার করি সমাধান।
তোমা পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ ॥
তবে মহাপ্রভু তারে আসিতে আজ্ঞা দিয়া।
নীলাচলে চলিলা প্রভু আনন্দিত হঞা ॥
(চৈঃ চঃ, মধ্য—৯ম পঃ)

গোবিন্দের কড়চায় সংক্ষেপে অনুরূপ কথাই দেখিতে পাই। কড়চার মতে, ১৫১২ খৃষ্টাব্দের মাঘের তৃতীয় দিনে (জানুয়ারী) অপরাহ্নে মহাপ্রভু পুরীতে পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়াই ধূলাপায়ে জগন্নাথ দর্শন করিলেন। দর্শন করামাত্রই জ্ঞানশূন্য অবস্থায় আছাড় খাইয়া পড়িলেন—"এলাইল জটাজুট খসিল কৌপিন"। তীর্থ ভ্রমণের সময় সন্ন্যাসীরা কৃত্রিম জটা ব্যবহার করিয়া থাকেন, নতুবা কাটোয়ায় কেশ মুণ্ডনের পর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় দুই মাসের মধ্যেই এত দীর্ঘ জটাজুট দেখা যাইত না। সার্ব্বভৌমের সহিত মিলনের পর সার্ব্বভৌম প্রভুকে সর্ব্বপ্রথম নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং সেইখানেই প্রভু ভোজন করিয়া রাত্রি কাটাইলেন। ভ্রমণে যাইবার পূর্ব্বে যেমন পাঁচদিন প্রভু সার্ব্বভৌমের বাড়ীতে থাকিয়া ভোজন করিয়া গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়াও তাহাই করিলেন।

প্রভু ভ্রমণে বাহির হইবার পর রাজা প্রতাপরুদ্র পুরীতে আসিয়া প্রভুর কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌমকে বলিলেন যে—তুমি তাঁহাকে যাইতে দিলে কেন, "পায়ে পড়ি যত্ন করি কেন না রাখিলে"। রাজার সহিত পরামর্শ করিয়া কাশীমিশ্রের ভবন প্রভুর স্থায়ী বাসস্থান ঠিক হইল। "সুখী হইলা দেখি প্রভু বাসার সংস্থান"—"চৌদিকে বসিল নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ"। সুতরাং শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে নীলাচলেই অবস্থান করিয়াছিলেন। তারপর কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন যে—প্রভু কহিলেন এই কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ আমার সহিত দক্ষিণে গিয়াছিল, আমি ইহাকে এখন বিদায় দিলাম। পরে কৃষ্ণদাসকে কবিরাজ গোস্বামী গৌড়দেশে পাঠাইলেন।

তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল।
নবদ্বীপে গেল তিঁহো শচী আই পাশ ॥

অদ্বৈত আচার্য্য গৃহে গেলা কৃষ্ণদাস।
হরিদাস ঠাকুরের হইল পরম আনন্দ॥
(চৈঃ চৈঃ, মধ্য—১০ম পঃ)

প্রভু দক্ষিণ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন "শুনিয়া আনন্দ হইল শচীমাতার মন"। তারপর সকল ভক্ত মিলিয়া আচার্য্য অদ্বৈতের গৃহে আসিয়া পরামর্শ করিল যে, তাহারা এইবার নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে যাইবে। গোবিন্দের কড়চা বলে যে, প্রভু গোবিন্দকেই ডাকিয়া গৌড়দেশে যাইবার আজ্ঞা দিলেন—

গোবিন্দ বলিয়া মোরে ডাক দিয়া পাছে।
যাইতে কহিলা মোরে আচার্য্যের কাছে॥
আজ্ঞা মাত্র পত্র সহ বিদায় লইয়া।
শান্তিপুরে যাত্রা করি প্রণাম করিয়া॥
পৃষ্ঠে হাত দিয়া প্রভু আশীষ করিল।
মোর চক্ষে শত ধারা বহিতে লাগিল॥
প্রভু কহে নাহি কান্দ প্রাণের গোবিন্দ।
আচার্য্যে আনিয়া হেথা করহ আনন্দ॥
(গোঃ কঃ—৮৬ পৃঃ)

কবিরাজ গোস্বামী এই ঘটনার ১০৪ বৎসর পর কাহার কাছে শুনিয়া কৃষ্ণদাসকে গৌড়ে পাঠাইলেন, অদ্যাপি তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কৃষ্ণদাস ও গোবিন্দ এই উভয়েরই কিছু আগে-পরে গৌড়ে আসা অসম্ভব নয়, কেননা বহু প্রমাণে গোবিন্দকে এই সময় মহাপ্রভুর সেবায় জড়িত দেখা যায়। কৃষ্ণদাসকে ছাটিয়া ফেলা যায়, কিন্তু গোবিন্দকে ছাটিয়া ফেলা যায় না। একটু অভিনিবেশ সহকারে গ্রন্থ পাঠ করিলেই ইহা বুঝা যায়, বেশী কঠিন নয়।

প্রভুর দক্ষিণ দেশে ধর্ম্ম প্রচারকে নানা ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ—
(১) তিনি বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদের সহিত তর্ক ও বিচার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সংস্কৃতেই এই বিচার ও তর্ক হয়, কেননা দক্ষিণ দেশের পণ্ডিতগণ বাংলাভাষা জানিতেন এমন মনে হয় না। গোবিন্দ লিখিয়াছেন যে, সাধারণ লোকের সহিত কথাবার্ত্তায় তিনি কতকটা ঐ

দেশের ভাষা আয়ত্ত করিয়া আর কতকটা গোবিন্দের বর্ণনায় আই-মাই-কাই করিয়া ভাবে ও ভঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করিতেন। "কখন তামিল বুলি বলে গোরারায়; কভু বা সংস্কৃত বলি শ্রোতারে মাতায়"—(গোঃ কঃ—৫১ পৃঃ) (২)। হরিনামকীর্ত্তনে যে প্রচণ্ড ভাবন্মোত্ততার আবেশ প্রভুর মধ্যে দেখা যাইত, তাহাই জনসাধারণকে অধিক আকর্ষণ করিত। (৩) কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় দেখা যায়, প্রচারকার্য্যে প্রভু কখন কখন অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করিতেন। গোবিন্দ অপেক্ষা কবিরাজ গোস্বামীতে অলৌকিকত্বের প্রাচুর্য্য বেশী। কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের পরবর্ত্তীয়েরা যতই দিন যায় ততই বেশী ঐ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের অলৌকিক মহিমা প্রচার করেন। ইহাতে জনসাধারণ বেশী আকৃষ্ট হয়, কিন্তু ঐ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের অতিনিকট অনুবর্ত্তীয়েরা অলৌকিকত্বের প্রাচুর্য্য করেন না।

কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে দিয়া এক ব্যাঘ্রকে হরিনাম স্পষ্ট উচ্চারণ করাইয়া তবে ছাড়িয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দ, কড়চায় লিখিয়াছেন যে—ব্যাঘ্রটি জলপান করিতেছিল, প্রভু হরিনাম জপ করিতে করিতে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। অবশ্য গোবিন্দ নিজে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল। একই ঘটনার দুইটি বিভিন্ন প্রকাশ। কবিরাজ গোস্বামী অলৌকিক আর গোবিন্দ লৌকিক। ধর্ম্মান্ধ লোকেরা লৌকিক অপেক্ষা অলৌকিকে অধিক বিশ্বাস করে।

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ করি প্রভু যবে কৈল; কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল"—(চৈঃ চঃ, মধ্য—১৭ পঃ)। ইহা বৃন্দাবন যাইবার পথে। গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যের পথে ব্যাঘ্রের কথা একবার নয়, দুই দুইবার লিখিয়াছেন। ১ম—"হরিধ্বনি শুনি ব্যাঘ্র লেজ গুটাইয়া; পিছাইয়া গেল এক বনে লম্ফ দিয়া"—(গোঃ কঃ—৩২-৩৩ পৃঃ)। এখানে কৃষ্ণ কহিয়া ব্যাঘ্র নাচিল না। গোবিন্দের ব্যাঘ্র স্বাভাবিক ব্যাঘ্র, আর কবিরাজ গোস্বামীর ব্যাঘ্র একজন ভক্ত বৈষ্ণব। ২য়—"জলপান করিতেছে ব্যাঘ্র সেইস্থানে। প্রভু পার্শ্বে গুড়ি গুড়ি যাই সাবধানে॥ চলিলা ডাইনে গোরা ব্যাঘ্র রাখি বামে। আবেশে অবশ অঙ্গ মত্ত হরি নামে॥ ফিরে না চাইল ব্যাঘ্র মোদিগের প্রতি। পিছনে তাকাই আর চলি দ্রুত গতি॥"—(গোঃ কঃ—৪৮ পৃঃ)। এই বর্ণনা কত স্বাভাবিক, ইহা

প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা। এখানেও ব্যাঘ্র কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া নৃত্য করিল না। কবিরাজ গোস্বামী প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনেন নাই এবং তিনি অলৌকিকে বিশ্বাস করিতে বলিয়াছেন। তর্ক করিতে নিষেধ করিয়াছেন, "তর্ক না করিহ"।

(৪) প্রভু প্রচারকার্য্যে হিন্দু ধর্ম্মের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার ধর্ম্মমতগুলিকে গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, বর্জ্জন করিয়া অগ্রসর হন নাই। তিনি শাক্ত ও শৈবকে বৈষ্ণব করিয়াছেন সত্য, কিন্তু শক্তির মূর্ত্তিকে এবং শিবলিঙ্গকে তিনি বার বার প্রদক্ষিণ করিয়া স্তবস্তুতিতে বন্দনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার বৈষ্ণবতা একদেশদর্শী নহে। আবার যখন রামানুজপন্থী শ্রীবৈষ্ণবদের সহিত মিলিয়া চাতুর্মাস্য করিয়াছেন, তখন তিনি লক্ষ্মীনারায়ণকে উপেক্ষা করেন নাই; কেবল প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, লক্ষ্মীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীরাধা-কৃষ্ণের উপাসনা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কেননা, মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণে যে মাধুর্য্য আছে, নারায়ণে তাহা নাই—"এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে"। লক্ষ্মী পতিব্রতা-শিরোমণি সত্য, তথাপি তিনি কৃষ্ণসঙ্গম বাঞ্ছা করিয়াও পান নাই। কেননা, তিনি ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে কৃষ্ণসঙ্গম চাহিয়াছিলেন। মাধুর্য্যের ভিতর দিয়া কৃষ্ণসঙ্গম তিনি চাহেন নাই। গোপীঅনুগতা না হওয়াতে লক্ষ্মীর কৃষ্ণসঙ্গমে বাধা জন্মিয়াছে। মাহাপ্রভুর শ্রীরাধা এই বাধা অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণসঙ্গম লাভ করিয়াছেন। লক্ষ্মী হইতে শ্রীরাধা একটা উৎকর্ষ। মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই যে বৈশিষ্ট্য, এই যে উৎকর্ষ—তাহাই তিনি দাক্ষিণাত্যে রামানুজপন্থী শ্রীবৈষ্ণবদের নিকট প্রচার করিয়াছিলেন। তত্ত্ববাদী (মাধ্যাচার্য্য) বৈষ্ণবদের সহিত তর্ক করিয়া তিনি তাহাদের ভক্তিকে প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুই চিহ্নকে নিন্দাও করিয়াছিলেন। জ্ঞানশূন্য ভক্তিই যে গৌড়ীয় মহাপ্রভু প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য, মহাপ্রভু তত্ত্ববাদীদের তাহাই বুঝাইয়াছিলেন। জনসাধারণকে যেমন তিনি হরিনামের ভাবোন্মত্ততায় আকৃষ্ট করিয়া মাতাইয়া তুলিতেন, তেমনই বিভিন্ন ধর্ম্মমতের পণ্ডিতদিগের সহিতও তিনি অতি সূক্ষ্ম শাস্ত্রবিচার করিতেন। গোবিন্দ ও কবিরাজ গোস্বামী উভয়েই একথার প্রমাণ দিতেছেন।

৫। ক) প্রভু নবদ্বীপলীলায় শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সহিত ঠাকুর হরিদাসকে দিয়াই এই প্রচার আরম্ভ করেন। হরিদাস মুসলমান ছিলেন। সুতরাং প্রথম প্রচার তৎকালীন ব্রাহ্মণ-বিরোধী একটা প্রচার বলিয়াই গৃহীত হইয়াছিল। পুরীলীলায়ও তেমনই রামানন্দ-মিলনের পর শূদ্র হইলেও তাঁহাকে উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণবেত্তা শূদ্র দ্বারাই তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ইহা তিনি ইচ্ছা করিয়াই করিয়াছিলেন। কারণ—

(সন্ন্যাসী পণ্ডিতের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচশূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ ॥)

(চৈঃ চঃ, মধ্য—৫ম পঃ)

(খ) তিনি নিজে বেশ্যাদের উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বুদ্ধদেব ও যিশুখৃষ্ট বেশ্যা উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন, একথা আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু মহাপ্রভুর পক্ষে দাক্ষিণাত্যে গিয়া বেশ্যা-উদ্ধার কার্য্যে গোবিন্দের নিষেধ সত্ত্বেও উদ্যোগী হওয়া, চরিত্রের একটা বিশেষ দিককে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

(গ) তিনি দস্যুদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন। দস্যুরা সমাজের শত্রু, তিনি দস্যুদিগকে দস্যুতা করিতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। বেশ্যা-উদ্ধার দস্যু-উদ্ধার, এসমস্তই এক একটা সমাজ সংস্কার। তিনি তাহাতেও হাত দিয়াছিলেন। একাকী থাকার দরুণ বাধা দিবার কেহ ছিল না। সুতরাং চরিত্রের একটা স্বাভাবিক বিকাশ প্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে সুযোগ পাইয়াছিল।

(ঘ) তিনি দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করিয়াছিলেন। এবং যাহাতে কন্যার পিতারা এরূপ দুষ্কার্য্য না করেন, তাহার জন্য চেষ্টাও করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যেই তাহার চরিত্রের একটা দিক আমরা লক্ষ্য করিতেছি। প্রভু গতানুগতিক নহেন, গড্ডালিকা প্রবাহে তিনি পরিচালিত নহেন। তাঁহার মধ্যে একটা সংগ্রাম-শক্তির উত্তেজনা দেখিতে পাই। এই সংগ্রাম, প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সংগ্রাম। নবদ্বীপলীলায় "খণ্ড খণ্ড করিমু", "কাটিমু সভারে"—অহিংসার বাণী নয়, বিদ্রোহের, সংগ্রামের ভেরীনিনাদ।

(ঙ) তিনি অষ্টভূজাকে পূজা করিয়াছেন, কিন্তু বলিদানে বাধা দিয়াছেন। এই বলিদানে বাধা দেওয়াটাই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নীতিবাদ। বৈষ্ণবের পক্ষে জীবহিংসা নিষেধ। যাহা তাহার মতবিরোধী তাহাকে তিনি সর্ব্বত্রই প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করিয়াছেন। মতবিরোধের সহিত তাঁহাকে আপোষ করিতে দেখি না, কুত্রাপি নয়। ইতিহাসের ভাগ্যবিধাতা যে সকল মহাপুরুষ, তাঁহাদের কেহকেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া সংস্কার-বিরোধীদের প্রতি তোষণ-নীতি প্রয়োগ করিতে দেখা যায় না।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ পরবর্ত্তি বাঙ্গালী, উড়িয়া, মণিপুরী ও বৃন্দাবনের ভক্তদের নিকট কিছুটা অনাদৃত। সম্যক জ্ঞান ও সম্যক পরিচয়ের অভাব ইহার কারণ। চৈতন্য ভাগবতে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বর্ণনা নাই সত্য, কিন্তু চৈতন্য চরিতামৃতে সবিস্তারে ইহার বর্ণনা আছে। বিশেষতঃ রামানন্দ-মিলনে কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সিদ্ধান্ত হইতেও সখিভাবের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। চৈতন্য-পরবর্ত্তী সহজিয়ারা ইহা অনেকাংশে গ্রহণ করিয়াছে। এবং কবিরাজ গোস্বামীকে সহজিয়া মতের একজন প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের এই সকল দেশ ও তাহার ভিন্ন ভাষাবলম্বী লোকদের সম্পর্কে ও তাহাদের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্পর্কে বাঙ্গালী ভক্তদের সবিশেষ পরিচয় নাই। অতএব ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিন্ন ভাষাবলম্বী লোকদের মধ্যে ভিন্ন দেশে গিয়া ২৪ বৎসর বয়সের বাঙ্গালী যুবা সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম প্রচারের দুঃসাহসিকতা ও গুরুত্ব বাঙ্গালী ভক্তগণ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, বিশেষতঃ দক্ষিণ দেশে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মপ্রচার স্থায়ী ফল প্রসব করিতে পারে নাই—ইহাই প্রধান কারণ। মথুরা, বৃন্দাবন ও নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম প্রচারের যে অনুকূল ঐতিহ্য ও আবেষ্টনটি ছিল দাক্ষিণাত্য ও বোম্বাই প্রদেশে তাহা ছিল না। মহাপ্রভুর পরে আর কোন বাঙ্গালী বৈষ্ণব দাক্ষিণাত্য ও বোম্বাই প্রদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে বাহির হন নাই। এরূপ কোন প্রচার ইতিহাসে রেখাপাত করিতে পারে নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনচরিতেও এই প্রচার অনেকাংশে লুপ্ত ইতিহাস।

দশম বক্তৃতা

[শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল হইতে রামকেলী এবং পুনরায় নীলাচল কোন্ পথে গিয়াছিলেন? বিভিন্ন চরিত গ্রন্থের মত বিচার। রামকেলী আসিবার উদ্দেশ্য কি? গৌড়েশ্বর হুসেন সাহ'র দুই মন্ত্রী সাকর মল্লিক আর দবীর খাসের সহিত অর্দ্ধরাত্রে গোপন সাক্ষাতের উদ্দেশ্য কি? মথুরা-বৃন্দাবন গমন কোন্ পথে? ফিরিবার কালে প্রয়াগে শ্রীরূপ, কাশীতে শ্রীসনাতনের সহিত কী কথোপকথন হইয়াছিল? বৈষ্ণবধর্ম্মের নীতিবাদ। নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন—ভ্রমণ শেষ।]

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর, নীলাচলে ফিরিয়া দুই বৎসর তথায় অবস্থান করিলেন। এখন তিনি বৃন্দাবন যাইবার সংকল্প করিয়া গৌড়দেশ দিয়া 'জননী ও জাহ্নবী" দর্শন করিয়া যাইবেন। কিন্তু আসল কথা তিনি গৌড়ের রাজা হুসেন সাহের দুই মন্ত্রী সাকর মল্লিক ও দবীর খাস (রূপ আর সনাতন), ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। সনাতন প্রভুকে নীলাচলে অনেকবার গোপনে পত্র দিয়াছেন—দেখা করিবার জন্য "দৈন্যপত্রি লিখি মোরে পাঠালে বার বার"। এই দৈন্যপত্রি লেখা ১৫১৩ খৃষ্টাব্দের ঘটনা; ১৫১২ খৃষ্টাব্দেও হইতে পারে।

প্রভু দুই বৎসর যাবতই গৌড়ে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু রামানন্দ যাইতে দেন নাই—"রামানন্দ হঠে প্রভু না পারে চলিতে"। এই দুই বৎসর—১৫১২ এবং ১৫১৩ খৃষ্টাব্দ।

এইবার যাত্রা করিলেন। গৌড়ের ভক্তগণ রথযাত্রা দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। প্রভু বিজয়া দশমীর দিন সন্ধ্যাকালে নীলাচল ত্যাগ করিলেন। ইহা ১৫১৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবরে হইবে। কেননা ইহা সন্ন্যাসের পর "পঞ্চম বর্ষের" ঘটনা।

রাজা প্রতাপরুদ্র রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা রাজ্যমধ্যে প্রভুর গমণ-সংবাদ জানাইয়া দিলেন। প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্মচারীদের নিকট আজ্ঞাপত্র পাঠান হইল। যে পথ দিয়া প্রভু যাইবেন, সেই পথে—

গ্রামে গ্রামে নূতন আবাস করিবা।
পাঁচ সাত নব্য গৃহে সামগ্রী ভরিবা॥

আপনি প্রভুকে লঞা তাঁহা উত্তরিবা।
রাত্রি দিবা বেত্রহস্তে সেবায় রহিবা॥
দুই মহাপাত্র হরিচন্দন, মঙ্গরাজ।*
তাঁরে আজ্ঞা দিল রাজা কর সর্ব্বকাজ॥
এক নব্য নৌকা আনি রাখ নদীতীরে।
যাহা স্নান করি প্রভু যান নদীপারে॥
তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি।
নিত্যস্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি॥
চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নব্য বাস।†
রামানন্দ যাহ তুমি মহাপ্রভু পাশ॥
সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু নৃপতি শুনিল।
হস্তী উপর তাম্বু-গৃহে স্ত্রীগণ চড়াল॥
প্রভু চলিবার পথে, রহে সারি হঞা।
সন্ধ্যাতে চলিলা প্রভু নিজগণ লঞা॥
চিত্রোৎপলা নদী আসি ঘাটে কৈল স্নান।
মহিষী সকল দেখে করয়ে প্রণাম॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—১৬শ পঃ)

চারি বৎসর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে এক ত্রিবাঙ্কুরের রাজা রুদ্রপতির নিকট ভিন্ন মহাপ্রভু আর কোন স্বাধীন রাজার নিকট এত বড় সম্মান পান নাই।

সন্ন্যাসী হেরিতে চলে রাজা রুদ্রপতি।
ভক্তিভরে বাহিরিয়া আসে শীঘ্রগতি॥
হস্তী অশ্ব তেয়াগিয়া অতি দূর দেশে।
সন্ন্যাসীর কাছে আসে অতি দীন বেশে॥

(গোঃ কঃ—৪৪ পৃঃ)

প্রভু কোন্ পথে রামকেলী আসিয়াছেন? বিভিন্ন চরিতকার একই পথে প্রভুকে রামকেলী আনেন নাই। চরিতকার কেহই সঙ্গে

---

* সীমান্তপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা।
† কটকের অপর পারে অবস্থিত চৌদার নামক গ্রাম।

ছিলেন না—যে যাহার মুখে যেরূপ শুনিয়াছেন সেইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং কোন একজনের নির্দ্দিষ্ট পথকেই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে করা কঠিন। তবে কে কোন্ পথে প্রভুকে নীলাচলে আনিয়াছিলেন তার একটা তুলনামূলক বিচার অবশ্যই করা যায়।

এখন দেখা যাক, রায় রামানন্দ প্রভুর সহিত্ কতদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃতে প্রথম বলেন—ভদ্রক পর্য্যন্ত রায় আসিয়াছিলেন। পরে বলেন—রেমুনা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। বালেশ্বরের ১৪ ক্রোশ দক্ষিণে ভদ্রক, আর ৩ ক্রোশ পূর্ব্বে রেমুনা। উড়িষ্যার প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত প্রতাপরুদ্র তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। তারপর মন্ত্রেশ্বরে 'দুষ্টনদ' পার হইয়া পিছলদায় পৌঁছিতে হইবে। কিন্তু উহা যবন অধিকারে। সেই যবন প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। জলদস্যুর ভয়ে দশ নৌকা ভরিয়া সৈন্য লইয়া প্রভুকে নদী পার করাইল। মনে হয় প্রভু নৌকাযোগে সুবর্ণরেখা দিয়া ক্রমে মন্ত্রেশ্বর নদী পার হইয়া পিছলদায় উপস্থিত হন। তথা হইতে যবনরাজকে বিদায় দিয়া, নৌকা-যোগে পানিহাটী আসেন। অনুমান সুবর্ণরেখার মুখ দিয়া বঙ্গোপসাগর পার হইয়া গঙ্গায় প্রবেশ করেন। ক্রমে কুমারহট্ট—ফুলিয়া—শান্তিপুর, রামকেলী—কানাইয়ের নাটশালায় আসিয়া পৌঁছেন।

রামকেলী, মালদহ জেলায় গৌড়ের নিকট গ্রাম। গৌড় রাজধানী, হুসেন শাহ তখন গৌড়ের রাজা। ষ্টুয়ার্টের মতে, হুসেন শাহ'র রাজত্বকাল ১৪৯৯-১৫২০ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু সম্প্রতি ভিন্‌সেন্টস স্মিথ্ বলেন—হুসেন শাহর রাজত্বকাল ১৪৯৩ হইতে ১৫১৮ খৃষ্টাব্দ। ২৬ বৎসর হুসেন শাহর রাজত্বকাল। মহাপ্রভুর আগমনকালে, উভয় ঐতিহাসিকের মতেই, হুসেন শাহ গৌড়ের অধিপতি। বাংলার মুসলমান নরপতিগণের মধ্যে হুসেন শাহ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী আর তাঁহার রাজ্যশাসন প্রণালী প্রসংশনীয়। বিশেষতঃ বাংলা সাহিত্যের তিনি এত বড় উৎসাহদাতা ছিলেন যে, তাঁহার নামে যদি বাংলা সাহিত্যের একটি যুগ চিহ্নিত হয় তবে তাহা 'অনুচিত হইবে না'—এরূপ ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মত প্রকাশ করিয়াছেন। হুসেন শাহর উৎসাহে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরণ নন্দী মহাভারতের অনুবাদ করেন। বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ এবং অনেক

প্রসিদ্ধ গ্রন্থে গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ'র নাম, যশ, কীর্ত্তি সম্ভ্রমের সহিত বর্ণিত আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রচারিত যে পঞ্চরস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—হুসেন শাহ তাহা অবগত ছিলেন। প্রভু যখন রামকেলী আসিলেন তখন হুসেন শাহ'র দীর্ঘ রাজত্বকালের মাত্র চার কিংবা পাঁচ বৎসর বাকী।

বৃন্দাবনদাস হুসেন শাহ সম্বন্ধে দুই রকম কথাই লিখিয়াছেন ঃ—

যে হুসেন শাহ সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥
ওড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক কত কত করিল প্রমাদ॥

হুসেন শাহ কেশব খান বা কেশব ছত্রিকে বলিলেন—

কহত কেশব খান কেমত তোমার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি নাম বোলে যার॥

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—৪র্থ অঃ)

চতুর্দ্দিক হইতে এত লোক তাহাকে দেখিতে আসে কেন? কেশব খান, পাছে গৌড়েশ্বর প্রভুর কোন অনিষ্ট করে, এই ভয়ে বলিল —কে বলে গোসাঞি? এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী নিতান্ত গরীব—গাছের তলায় থাকে—দুই চারিজন দেখিতে আসে এই মাত্র।

কেশব ছত্রি গোপনে এক ব্রাহ্মণকে প্রভুর নিকট পাঠাইয়া দিল এবং বলিতে বলিল যে, তিনি যেন সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যান। যদিও গৌড়েশ্বরের মনের ভাব প্রভুর উপর এ পর্য্যন্ত ভাল, কিন্তু যদি কোন পাত্র আসিয়া কুমন্ত্রণা দেয় এবং গৌড়েশ্বরের মন পরিবর্ত্তন হয় সুতরাং "রাজার নিকট গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া"।

যবনেরা ইতিমধ্যে গৌড়েশ্বরকে কুমন্ত্রণা দিতেছে, তার প্রমাণ কেশব ছত্রির কথায় বুঝা যায়—"যবনে তোমার ঠাই করয়ে লাগানি" (চৈঃ চঃ, মধ্য—৯ম অঃ)।

প্রভু শুনিয়া বলিলেন—বেশ, রাজা ডাকে, যাব; তার জন্য ভয় কি?

তোমরা ইহাতে কেন ভয় পাও মনে।
রাজা আমা চাহে—মুঞি যাইব আপনে॥

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—৪র্থ অঃ)

গৌড়েশ্বর তারপর দবীর খাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন। চতুর দবীর খাস্ গৌড়েশ্বরের মনের ভাব বুঝিবার জন্য উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করিলেন—

তোমার চিত্তে চৈতন্যের কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয় সেইত প্রমাণ॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—১ম পঃ)

কবিরাজ গোস্বামীর মতে মহাপ্রভুকে হুসেন শাহ 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর' বলিয়া প্রকাশ করিলেন। বৃন্দাবনদাস ও তাহাই লিখিয়াছেন।

হিন্দু যারে বলে কৃষ্ণ খোদায় যবনে।
সেই তিহঁ নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বজনে॥

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—৪র্থ অঃ)

ইহা অনেকটা অত্যুক্তি বলিয়াই মনে হয়। তবে এমন ঘোষণাটা হয়ত হুসেন শাহ দিয়া থাকিতে পারেন।

কাজি বা কোটাল বা তাঁহাকে কোন জনে।
কিছু বলিলেই তার লইমু জীবনে॥

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্যঃ—৪র্থ অঃ)

এইবার রূপ-সনাতন দুই ভাই স্বাধীন গৌড়ের দুই প্রধান মন্ত্রী দুপুর রাত্রে, বেশ লুকাইয়া প্রভুকে দেখিতে আসিলেন—গোপনে। গৌড়েশ্বর না জানিতে পারেন, দুই মন্ত্রীর তাই অভিপ্রায়।

ঘরে আসি দুই ভাই যুকুতি করিয়া।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া॥
অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই এলা প্রভু স্থানে।
প্রথমে মিলিল নিত্যানন্দ হরিদাস সনে॥
তারা দুইজনে জানাইল প্রভুর গোচরে।
রূপ সাকর মল্লিক আইল তোমা দেখিবারে॥

(চৈঃ চঃ, মধ্যঃ—১ম পঃ)

মন্ত্রীদ্বয় আসিয়া নিজেদের পরিচয় দিলেন—

ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসঙ্গী করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গো-ব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥

*　　　*　　　*

জগাই মাধাই দুই করিলে উদ্ধার।
তাহা উদ্ধারিতে শ্রম না ছিল তোমার॥

*　　　*　　　*

আমা উদ্ধারিয়া যদি রাখ নিজ বল।
পতিতপাবন নাম তবে ত সফল॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন—

শুনি মহাপ্রভু কহে শুন দবির খাস।
তোমা দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি হৈতে দোঁহা নাম রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড় তোমা দৈন্যে ফাটে মোর মন॥
দৈন্যপত্রী লিখি মোরে পাঠালে বার বার।
সেই পত্রী দ্বারা জানি তোমার ব্যাভার॥

তারপরে এইবার আসল কথা বলিলেন—

গৌড় নিকট আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা মিলিবারে ইহ আগমন॥
এই মোর মনকথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে কেনে এল রামকেলী গ্রামে॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—১ম পঃ)

এখন বুঝা গেল রামকেলীতে প্রভু আসিয়াছিলেন কেন।

এত বলি দোঁহা শিরে ধরি দুই হাতে।
দুই ভাই ধরি প্রভুপদ নিল মাথে॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—১ম পঃ)

সৈন্য ও রাজস্ব বিভাগের স্বাধীন বাংলার দুই প্রধান মন্ত্রী কৌপীন-মাত্র পরিধান এক উন্মাদ সন্ন্যাসীর পায়ে যখন মাথা লুটাইল, বৈষ্ণব ধর্ম্মের আন্দোলন তখন ইতিহাসের আর এক নূতন পথে যাত্রা সুরু

করিল। অর্দ্ধ রজনীর অন্ধকারকে আশ্রয় করিয়া যাহারা আসিয়াছিলেন, ফিরিবার পথে যে আলোক লইয়া তাঁহারা ফিরিলেন বাংলার দীর্ঘ পাঁচটী শতাব্দী আজিও সেই আলোকে উজ্জ্বল, ভাস্বর, দ্যুতিমান রহিয়াছে।

যাইবার সময় রূপ-সনাতন প্রভুকে বলিলেন—

ইহা হইতে চল প্রভু ইহা নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ॥
তথাপি যবন জাতি না করিহ প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি॥
যাঁহার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটী।
বৃন্দাবন যাবার এ নহে পরিপাটী॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—১ম পঃ)

প্রভু বৃন্দাবন গেলেন না, নীলাচলই ফিরিয়া গেলেন। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস মধ্যে প্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

একটি কথা রহিয়া গেল; বৃন্দাবনদাস ও কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন যে, ফিরিবার পথে শান্তিপুরে আচার্য্য অদ্বৈতের বাড়ীতে প্রভু সাত দিন ছিলেন। সেই সময় শচীমাতাকে নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে আচার্য্য অদ্বৈতের বাড়ীতে নিয়া গিয়া সাক্ষাৎ করান হয়। বিষ্ণুপ্রিয়াকে শচীমাতা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এমন কথা বৃন্দাবনদাস বা কবিরাজ গোস্বামী কেহই লেখেন নাই। সুতরাং এযাত্রা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোন প্রামাণিক গ্রন্থেই তাহার উল্লেখ নাই।

লোচন ও জয়ানন্দ এ সম্পর্কে কিছু নূতন কথা লিখিয়াছেন। লোচন লিখিয়াছেন যে, প্রভু মায়ের কথায় নবদ্বীপ আসিয়া নিজের বাড়ীর নিকট শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ঘরে এক রাত্রি থাকিয়া বিদায় হন।

মায়ের বচনে পুন গেলা নবদ্বীপ।
বারকোনা ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ॥
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ী ভিক্ষা কৈল।
মায়ে নমস্করি প্রভু প্রভাতে চলিল॥

(লোচন, চৈঃ মঃ—শেষ খণ্ড)

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া প্রভুকে দেখিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে প্রভু শচীমাতাকে বলিলেন যে, বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও। জয়ানন্দের মতেও দেখা যায় প্রভু নবদ্বীপ আসিয়াছিলেন।

আই ঠাকুরাণী মূর্চ্ছা গেলা বিষ্ণুপ্রিয়া।
চৈতন্য দেখিয়া কান্দে সকল নদীয়া॥
মায়েরে দেখিয়া প্রভু কৈলা নমস্কার।
বধূ লইয়া ঘরে যাহ না হইও গঙ্গাপার॥

(জয়ানন্দ, চৈঃ মঃ—বিজয় খণ্ড)

জয়ানন্দ আরও একটি অলৌকিক কথা লিখিয়াছেন যে, প্রভুর রূপ দেখিয়া কুলবধূরা চুল বাধে না এবং দুই পার্শ্বের বৃক্ষসকল প্রভুকে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করে। হুসেন শাহ এই কথা শুনিয়া কেশব খানকে বলিলেন যে—"কেমন কৃষ্ণচৈতন্য গাছে নোয়ায় মাথা"—তাঁহাকে আমার নিকট ধরিয়া আন। এই কথা শুনিয়া প্রভু রামকেলী হইতে শান্তিপুর চলিয়া গেলেন।

রূপ দেখিয়া কুলবধূ চুল নাঞি বান্ধে।
গাছে মাথা নোঙাএ গোসাঞি তার নাটে॥
আছুক মানুষের কাজ পাষাণ দেখি ফাটে।
রাজা বলে কেশব খাঁ ধরিয়া আন এথা॥
তাহা শুনি নিবর্ত্ত হইলা চৈতন্য ঠাকুর।
সর্ব্ব পার্ষদ সঙ্গে গেলা শান্তিপুর॥

(জয়ানন্দ, চৈঃ মঃ—বিজয় খণ্ড)

প্রভু নবদ্বীপ আসিয়া থাকিলে কবিরাজ গোস্বামী, অন্ততঃ বৃন্দাবনদাস, নিশ্চয়ই তাহা উল্লেখ করিতেন। কেননা, প্রভুর অনেক ছোট ছোট গ্রামে গমনের কথা তাঁহারা সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছেন। সন্ন্যাসের পর প্রভুর নবদ্বীপ আগমন যদি সত্যই হইয়া থাকিত, তবে সেই স্মরণীয় বৃহৎ ঘটনাটী বৃন্দাবনদাস ও কবিরাজ গোস্বামী উল্লেখ না করিয়া পারিতেন না। সুতরাং লোচন বা জয়ানন্দের উপর নির্ভর করিতে ভরসা হয় না—বিশেষতঃ লোচনের উপর।

প্রভু গৌড় হইতে নীলাচলে ফিরিয়া গিয়া ঝাড়িখণ্ড পথে মথুরা-বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী এই যাত্রাপথে বনজঙ্গলের মধ্যে প্রভুকে দিয়া ব্যাঘ্রকে হরিনাম মহামন্ত্র উচ্চারণ করাইয়াছেন। জঙ্গলের ব্যাঘ্রেরা হরিনাম বলিয়াছে; যাহারা ভক্ত তাহারা এ কয় শতাব্দী এ কথা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। আর যাহারা ভক্ত নয় তাহারা এ কথা চরিতকারের অত্যুক্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে, সেপ্টেম্বর কিম্বা অক্টোবর মাসে প্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে, জুলাই মাসে বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসেন। প্রভু বারংবার বলিয়াছেন যে, মথুরা-বৃন্দাবনই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান; তবে মাতার আজ্ঞায় তিনি নীলাচলে বাস করেন এই মাত্র। মথুরা-বৃন্দাবনের নিকটেই দিল্লী ও আগ্রা ভারতের রাজধানী। পাঠান সম্রাট সেকেন্দার লোদী তখন আগ্রার সিংহাসনে। তিনি ২৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন (১৪৯১—১৫২০খৃঃ—ষ্টুয়ার্টের মতে)। এলফিনষ্টোন বলেন—সেকেন্দারের মৃত্যু তারিখ ১৫১৭ কিম্বা ১৫১৮ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু ভিন্‌সেণ্টস্‌ স্মিথ্‌ বলেন—তিনি ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মারা যান। ভিন্‌সেণ্টস্‌ স্মিথের গণনাই ঠিক। প্রভু যখন মথুরা-বৃন্দাবন (১৫১৫—১৫১৬ খৃঃ) ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেকেন্দার লোদী তখন তাঁহার রাজত্বের শেষ বৎসরে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। সকল ঐতিহাসিকই বলেন যে, সেকেন্দার বাদ্‌শা খুব হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন। হিন্দুদের দেব-দেবী মূর্ত্তি ও মন্দির যাহা যাহা পাইয়াছেন ও পারিয়াছেন তাহা ভাঙ্গিয়াছেন। হিন্দুদের তীর্থযাত্রায় বাধা দিয়াছেন! আর বিশেষ পর্ব্বে পবিত্র নদ-নদীতে হিন্দু যাত্রীদের স্নান করিতে দেন নাই।

এক সময়ে তাঁহার রাজত্বে কোন এক ব্রাহ্মণ এইরূপ প্রচার করিতেছিল যে—"সমস্ত ধর্ম্মই যদি অকপটে আচরণ করা হয়, তবে ঈশ্বর তাহা গ্রহণ করেন"। এলফিনষ্টোন অনুমান করেন যে, ব্রাহ্মণটি কবীরের জনৈক শিষ্য (অধ্যাপক উইলসন্—Asiatic Researches, Vol xvi, ৫৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ভিন্‌সেণ্টস্‌ স্মিথ-এর মতে কবীর ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তবেই দেখা যায় তিনি সেকেন্দার বাদ্‌শার সমকালীন এবং কবীরের মৃত্যুর পরেও মহাপ্রভু পুরীতে ১৫ বৎসর

কাল জীবিত ছিলেন। সেকেন্দার এই ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আনেন এবং তাঁহার এইরূপ কবীরপন্থী উদার ধর্ম্মমতের জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই ঘটনা ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের বড় অধিক দূরে হইবে না। একজন মৌলভী সেকেন্দর বাদ্‌শাকে বলিয়াছিল যে, তীর্থযাত্রী হিন্দুদের অত্যাচার করা উচিত নয়। ইহার উত্তরে বাদ্‌শা কোষ হইতে তরবারি খুলিয়া মৌলভীকে এই বলিয়া কাটিতে গিয়াছিলেন যে—"পাপীষ্ঠ তুমি মূর্ত্তিপূজা সমর্থন কর"! মৌলভী এই উত্তর দিয়া বাঁচিলেন যে—"না তা নয়, আমার বক্তব্য যে রাজা প্রজাকে অত্যাচার করিবে না"।

যেমন গৌড়ে (১৫১৪ খৃঃ) হুসেন শাহের সহিত, তেমনই বৃন্দাবনে (১৫১৫ খৃঃ) ভ্রমণকালে আগ্রায় সেকেন্দার লোদীর সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হয় নাই। এই সাক্ষাৎ হওয়া নিরাপদ ছিল না, সমূহ বিপদ্‌জনক ছিল। ইতিহাস আলোচনায় এইরূপ অনুমান হয়। মুরারী গুপ্তের নামে যে একখানি সংস্কৃত কড়চা গ্রন্থ আছে, তাহাতে প্রভুর মথুরা ও বৃন্দাবনলীলার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আসল মুরারীর কড়চা শেষ হয় ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে। উহাতে ১৫১৫ অথবা তৎপরবর্ত্তী বৎসরগুলির কথা থাকিবে কিরূপে! বিশেষতঃ আভ্যন্তরিক প্রমাণেও দেখা যায় যে, উহা মুরারী লিখিত আদি ও অকৃত্রিম গ্রন্থ নয়। পরবর্ত্তীয়েরা নিশ্চয়ই কেহ পরের অংশ লিখিয়া মুরারীর নামে ছাপাইয়া প্রচলিত করিতেছেন। সুতরাং ঐ গ্রন্থে বর্ণিত মথুরা ও বৃন্দাবনের বর্ণনা অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ঐ গ্রন্থে রাসের বর্ণনায় "জগৌ কামবীজং" অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী হইতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, কেননা চক্রবর্ত্তীই ভাগবতের "জগৌ কলং"-কে কামবীজে পরিণত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, টীকাকারদের অপার মহিমা।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে মথুরা-বৃন্দাবনের কাহিনী নাই। লোচন ও জয়ানন্দের মথুরা ও বৃন্দাবনের কাহিনী কিছুটা শুনা কথার উপর লিখিত, আর বাকী সবটাই কল্পিত। ইহা সত্য ইতিহাসের মর্য্যাদা পাইতে পারে না। কবিরাজ গোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করা ছাড়া আর উপায় নাই। কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন যে—প্রভু, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সঙ্গে এক ব্রাহ্মণ ভৃত্য, এই দুইজন

সঙ্গে করিয়া কটক ডাইনে রাখিয়া বনে প্রবেশ করিলেন। ঝাড়িখণ্ড পথ ছোটনাগপুরের অন্তর্গত একটি বিশাল জঙ্গল। এই জঙ্গলে ভীলেরা বাস করিত।

প্রভু তাহাদিগকে নাম ও প্রেম দিয়া বৈষ্ণব করিলেন। তারপর কাশী আসিলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীতে বেদান্তের বড় পণ্ডিত। তিনি মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া উপহাস করিয়া বলিলেন—

শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবুক।
কেশব ভারতী শিষ্য লোক-প্রতারক॥
চৈতন্য নাম তার ভাবুকগণ লঞা।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া॥
যে-ই তারে দেখে সে-ই ঈশ্বর করি কহে।
ঐছে মোহন বিদ্যা যে দেখে সে মোহে॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল।
শুনি চৈতন্য সঙ্গে সে হইল পাগল॥
সন্ন্যাসী নামমাত্র মহা ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী॥
বেদান্ত শ্রবণ কর না যাইহ তার পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—১৭দশ পঃ)

অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্ত ও মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত তত্ত্বে ও সাধন মার্গে সম্পূর্ণ বিপরীত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রকাশানন্দের মতাবলম্বী ছিলেন। রাজা রামমোহনের বৈষ্ণব-বিরোধী সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিতে এপর্য্যন্ত কেহ অগ্রসর হন নাই। তারপর প্রভু প্রয়াগে আসিলেন। প্রয়াগ হইতে মথুরা আসিলেন। যমুনার চব্বিশ ঘাটে প্রভু স্নান করিলেন। "বৃক্ষ ডালে শুকশারী দিল দরশন।" নিত্যলীলাপরিকর অপ্রকটভাবে থাকিলেও প্রভুর সম্মুখে প্রকট হইলেন। ইহা বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত। তারপর বৃন্দাবনে আসিলেন—আসিয়া প্রভু রাধাকুণ্ড কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকেরা কিছুই বলিতে পারিল না। ঐ স্থান লুপ্ত হইয়া

গিয়াছিল। দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প জল দেখিয়া প্রভু তথায় স্নান করিলেন এবং রাধাকুণ্ড নামে স্তব পাঠ করিলেন। সেই হইতে উহা রাধাকুণ্ড নামে খ্যাত হইল। রাসস্থলী দেখিয়া তিনি প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলেন—কালীদহে কৈবর্ত্তেরা নৌকাতে চড়িয়া রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিয়া মৎস্য ধরে, দূর হইতে লোকের ভ্রম হয় যেন কৃষ্ণ কালীয় শরীরে নৃত্য করিতেছেন।

জালিয়াকে মূঢ় লোক কৃষ্ণ করি মানে।

(চৈঃ চঃ, মধ্য—১৮দশ পঃ)

এই ভ্রমকে বিশ্বাস করিয়া লোকসকল কৃষ্ণ দেখিবার জন্য কোলাহল করিয়া ছুটিল। মহাপ্রভুর সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্য্যও যাইতে চাহিল। মহাপ্রভু তাহাকে নিষেধ করিলেন।

তবে তারে কহে প্রভু চাপড় মারিয়া।
মূর্খের বাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হইয়া॥
কৃষ্ণ কেন দর্শন দিবেন কলিকালে।
নিজভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—১৮দশ পঃ)

প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিশেষতঃ বৃন্দাবনে গিয়া আরও বেশী উন্মত্ত। তথাপি তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান সম্পূর্ণ অটুট আছে। কাশীতে প্রকাশানন্দ তাহাকে উচ্ছৃঙ্খল লোক বলিয়া যে উপহাস করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। প্রকাশানন্দের অপরাধ হইয়াছে। লোকেরা প্রভুকেই কৃষ্ণ বলিয়া সম্বোধন করিল, প্রভু দাঁতে জিভ কাটিয়া নিষেধ করিলেন।

প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিহ।
জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিহ॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—১৮দশ পঃ)

কিন্তু নবদ্বীপলীলায় তিনি নিজেকে ভাবাবেশে "মুই সেই, মুই সেই" বলিয়া অবতাররূপে ঘোষণা করিয়াছেন। সনাতন গোস্বামী যখন প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে—তুমি কি অবতার পুরুষ? প্রভু উত্তর করিয়াছিলেন—অবতার পুরুষ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট লক্ষণ দেখিয়া চেনা যায়। আর তা ছাড়া—

অবতার নাহি কহে আমি অবতার।

(চৈঃ চঃ, মধ্য—২০শ পঃ)

(আমরা দেখিতেছি প্রভু ভাবাবেশে নিজেকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আবার স্বাভাবিক জ্ঞানে নিজেকে জীবাধম বলিতেও লজ্জা অনুভব করেন নাই। এই দুই স্তরেই তাঁহার মনের ক্রিয়াকলাপ আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি।)

প্রভু এইবার বৃন্দাবন ছাড়িয়া চলিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে তিনি হঠাৎ অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন—মুখে ফেণা পড়ে, শ্বাস রুদ্ধ হইল। সেইক্ষণ দশজন অশ্বারোহী পাঠান সৈন্য ঐ পথ দিয়া যাইতে, প্রভুকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া ঘোড়া হইতে অবতরণ করিল এবং মনে বিচার করিল যে এই সন্ন্যাসীকে ধুতুরা খাওয়াইয়া এইসব দস্যুরা ইহার নিকট টাকাকড়ি যা ছিল তা কাড়িয়া লইতেছে। প্রভু হঠাৎ চেতন পাইয়া বলিলেন—

প্রভু কহে ঠক নহে মোর সঙ্গীজন।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মোর নাহি কিছু ধন॥
মৃগী ব্যাধিতে আমি হই অচেতন।
এই পাঁচ দয়া করি করেন পালন॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—১৯শ পঃ)

তারপর মহাপ্রভু সেইসব পাঠানদের বৈষ্ণব করিলেন—

সেই সব পাঠান বৈরাগী হইলা।
পাঠান-বৈষ্ণব বলি হইল তার খ্যাতি॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—১৯শ পঃ)

মহাপ্রভু নিজে পাঠান মুসলমানকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী স্পষ্টই লিখিয়াছেন—"প্রভু পশ্চিম আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য"। তারপর প্রভু নীলাচলে ফিরিবার পথে পুনরায় প্রয়াগে আসিলেন। সেখানে শ্রীরূপ ও তার ভাই বল্লভ প্রভুকে আসিয়া মিলিত হইল। শ্রীরূপকে দেখিয়া প্রভু প্রসন্ন হইলেন। "উঠ উঠ রূপ এস বলিলা বচন।" তারপর রূপ গোস্বামীকে শক্তি সঞ্চারিয়া—

কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল্।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—১৯শ পঃ)

কবিরাজ গোস্বামী স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে—প্রভু গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের নিকট রসতত্ত্বের যেসকল অভিনব সিদ্ধান্ত শুনিয়াছিলেন, শ্রীরূপ গোস্বামীকে সেই সব সিদ্ধান্তের কথাই প্রয়াগে দশ দিন থাকিয়া শিক্ষা দিলেন।

শ্রীরূপ, মহাপ্রভুর আদেশ পাইয়া বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন—কিছু পরে সনাতনও যাইবেন। রূপ-সনাতন প্রভুর এই সাক্ষাৎ দুই শিষ্য বৃন্দাবনে কি ভাবে দিবারাত্রি কাটাইতেন, তাহা প্রতক্ষ্যদর্শী কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়া গিয়াছেন।

অনিকেতন দুঁহে রহে যত বৃক্ষগণ।
একেক বৃক্ষতলে একেক রাত্রি শয়ন॥
বিপ্রগৃহে স্থূল ভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটী চানা চিবায় ভোগ পরিহরি॥
করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন উল্লাস॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণ ভজন চারি দণ্ড শয়নে।
নামসংকীর্ত্তন-প্রেমে নহে কোন দিনে॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে করে চৈতন্য চিন্তন॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—১৯শ পঃ)

গৌড়দেশে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু যে মাথায় পগ্‌গ বাঁধিয়া কর্ণে কুণ্ডল অলঙ্কারাদি ভূষণ পরিয়া মহামল্ল যোদ্ধবেশে প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, বৃন্দাবনে রূপ-সনাতন তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পন্থা অবলম্বন করিলেন। মহাপ্রভুর চরিত্রের এই এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে,

বিভিন্ন স্বভাবের বিভিন্ন বিভাগের প্রচারকদের এক অদ্ভুত সমন্বয় তাঁহার মধ্যে হইয়াছে। এরূপটী না হইলে এতবড় একটা ভারতব্যাপি ধর্ম্মের আন্দোলন বাংলা দেশ হইতে সূত্রপাত করিতে পারিতেন না। তাঁহার নেতৃত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য—বিরোধের মধ্যে সমন্বয়, বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য। এই ঐক্য তিনি নিজে।

প্রভু প্রয়াগে এক দাক্ষিণাত্যনিবাসী বিপ্রের বাড়ীতে ছিলেন। প্রয়াগ হইতে পুনরায় কাশী আসিয়া চন্দ্রশেখরের ভবনে উপনীত হইলেন।

এদিকে শ্রীরূপ রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়া পালাইয়া যাওয়াতে, হুসেন শাহ প্রধান মন্ত্রী দবীর খাসকে (সনাতন) কারাগারে বন্দী করিলেন। কেননা হুসেন শাহ ভয় করিলেন যে, রূপের মত সনাতনও পালাইয়া যাইবে।

রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধে বৃহস্পতি।

গৌড়রাজ্য শাসনের ভার হুসেন শাহ সনাতনের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। রূপ-সনাতন ছাড়া রাজ্য চলা ভার। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহর মনে এই আশঙ্কাই হইয়াছিল, নতুবা সনাতনকে বন্দী করিবার আর কী কারণ থাকিতে পারে? সনাতনের মন্ত্রীত্ব রাজ্যশাসনের পক্ষে অপরিহার্য্য—এই কারণ।

শ্রীরূপ গৌড়ে এক মুদীর নিকট দশ সহস্র মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলেন। বন্দোবস্ত ছিল, এই দশ সহস্র মুদ্রা কারা-রক্ষককে ঘুষ দিয়া প্রধান মন্ত্রী সনাতন কারাগার হইতে পলায়ন করিবেন। সনাতন কারা-রক্ষককে বলিলেন—

কিছু ভয় নাহি আমি এদেশে না রব।
দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইব॥

সনাতনের পক্ষে দরবেশ হইয়া মক্কায় যাওয়াই স্বাভাবিক, বৈরাগী হইয়া বৃন্দাবনে যাওয়া কল্পনার অতীত।

সনাতন উৎকোচের মুদ্রাগুলি কারা-রক্ষকের সম্মুখে ঢালিয়া দিলেন। রাশিকৃত মুদ্রা দেখিয়া মুসলমান কারা-রক্ষকের লোভ হইল।

সনাতন মুক্তি পাইলেন। গৌড় হইতে সনাতন কাশীতে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। সনাতনকে দেখিয়া প্রভু ধাইয়া আসিলেন—

তাঁহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাইয়া এলা।
তাঁরে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
প্রভু স্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈলা সনাতন।
মোরে না ছুঁইও কহে গদ্গদ বচন॥
দুইজনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি চন্দ্রশেখরের হইল চমৎকার॥
তবে প্রভু তাঁর হাত ধরি লঞা গেলা।
পিণ্ডার উপর নিজ পাশে বসাইলা॥
তিঁহো কহে প্রভু মোরে না কর স্পর্শন।
(প্রভু কহে তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥/

* * *

তোমা দেখি তোমা স্পর্শি গাই তোমা গুণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ফল এই শাস্ত্র নিরূপণ॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—২০শ পঃ)

সনাতনের প্রতি প্রভুর ব্যবহার, নয়নমন মুগ্ধ করিয়া দেয়।

তারপর প্রভু সনাতনকে ক্ষৌর করাইয়া বেশ পরিবর্ত্তনের আদেশ দিলেন—সনাতন বৈরাগীর বেশ পরিধান করিলেন। কিন্তু তাঁহার গায়ে একখানি ভোট কম্বল ছিল।

ভোট কম্বল পানে প্রভু চাহে বারবার॥

সনাতন জানিল যে, প্রভুর মন ভোট কম্বল দেখিয়া প্রসন্ন নয়। সনাতন তখনই গঙ্গাতীরে গিয়া একজনকে ভোট কম্বলটি দিয়া, উহার ছেড়া কাঁথা গায়ে জড়াইয়া মহাপ্রভুর সম্মুখে আসিলেন। মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইলেন।

দুইমাস যাবৎ কাশীতে থাকিয়া সনাতনকে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিলেন। শ্রীজীবের ষট্-সন্দর্ভ আর শ্রীরূপের উজ্জ্বল নীলমণি

উত্তমরূপে অধ্যয়ন না করিলে, চৈতন্য চরিতামৃত বর্ণিত শ্রীরূপ, ও সনাতন শিক্ষা বুঝা যাইবে না এবং বুঝানও কঠিন। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরূপ ও শ্রীজীবের সিদ্ধান্তগুলিই প্রভুর মুখ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

সনাতন প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার ?

(চৈঃ চঃ, মধ্য—২০শ পঃ)

প্রশ্নের ইঙ্গিত এইরূপ যে—কলিতে মহাপ্রভুই অবতার কি-না ?

সনাতনের কথায় মহাপ্রভু উত্তর দিলেন—

অবতার নাহি কহে আমি অবতার।

(চৈঃ চঃ, মধ্য—২০শ পঃ)

কি শোভন এবং চমৎকার উত্তর! প্রভু সনাতনকে কৃষ্ণের মধুর রূপের কথা বলিতে লাগিলেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলা হয় অনুরূপ ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥

* * *

রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হৈল চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম
এইরূপে নিত্য তাঁর ধাম ॥

* * *

চড়ি গোপী মনোরথে মন্মথের মন মথে
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি পঞ্চশর দর্প স্বয়ং নব কন্দর্প
রাস করে লঞা গোপীগণ ॥

নিজ সম সখা সঙ্গে , গোগণ চারণ রঙ্গে
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার।
যার বেণুধ্বনি শুনি স্থাবর জঙ্গম প্রাণী
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—২১শ পঃ)

প্রভুর মুখে এই কবিতার মধ্যে কবিরাজ গোস্বামীর একটি অসাধারণ শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে তিনি শুধু শ্রীরূপ বা শ্রীজীবের অনুসরণ করিয়া প্রতিধ্বনি করিতেছেন না। ইহা তাঁহার নিজের ধ্বনি ও অনুপম কবিত্ব শক্তি। এই কবিতাটির মধ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তত্ত্বের একটা ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে রূপ, পরে শব্দ—স্থূল হইতে ক্রমে সূক্ষ্মে একটা উর্দ্ধগতি দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। প্রভু এইরূপ বলিয়া শেষ করিলেন যে, কৃষ্ণ নিজে আমার মুখ দিয়া এই সকল কথা তোমাকে শোনাইল। কেননা আমি তো বাউল, কি কহিতে কি কহি ঠিক নাই। কেননা আমি সর্ব্বদাই কৃষ্ণের মাধুর্য্যস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি।

মোর চিত্তভ্রম করি নিজৈশ্বর্য্য মাধুরী
মোর মুখে শুনায় তোমারে॥
আমি তো বাউল আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যস্রোতে আমি যাই বহি॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—২১শ পঃ)

তারপর প্রভু সনাতনকে বলিলেন—

পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তি সঞ্চারে॥
তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার।
মথুরার লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব আচার।
ভক্তি-স্মৃতি শাস্ত্র করি করিহ প্রচার॥

যুক্ত বৈরাগ্য স্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্ক বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—২৩শ পঃ)

শুষ্ক বৈরাগ্য অর্থ শাঙ্কর বেদান্ত, মায়াবাদ—যাহা বলে এই জগৎ মিথ্যা আর অদ্বৈতবাদ—যাহা বলে জীব আর ব্রহ্মে ভেদ নাই, এক। ইহাতে যুক্ত বৈরাগ্যের মত ভগবানের প্রতি জীবের ভক্তির অবসর নাই। ইহা শুষ্ক জ্ঞান পথ—রসাল নয়। প্রভু সনাতনকে এই শাঙ্কর বেদান্তরূপ শুষ্ক বৈরাগ্য নিষেধ করিলেন।

এই প্রসঙ্গে কতগুলি প্রশ্ন মনে আসে। ১ম, লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর এবং কাটোয়ায় সন্ন্যাস লওয়ার সময় প্রভুর শ্রীমুখের বাণী যাহা গ্রন্থে দেখিতে পাই—তাহাতে এই পরিদৃশ্যমান সংসার যে অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর, ইহাতে তাঁহার চিত্ত দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছে। অবশ্য জীব আর ব্রহ্ম যে এক, একথা তিনি বলেন নাই। শাঙ্কর বেদান্তের অন্ততঃ মায়াবাদ যে তিনি এই সময় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা প্রত্যক্ষ। পরে যদি মায়াবাদ হইতে লীলাবাদে তাঁহার মতপরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তবে তাহাও অসম্ভব কিছু নয়। ২য়, শাঙ্কর বেদান্তকে নিষেধ করায় প্রভু স্ব-বিরোধী হইতেছেন কি-না? রাজা রামমোহন রায় এযুগে এই প্রশ্নটি তুলিয়াছেন। এবং এ পর্য্যন্ত কোন বৈষ্ণব পণ্ডিত এই প্রশ্নটির উত্তর দেন নাই। রাজা বলেন—শ্রীচৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী ও সন্ন্যাসগুরু কেশব ভারতী, উভয়েই শাঙ্কর মতের সন্ন্যাসী। বিশেষতঃ শ্রীধর স্বামী যাহার ভাগবতের টীকা, তিনি স্বীকার করিয়াছেন তিনিও শাঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। অতএব শ্রীচৈতন্যদেব কখনই শাঙ্কর মতের বিরোধী হইতে পারেন না। যদি হন, তবে তাঁহার মধ্যে স্ব-বিরোধিতা আসিয়া পড়ে এবং তাঁহার ধর্ম্মের মূলচ্ছেদ হইয়া যায়।*

---

* যদ্যপিও ভগবান আচার্য্যের (শঙ্করাচার্য্য) কৃত ভাষ্যকে মোহের নিমিত্ত করিয়া কহা সকলেরই দুষ্কৃতের কারণ হয়, তথাপি বিশেষ করিয়া চৈতন্যদেব-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত অপরাধজনক হইবে। যেহেতু পূজ্যপাদ ভগবান ভাষ্যকারের শিষ্যানুশিষ্য-প্রণালীতে কেশব ভারতী ছিলেন, সেই কেশব ভারতীর শিষ্য চৈতন্যদেব হয়েন। আর শ্রীধর স্বামীও পূজ্যপাদ সম্প্রদায়ের শিষ্য শ্রেণীতে

রাজা রামমোহন নিজেকে শঙ্করশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে শ্লাঘা বোধ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের দার্শনিক মতবাদের বিরুদ্ধে রামমোহনের এই অতি মারাত্মক সিদ্ধান্তের উত্তর প্রভু নিজমুখেই বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে দিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস প্রভুকে দিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয়কে স্পষ্ট বলাইয়াছেন—

(সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া
বাহির হইনু শিখাসূত্র মুড়াইয়া।)

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—৩য় অঃ)

অতিশয় পরিষ্কার কথা। শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসের বহিরাবরণ মাত্র প্রভু গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু শাঙ্কর বেদান্তের দার্শনিক মতবাদ তিনি গ্রহণ করেন নাই। কেননা শাঙ্কর বেদান্তে কৃষ্ণের বিরহে বিক্ষিপ্ত হওয়ার কোনই কথা নাই। ৩য়, কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর মুখ দিয়া শঙ্কর-বিরোধী শ্রীজীবের ষট্-সন্দর্ভের যেসকল কথা বলাইয়াছেন—উহা কি সত্যি প্রভু বলিয়াছেন, অথবা উহা তাঁহার শ্রীমুখে আরোপ করা হইয়াছে? গুরুতর প্রশ্ন। প্রভু যখন ঐসকল কথা বলিয়াছেন, তখন শ্রীজীব ষট্-সন্দর্ভ রচনা করেন নাই।

অতএব ষট্-সন্দর্ভের অবিকল নকল যেসকল উক্তি, তাহা প্রক্ষিপ্ত—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ষট্-সন্দর্ভের এই সকল সিদ্ধান্ত যে প্রভুর অভিপ্রেত, তাহারও ত যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রমাণ নাই এমন ত নহে। শ্রীসনাতনকে প্রভু কাশী ও নীলাচলে ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন। প্রভুর সিদ্ধান্ত সনাতন সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছেন। সনাতনের শ্রীত্যর্থে গোপাল ভট্ট যে বিষয় সূচী করেন, সেই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতেই

ছিলেন। তাঁহার কৃত গীতা প্রভৃতির টীকা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কি অন্য সম্প্রদায়ে, সর্ব্বথা মান্য এবং চৈতন্যদেবও ঐ টীকাকে মান্য করিয়াছেন।

অতএব আচার্য্যের নিন্দা করাতে এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মের ক্রমে মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। আর আমাদের প্রতি আচার্য্য-মতাবলম্বী করিয়া যে কটাক্ষ করিয়াছেন, সে আমাদের শ্লাঘ্য। সুতরাং ইহার উত্তর কি লিখিব? (গোস্বামীর সহিত বিচার—রাজা রামমোহন রায়)।

শ্রীজীব ষট্-সন্দর্ভ রচনা করেন। অতএব ষট্-সন্দর্ভের শঙ্কর-বিরোধী সিদ্ধান্ত প্রভুর অভিপ্রেত, ইহার প্রমাণ আমরা পাইলাম।

দার্শনিক মতবাদ ছাড়িয়া এইবার আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম্মের নীতিবাদে আসিয়া পৌঁছিতেছি। প্রভু সনাতনকে কিছু নীতি উপদেশ দিলেন। ইহা শিক্ষাষ্টক নামে প্রসিদ্ধ। প্রভু বলিলেন—

অবৈষ্ণব সঙ্গ ত্যাগ, বহু শিষ্য না করিবে।
বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে॥
হানি লাভ সম শোকাদি বশ না হইবে।
অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে॥
বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দা গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিবে।
প্রাণী মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—২২শ পঃ)

নবদ্বীপলীলা হইতে পুরীলীলায় নীতিবাদ ক্রমবিকাশের পথে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মূলতঃ ইহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের অহিংস নীতিবাদ। প্রভু এই অহিংস নীতিবাদ বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহাযান পন্থীদের নিকট হইতেই গ্রহণ করিলেন। নবদ্বীপলীলায় ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীপাদ নিত্যানন্দ এই অহিংস নীতি প্রথম গ্রহণ করেন। চাঁদ কাজির বাড়ী আক্রমণ ও লুণ্ঠনে এবং প্রভু কর্ত্তৃক শ্রীবাসের বাড়ীতে গদাপূজার সময় এই অহিংস নীতি এতটা গৃহীত হয় নাই। বৃক্ষকে কাটিলেও যেমন কথা বলে না, পরন্তু ছেদনকারীকে ছায়া ও ফলদান করে, বৈষ্ণবকেও সেইরূপ বৃক্ষের মত অহিংস হইতে হইবে। মানুষ উদ্ভিদের মত হইয়া যাইবে, এ বড় বিষম কথা। মানুষ আক্রান্ত হইলেও আত্মরক্ষা করিবে না, শুধু দাঁড়াইয়া মরিবে, এ মত গীতার নহে—চণ্ডীতে ত ইহা নাই-ই। গীতা, চণ্ডী হিন্দু শাস্ত্র। সমাজ জীবনে এই শ্রেণীর নীতিবাদ গৃহীত হইলে রাষ্ট্রে পরাধীনতা আসিবে, ইহা নিশ্চয়। রাজা রামমোহন এইরূপ আশঙ্কা হইতেই বলিয়াছেন যে, আমাদের পরাধীনতার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি হইতেছে "হিংসা ত্যাগকে ধর্ম্ম বলিয়া জানা"। অহিংস নীতিবাদ রাষ্ট্রের স্বাধীনতার প্রতিকূল। ইহা অ-হিন্দু—বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবের নীতিবাদ।

তারপর প্রভু সনাতনকে বলিলেন যে—তুমি বৃন্দাবনে যাও, তোমার দুই ভ্রাতা রূপ আর অনুপম (বল্লভ) তথায় গিয়াছে। আর—

কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আসে যদি করিহ পালন॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—২৫শ পঃ)

"স্ত্রী শূদ্র মূর্খ আদিকে" ভক্তি বিলাইবার জন্য শ্রীঅদ্বৈতের কথা অঙ্গীকার করিয়া শ্রীবাসের বাড়ীতে যাহার অভিষেক হইয়াছিল, "মূর্খ নীচ দরিদ্রকে" প্রেমসুখে ভাসাইবার জন্য যিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলিয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, তিনিই সনাতনকে বলিলেন—সনাতন আমার কাঁথা করঙ্গিয়া ভক্তগণ যদি বৃন্দাবনে যায় তবে তাদের উপেক্ষা করিও না, পালন করিও। শ্রীচৈতন্যে বুদ্ধের হৃদয় কথা বলিতেছে।

তারপর সনাতন প্রভুকে বলিবেন যে—তুমি সার্ব্বভৌমের নিকট যে আত্মারাম শ্লোকের আঠার রকম ব্যাখা করিয়াছিলে, তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বল।

প্রভু কহে আমি বাতুল আমার বচনে।
সার্ব্বভৌম বাতুলতা সত্য করি মানে॥
কিবা প্রলাপিলাম তারে কিছু নাহি মনে।
তোমা সঙ্গ বলে যদি কিছু হয় মনে॥
সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে।
তোমা সঙ্গবলে যে কিছু প্রকাশে॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—২৪শ পঃ)

আগেকার আঠার রকমের ব্যাখ্যার একটিও না ছুঁইয়া, পুনরায় প্রভু ৬১ রকমের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিলেন।

শঙ্করের প্রতিভা ও বুদ্ধের হৃদয় একসঙ্গে একবারমাত্র বাংলার ইতিহাসে দেখা দিয়াছিল।

প্রভু সনাতনকে বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্র করিবার জন্য আদেশ দিলেন। সনাতন বলিলেন—"মুই নীচ জাতি", আমি স্মৃতিশাস্ত্র করিলে তাহা চলিবে কেন? প্রভু কহে—

যে যে করিতে করিবে তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবে স্ফুরণ ॥
(চৈঃ চঃ, মধ্য—২৪শ পঃ)

রায় রামানন্দকে যিনি শূদ্র জানিয়াও উপদেষ্টার আসন দিয়াছেন, যিনি "নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ", তিনি ম্লেচ্ছ সংস্পর্শে কর্ণাটী ব্রাহ্মণ হইয়াও নিজেকে নীচজাতি বলিয়া পরিচয় দিতেছেন যে—রাজ-মন্ত্রী সনাতন; তাহাকে দিয়াই ইচ্ছা করিয়া বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্র হরিভক্তি বিলাস প্রণয়ন করাইবেন। ইহা মহাপ্রভুর ধর্ম্মের একটি বৈশিষ্ট্য। বিশেষ বিবেচনা করিয়াই প্রভু এই কাজটি করিলেন, অনবধানতাবশতঃ নহে।

তারপর একদিন প্রকাশানন্দের সহিত বেদান্ত বিচার করিয়া শঙ্করের অদ্বৈত মত খণ্ডন করিলেন এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ যে বেদান্তের ভাষ্য, ইহা স্থাপন করিলেন। এই তাঁহার ভ্রমণ শেষ হইল। দিব্যোন্মাদের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহার পরের ছয় বৎসর তিনি একদিকে গৌড়ের শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারে পতিত উদ্ধার ও অন্যদিকে বৃন্দাবনে শ্রীরূপ সনাতনের রসতত্ত্ব, নাটক ও দর্শনশাস্ত্র প্রণয়নের দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত নিরূপণ করা কার্য্য নীলাচলে বসিয়া একসঙ্গে করিয়াছেন। মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই দুইটি গৌড়ীয় ও বৃন্দাবনীয় ধারা যুগপৎ তাঁহার মনে স্থান পাইয়াছে এবং দুই ধারাই একত্রে প্রেরণা পাইয়াছে। মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম্ম শুধু কাব্য, নাটক, দর্শন ও রসতত্ত্ব যেমন নয়—তেমনি আবার কেবল গণ-সংযোগ বা পতিত-উদ্ধারও নয়। এই দুই ধারা একত্রে মিলিয়া মহাপ্রভুর জীবন হইতে উত্থিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে পরিচিত। ইহাই এই ধর্ম্মের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য—সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্যও বলা যায়। ইহাই ভারত ইতিহাসে বাঙ্গালীর দান।

বৃন্দাবনদাস প্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ লেখেন নাই, কিন্তু গৌড়ে রামকেলী গ্রামে আসার কথা বিশদরূপে লিখিয়াছেন। কেননা নবদ্বীপলীলা ও গৌড়ের ভক্তবৃন্দকে কেন্দ্র করিয়া তিনি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সুতরাং গৌড়ে আসিয়া হুসেন শাহর দুই মন্ত্রী সাকর মল্লিক আর দবীর খাসের সহিত গোপন মিলন তিনি প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীপাদ নিত্যানন্দ এবং

পরে তাঁহার মাতা নারায়ণীর নিকট শুনিয়াই লিখিয়াছেন। আবার কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট শুনিয়া লিখিয়াছেন। সুতরাং উভয়ের বর্ণনাই প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হইতে শুনা। সুতরাং এই উভয় বর্ণনার প্রামাণিকতা তুল্য মর্য্যাদা পাইতে পারে। তথাপি বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় হুসেন শাহ সম্পর্কে এমন সব কথা আছে, যাহা কবিরাজ গোস্বামীতে নাই। বৃন্দাবনদাস হুসেন শাহ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

স্বভাবেই রাজা (হুসেন শাহ) মহাকাল যবন।
মহা তমোগুণ বৃদ্ধি হয় ঘনে ঘন॥
উড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক কত কত করিল প্রমাদ॥
দৈবে আসি সত্ত্বগুণ উপজিল মনে।
তেই ভাল কহিলেক আমা সবা স্থানে॥
আর কোন পাত্র আসি কুমন্ত্রণা দিলে।
আর বার কুবুদ্ধি আসিয়া পাছে মিলে॥
যদি কদাচিৎ বলে কেমন গোসাঞি।
আন গিয়া দেখিবারে চাহি এই ঠাঞি॥
অতএব গোসাঞিরে পাঠাই কহিয়া।
রাজার (হুসেন শাহ) নিকট গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া॥

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—৪র্থ অঃ)

বৃন্দাবনদাস এবং কবিরাজ গোস্বামী উভয়েই আশঙ্কা করিলেন যে, হুসেন শাহের সহিত প্রভুর মিলন নিরাপদ নয়। উভয়েই লিখিয়াছেন যে—যদিও প্রভু ভয় পাইলেন না, তথাপি "লৌকিক লীলায়" বুদ্ধিমানের মত লৌকিক ব্যবহার করিলেন অর্থাৎ নীলাচলে ফিরিয়া গেলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় উড়িষ্যায় প্রতাপরুদ্রের সহিত প্রভুর যেরূপ মিলন হইল, গৌড়ে হুসেন শাহের সহিত সেরূপ মিলন দূরের কথা সাক্ষাতই হইল না। উড়িষ্যায় যবনরাজ ভীতি নাই, গৌড়ে তাহা বিলক্ষণ আছে। এই দুই রাজ্যের বিপরীত অবস্থার মধ্যেই প্রভু কৌশলে তাঁহার ভবিষ্যত ধর্ম্মপ্রচারের বীজ বপন করিতেছেন। উভয় রাজ্যের রাজনৈতিক

পরিস্থিতি লক্ষ্য করিবার বিষয়। উড়িষ্যায় হিন্দু রাজত্ব, আর গৌড়ে মুসলমান রাজত্ব। মোগল তখনও দিল্লীতে তাঁহার সাম্রাজ্যের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করে নাই। বাবর ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লী জয় করেন।

শ্রীরূপ-সনাতনের সহিত রামকেলীতে গোপন মিলনের উদ্দেশ্য বৃন্দাবনদাস অপেক্ষা কবিরাজ গোস্বামী আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন। প্রভু শুধু "জননী আর জাহ্নবী" দর্শন করিবার জন্য গৌড়ে আসেন নাই। হুসেন শাহর দুই মন্ত্রীর সহিত নীলাচলে গোপনে পত্র ব্যবহার চলিতেছিল এবং তাহারই ফলে তিনি এই দুই মন্ত্রীর সহিত গোপন কথা বলিবার জন্য গৌড়ে আসিয়াছিলেন। প্রভু স্পষ্টই বলিয়াছেন—

গৌড় নিকট আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা মিলিবারে ইহ আগমন॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—১ম পঃ)

অতএব শুধু "জননী আর জাহ্নবী" নয়, শ্রীরূপ-সনাতনকে মন্ত্রীত্ব ছাড়িয়া প্রভুর বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত হইবার জন্যই গোপন পরামর্শের প্রয়োজন হইয়াছিল।

বৃন্দাবনদাস বাংলাদেশে ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পর্কে এইসময়কার একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, যাহা কবিরাজ গোস্বামী করেন নাই।

ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি।
তাহারে সেবেন সভে মহা দম্ভ করি॥
ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে॥
যোগী পাল, ভোগী পাল, মহী পালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্ব্বলোক আনন্দিত॥

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—৪র্থ অঃ)

পাল রাজাদের কীর্ত্তিকাহিনী তখনপর্য্যন্তও বাংলার আকাশে ধ্বনিত হইতেছে। গৌড় দেশে যে পটভূমিকার উপর মহাপ্রভুর নূতন

বৈষ্ণব ধর্ম্ম গড়িয়া উঠিতেছে, আমরা তাহার একটি সংক্ষিপ্ত সুন্দর চিত্র বৃন্দাবনদাসের নিকট পাইলাম। বাংলার তৎকালীন ইতিহাস জানিতে হইলে কবিরাজ গোস্বামী অপেক্ষা বৃন্দাবনদাসই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। তৎকালীন ইতিহাস আর পাওয়া যায় কবিকঙ্কনের চণ্ডীতে।

বৃন্দাবনদাস মথুরা-বৃন্দাবন ভ্রমণ লেখেন নাই। একই কারণ। ইহা নবদ্বীপের ভক্তমণ্ডলীর সহিত সংশ্লিষ্ট নয়। সুতরাং বৃন্দাবনদাস ইহা বাদ দিয়াছেন। বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে প্রয়াগে দশ দিন শ্রীরূপকে ও কাশীতে দুই মাস শ্রীসনাতনকে যে শিক্ষা দিলেন, বৃন্দাবনদাস তাহাও লেখেন নাই। শ্রীরূপ-সনাতনকে শিক্ষাদান সম্পর্কে বৃন্দাবনদাস যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ইতিহাসসম্মত নয়। এক্ষেত্রে কবিরাজ গোস্বামীর উপর নির্ভর করিতে হইবে। প্রভু রায়ের নিকট গোদাবরী তীরে যেসকল সিদ্ধান্ত শুনিয়াছিলেন, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে সেই রায়-কথিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপদেশ করিলেন। সুতরাং প্রভুর উপর রায়ের সিদ্ধান্তের প্রভাব আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। রায়কে প্রভু তাঁহার উপদেষ্টা বলিয়া সম্মান দিয়াছেন। রায় অবশ্য অতি বিনয়পূর্ব্বক প্রভুকে বলিয়াছেন—"তুমি যে কহাও সেই কহি বাণী"।

শ্রীরূপ-সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠাইবার পরেই, নীলাচলে ফিরিয়া প্রভু শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে প্রচারের জন্য পাঠাইলেন। একই পরিকল্পনা গৌড় ভ্রমণ ও মথুরা-বৃন্দাবন ভ্রমণে কার্য্য করিয়াছে। বৃন্দাবনে শ্রীরূপ-সনাতনকে প্রেরণ ও গৌড়দেশে শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে প্রেরণ একই সঙ্গে যিনি করিয়াছেন, তাঁহার মনের মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মের প্রচার সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিশ্চয়ই ছিল এবং সেই পরিকল্পনা তিনি সুকৌশলে সম্যকরূপে গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। নবদ্বীপলীলায় যেধরণের সংগঠনকারী নেতৃত্ব আমরা দেখিয়াছি; যেরূপ বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন রুচির লোককে একত্র করিয়া তিনি দল গঠন করিয়াছিলেন; পুরীলীলায় মথুরা-বৃন্দাবন ও গৌড়দেশে প্রচারের জন্য তিনি যে দুঃসাহস ও কৌশল অবলম্বন করিলেন—ইহাতে তাঁহার আর এক প্রকার নেতৃত্ব প্রকাশ পাইল। নেতৃত্ব উভয় লীলাতেই সমান রহিয়াছে। সংগঠনশক্তি উভয় লীলাতেই সমান কার্য্যকরী হইয়াছে।

প্রভুর ভাবোন্মত্ততা ও যুগলরস আস্বাদন তাঁহার ইতিহাসবিশ্রুত "বৈষ্ণব সমাজ" সংগঠনে বিঘ্ন উৎপাদন করে নাই, বরং সাহায্যই করিয়াছে। দল সংগঠন করিবার শক্তি তাঁহার নেতৃত্বে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

আমার প্রিয় সুহৃদ ডাঃ সুশীলকুমার দে তাহার বৃহৎ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে (Vaisnava Faith and Movement in Bengal) এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে—

"শ্রীচৈতন্যদেব কোন সময়েই তাহার শিষ্যদের লইয়া একটি দল গঠন করিবার চেষ্টা করেন নাই। ভাবোন্মত্ততায় তিনি এতই মগ্ন থাকিতেন যে, তিনি কোন নূতন ধর্ম্ম বা প্রতিষ্ঠান গড়িবার চেষ্টাও করেন নাই। শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তীয়েরা তাঁহাকে একজন অতি বড় সংগঠনকারী নেতা এবং এক নূতন মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করা ভিন্ন তিনি আর বেশী কিছু করেন নাই। তদতিরিক্ত আর কিছু করিয়াছেন ভাবিলে, তাঁহার সমস্ত জীবনচরিতকে ভুল করিয়া বুঝা হইবে। ভাবোন্মত্ততায় তিনি এত বেশী মগ্ন থাকিতেন যে, একটা নূতন ধর্ম্ম বা সমাজ গড়িবার সময়ও তাঁহার ছিল না এবং সে ইচ্ছাও তাঁহার ছিল না।"*

* He (শ্রীচৈতন্য) did not at any time of his career concern himself directly with the organisation of his followers. Absorbed in his devotional ecstasies, he hardly ever thought to build up a cult or a sect.···Followers would feign to see in him a great organiser and expounder of a system, but neither propagating zeal nor theological ambition ever entered his simple life of intense religious emotion. If some notable conversions were achieved, they were not the result of any direct missionary effort on his part.···To attribute this achievement to any conscious effort or purpose is to misread the whole trend of his life.···He never had, in his emotional absorption, either the time or the willingness to found a sect or a system.

[Vaisnava Faith & Movement in Bengal—77-78 pages]

সমস্ত বাংলা চরিতগ্রন্থগুলি, যাহা আমি এযাবৎ আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, ডাঃ দে'র এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। কি চরিতগ্রন্থগুলির জীবন্ত বর্ণনায়, কি প্রত্যক্ষ ইতিহাস প্রমাণে—ডাঃ দে'র কথার সমর্থন তো নাই-ই বরং স্পষ্ট উল্টা কথাই আছে। শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে প্রচারের জন্য প্রেরণের সময় প্রভু শ্রীবাসের বাড়ীতে অভিষেক-উৎসবে তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া স্পষ্ট নিজমুখে বলিলেন যে—নিশ্চিন্ত আলস্যে বসিয়া শুধু যুগলরস আস্বাদন করিবার জন্য তিনি অবতার হন নাই। তিনি শ্রীপাদকে বলিলেন—যদি তুমি মুনিধর্ম্ম করিয়া বসিয়া থাকিবে, প্রচার না করিবে তবে "অবতার কি নিমিত্ত করিলে আমারে"। বৌদ্ধ বিপ্লবের পর বাংলাদেশে বৈষ্ণব আন্দোলনের মত এত বড় বিপ্লব ইতিহাসে দেখা যায় না। আর এই বিপ্লবের পরিকল্পনা লইয়া যিনি পূর্ণ সফলতার সহিত একাদিক্রমে বৎসরের পর বৎসর অবিসংবাদিতরূপে ইহার নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সংগঠন করিবার শক্তি ছিল না অথবা তাঁহার নূতন কোন ধর্ম্মমত প্রচার করিবার ইচ্ছা ছিল না বলা তাঁহার জীবন-চরিতকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝিবার একটি মারাত্মক দৃষ্টান্ত ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে!

একাদশ বক্তৃতা

[শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে প্রচারের জন্য প্রেরণের হেতু ও কাল নিরূপণ। ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন। দামোদর পণ্ডিতকে কেন শচীমাতার নিকট প্রেরণ করিলেন? ঠাকুর হরিদাস নাম-জপের কী নূতন ব্যাখ্যা দিলেন? শ্রীসনাতনের দেহত্যাগের সংকল্প ও চৈতন্যদেবের নিষেধের হেতু কী? পানিহাটীতে নিত্যানন্দের চিড়া মহোৎসব। চৈতন্যদেব পরে কোন আপত্তি করিয়াছিলেন কি-না? চৈতন্য-দেবের দেহত্যাগের পূর্ব্বাভাস কে প্রথম পাইয়াছিল? ঠাকুর হরিদাসের নির্ব্বাণ উপলক্ষ্যে চৈতন্যদেবের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।]

শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়দেশে প্রচারের জন্য আদেশ দিলেন। ইহা ১৫১৫ খৃষ্টাব্দ কিম্বা ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। নবদ্বীপে শ্রীবাসের বাড়ীতে অভিষেকের সময় শ্রীচৈতন্যদেব আচার্য্য অদ্বৈতের কথামত স্ত্রী, শূদ্র, মূর্খ আদি আচণ্ডালে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সে কথা তিনি বিস্মরণ হন নাই—তাঁহার মনে আছে। সুতরাং নিত্যানন্দ প্রভুকে সত্বর নবদ্বীপে গিয়া গৌড়দেশে প্রচার আরম্ভ করিবার আদেশ দিলেন।

শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজমুখে।
মূর্খ, নীচ, দরিদ্র ভাসাব প্রেমসুখে॥
তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম্ম করি।
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার॥
ভক্তিরস দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্ত করিলে॥
এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও॥

মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সভার মোচন॥

তারপর—

আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দ চন্দ্র সেই ক্ষণে।
চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজ গণে॥

(চৈঃ ভাঃ—৪৫৪ পৃঃ)

ইহা বৃন্দাবনদাস লিখিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্য। সুতরাং বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীমুখ হইতে এই সকল কথা শুনিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। অতএব ইহার প্রামাণ্য মর্য্যাদা খুব বেশী। (ইতিহাসেও নিত্যানন্দ প্রভুর গৌড়দেশে প্রচারের মূল্য খুব বেশী।)

(শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর প্রচারের একশত বৎসর পরে কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ বাংলা দেশে আসে। চৈতন্য চরিতামৃতে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের যেসকল অভিনব সিদ্ধান্ত প্রচলন করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহার একশত বৎসর পূর্ব্বে বাংলা দেশে নিত্যানন্দ প্রভুর প্রচার সাফল্য লাভ করিয়াছে। সমাজের নিম্নস্তরের উপেক্ষিত এক বড় অংশকে নিত্যানন্দ প্রভু বৈষ্ণব ধর্ম্মে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ১৫১৫ হইতে ১৬১৫ খৃষ্টাব্দ—এই একশত বৎসর চৈতন্য চরিতামৃতের পূর্ব্বে নিত্যানন্দ প্রভুর প্রচার যে গণ-সংযোগ করিয়াছিল, পরবর্ত্তী ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। আর এই প্রচার মহাপ্রভুর জীবদ্দশাতেই আরম্ভ হইয়াছিল। গৌড়বঙ্গে এই প্রথম একশত বৎসর (১৫১৫—১৬১৫ খৃঃ) প্রচারের একখানি পৃথক ইতিহাসগ্রন্থ সংকলিত হওয়া প্রয়োজন।

(শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর প্রচার আরম্ভ হইবার পরেও মহাপ্রভু আঠার বৎসর নীলাচলে দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের প্রচার ও তাঁহার ফল মহাপ্রভুর জীবনে এক অবিচ্ছেদ্য ও অবিছিন্ন অংশ। কাজেই ইহা কিছুটা বিস্তারে বলা আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

তিন মাস বৈ নিত্যানন্দ গৌড় গেলা।
ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন পাতিলেক খেলা॥

নিত্যানন্দ কহিলেন ভাস্কর দাসে।
ঘরে ঘরে শ্রীমূর্ত্তি দেহ গৌড়দেশে॥

(চৈঃ মঃ—উত্তর খণ্ড)

প্রচারের সাফল্যের জন্য নিত্যানন্দ প্রভুই প্রথমে রাঢ়ে ও গৌড়ে মহাপ্রভুর মূর্ত্তি গড়িয়া ঘরে ঘরে পূজা করিবার আদেশ দেন ও ব্যবস্থা করেন। ইহা মহাপ্রভুর জীবিতকালেই নিত্যানন্দ প্রভু করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাধারণের মধ্যে যে শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্ত্তি পূজার প্রচলন অদ্যাপি আছে, প্রচারব্যপদেশে এই প্রথার প্রবর্ত্তক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু। খেতুরীর মহোৎসব ইহার অনেক পরের ঘটনা।

ইহার একশত বৎসর পরে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের যে সিদ্ধান্ত বাংলায় আসিবে, তাহাতে শ্রীগৌড়াঙ্গের মূর্ত্তি পূজা নয়, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি পূজা করার কথাই থাকিবে। ইতিহাসপথে বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্ম বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সিদ্ধান্তের দিকেই বেশী আকৃষ্ট হইবে।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু পানিহাটীকে কেন্দ্র করিয়াই প্রথম প্রচার আরম্ভ করিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল হইতেই আমরা ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাই।

আগে পানিহাটী আর আকনা মহেশ।
পূণ্যভূমি সপ্তগ্রাম ধন্য রাঢ় দেশ॥
আগরপাড়া কুমারহট্ট চৌহাটা।
খড়দা কোটাল তাম্বুলি পাথরঘাটা॥
হাথিয়াগড় ছত্রভোগ বরাহনগর।
কোঠরঙ্গ বাণীদিঘী চাতরা মনোহর॥
হাথিয়াকান্দা পাঁচপাড়া বেতরবুঢ়ল।
অম্বুয়া বড়গাদি কাঁচপাড়া সুপত্তন॥
কাশী আই পঞ্চ আদ্দারি আদহ কলিআ।
থানাচৌড়া ফুলিয়া দোগাছিআ॥
নিমদা চৌয়ারিগাছা উদ্ধ্রনপুর নৈহাটী।
বসই বেনড়াখণ্ড হাটাই চরখি॥

(চৈঃ মঃ—বিজয় খণ্ড)

ভূগোল না জানিলে ইতিহাস জানা সম্পূর্ণ হয় না। নিত্যানন্দ প্রভুর প্রচার কোন্ দিক হইতে কিরূপে আরম্ভ হইল, ইহা জানা দরকার। কেননা, অদ্যাপিহ এতবড় প্রচার বাংলার ইতিহাসে আর দেখা যায় না। বিশেষতঃ আধুনিক যুগ একটা প্রচারেরই যুগ।

কিরূপ বেশে নিত্যানন্দ প্রভু প্রচারে বাহির হইলেন, তাহাও এক অদ্ভুত ব্যাপার। তিনি সন্ন্যাসী মানুষ—অবধৌত, অর্থাৎ সর্ব্বসংস্কার মুক্ত ; কিন্তু প্রচারব্যপদেশে তিনি সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিয়াছেন, যোদ্ধৃবেশ ধারণ করিয়া যেন যুদ্ধে চলিয়াছেন। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

মহামল্ল বেশ ধরে অবধূত রায়ে।
রুণু-ঝুণু কণক নূপুর বাজে পায়ে॥
সুবর্ণ বৈদূর্য্য বিক্রম মুক্তাদাম।
ত্রৈলোক্যসুন্দর রূপ দেখি অনুপাম॥
হেমজড়িত গজমুক্তা শ্রুতিমূলে।
কত রক্তোৎপল রাঙ্গা চরণ কমলে॥
লটপটি পাতাড়ি পিন্ধন পাটবাস।
আখণ্ড পূর্ণচন্দ্র বদন প্রকাশ॥
আরক্ত লোচন ভ্রহি মদন কামান।
কটাক্ষে সন্ধানে সব বিধির নির্ম্মাণ॥
মৃদুমধুর সুধা বচন গম্ভীর।
গজেন্দ্র গমনমত্ত চলন অস্থির॥
সুচারু দশন মণিমাণিক্যের ছটা।
চরণে আসিয়া পড়ে মুক্তা গোটা গোটা॥
নানাফুলে বিরচিত গলে দিব্য মালা।
ধরণি আন্দোলে যেন রহি রহি লোলে॥
গ্রামে গ্রামে নগরে সেবক প্রতিঘরে।
চৈতন্য আনন্দে নিত্যানন্দ নৃত্য করে॥

(চৈঃ মঃ—বিজয় খণ্ড)

নিত্যানন্দ প্রভু যার যার ঘরে নৃত্য করিয়াছিলেন, তা'দের নাম পর্য্যন্ত আছে।

(মহাপ্রভু নীলাচলে থাকিয়া সমস্তই শুনিতেছিলেন, কিছুই তাঁহার অবিদিত ছিল না। ফিরিবার পথে প্রয়াগে শ্রীরূপকে এবং কাশীতে শ্রীসনাতনকে শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়া মথুরা এবং বৃন্দাবনে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তাহার পরই নীলাচলে আসিয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়দেশে প্রচারে পাঠাইলেন।)

(বৃন্দাবনে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন বহু গ্রন্থ লিখিয়া মাধুকরী মাগিয়া খাইয়া এক এক বৃক্ষতলে এক এক রাত্রি শয়ন করিয়া যেরূপ কঠোরতার সঙ্গে জীবন ধারণ করিতেছিলেন, তাহার সহিত গৌড়দেশে নিত্যানন্দ প্রভুর প্রচারপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। অথচ এই দুই প্রকারের প্রচারপদ্ধতি মহাপ্রভু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। নিত্যানন্দ প্রভুর গণ-সংযোগ এবং শ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামীর রসশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি প্রণয়ন—মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত একই বৈষ্ণব ধর্ম্মের দুইটি অঙ্গ বিশেষ। ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভুর জীবিতকালেই নিত্যানন্দ প্রভু প্রবর্ত্তিত ধারা গৌড়ে ও রাঢ়ে প্রবাহিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রসতত্ত্বের ধারা আসিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর প্রবর্ত্তিত ধারার সহিত মিলিত হইয়াছে। নিত্যানন্দ প্রভু প্রচার করিয়াছেন, ভাগবতে যাহাকে বলে অকিঞ্চন-সমরস ; আর শ্রীরূপ-সনাতন প্রচার করিয়াছেন যুগল-রস। দুইটি ভিন্ন ধারায় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পরপর ইহা বাংলাদেশে মহাপ্রভুর নামাঙ্কিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম নামে প্রচারিত হইয়াছে। এই দুই ধারাই মহাপ্রভুর জীবিতকালে মহাপ্রভুর জীবন হইতেই উদ্ভব হইয়াছে। মহাপ্রভু জীবনী আলোচনায় এই দুইটি বিশেষ ধারা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

নীলাচলে মহাপ্রভু নিজে কঠোর সন্ন্যাসব্রত পালন করিয়া দেহ ধারণ করিতেছিলেন। গৌড়দেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া যেসকল পদ্ধতি নিত্যানন্দ প্রভু অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা প্রভুর অনুমোদিত ছিল কি-না—ইহা লইয়া সেই কালেই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। মহাপ্রভুর নিকট নিত্যানন্দ প্রভুর আচরণ সম্বন্ধে কটাক্ষ করিয়া লোকেরা লাগানি করিয়াছিল। মহাপ্রভু সেই সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন। আমরা চরিতগ্রন্থে ইহার উল্লেখ ও প্রমাণ পাই।

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

সেই নবদ্বীপে এক আছেন ব্রাহ্মণ।
চৈতন্যের সঙ্গে তান পূর্ব্ব অধ্যয়ন॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বিলাস।
চিত্তে কিছু তান জন্মিয়াছে অবিশ্বাস॥
চৈতন্যচন্দ্রেতে তান বড় দৃঢ় ভক্তি।
নিত্যানন্দ স্বরূপের না জানে শক্তি॥

নীলাচলে এই সন্দিগ্ধ ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল—

বিপ্র কহে প্রভু মোর এক নিবেদন।
করিমু তোমার স্থানে যদি দেহ মন॥
নবদ্বীপ গিয়া নিত্যানন্দ অবধূত।
কিছুই না বুঝোঁ করেন কিরূপ॥
সন্ন্যাস আশ্রম তান বলে সর্ব্বজন।
কর্পূর তাম্বুল যে ভক্ষণ অনুক্ষণ॥
ধাতু দ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোণা রূপা মুক্তা সেসকল কলেবরে॥
কাষায় কৌপিন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস।
ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস॥
দণ্ড ছাড়ি লৌহ দণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে যে থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥
শাস্ত্রমত মুঞি তার না দেখোঁ আচার।
এতেকে মোহের চিত্তে সন্দেহ অপার॥
বড়লোক বলি তাঁরে বোলে সর্ব্বজনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে॥

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—৬ষ্ঠ অঃ)

ব্রাহ্মণের সন্দেহের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু হাসিয়া উত্তর দিলেন—

শুন বিপ্র—যদি মহা অধিকারী হয়।
তবে তান গুণ দোষ কিছু না জন্ময়॥
পদ্মপাত্রে কভু যেন না লাগয়ে জল।
এইমত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্ম্মল॥

পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র সর্ব্বদা বিহরে॥

তারপর অনধিকারীর জন্য মহাপ্রভু একটা সাবধানবাণী বলিলেন—

অধিকারী বই করে তাঁহান আচার।
দুঃখ পায় সেই জন পাপ জন্মে তার॥
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষ পান।
সর্ব্বথায় মরে সর্ব্ব পুরাণ প্রমাণ॥

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—৬ষ্ঠ অঃ)

জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থেও ইহার আভাস আছে—

নীলাচলে বিপ্র আর গৌরাঙ্গ রহিলা।
নিত্যানন্দে গৌড়রাজ্য প্রভু সমর্পিলা॥
কতোদিনে নিত্যানন্দ রথযাত্রা কালে।
সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে গেলা নীলাচলে॥
গৌরচন্দ্র জিজ্ঞাসিল শ্রীপাদ গোঁসাই।
তোমার গৌড়রাজ্যে কার অধিকার নাই॥
কর্ত্তাল মৃদঙ্গ যন্ত্র মাল্য চন্দনে।
শিঙ্গা বেত্র গুঞ্জাহার নূপুর আভরণে॥
মহোৎসব মাগিয়া নাচেন সংকীর্ত্তনে।
হেন যুক্তি তোমারে দিলেক কোনজনে॥

(চৈঃ মঃ—উত্তর খণ্ড)

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, মহাপ্রভু হেন যুক্তি দেন নাই। বরং কথার ভাবে বুঝা যায় যে, ইহা তাঁহার তেমন অভিপ্রেত নয়। শুনিয়া নিত্যানন্দ বিচলিত হইলেন না, একটু হাসিলেন মাত্র। স্থানকালপাত্র উপযোগী যে সহজ প্রচার পদ্ধতি তিনি অবলম্বনং করিয়াছেন, তাহাই যুগ-প্রয়োজন বলিয়া তিনি মহাপ্রভুকে বুঝাইয়া নিজ মত বহাল রাখিলেন—

শুনি নিত্যানন্দ গোঁসাই হাসি হাসি কহে।
কাঠিন্য কীর্ত্তন কলিযুগ ধর্ম্ম নহে॥

(চৈঃ মঃ—উত্তর খণ্ড)

আমরা দেখিতেছি শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর গৌড়দেশে প্রচার সম্বন্ধে মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁহার কথোপকথন হইয়াছিল। এবং এই কথোপকথন মধ্যে কিছুটা বাদানুবাদও হইয়াছিল। পরে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু "কাঠিন্য কীর্ত্তন কলিযুগ ধর্ম্ম নহে"—এই কথা বলিয়া প্রভুকে প্রবোধ দিয়া নিজ মত ও নিজের প্রচারপদ্ধতি বহাল রাখিলেন। মহাপ্রভু আর কোন আপত্তি করিলেন না।

ছোট হরিদাস উত্তম কীর্ত্তনিয়া ছিলেন, প্রভুকে কীর্ত্তন করিয়া শুনাইতেন। শিখী মাহিতীর ভগিনী মাধবীর নিকট হইতে প্রভুর ভোজনের জন্য "শুক্ল চালু" (চাউল) একমণ মাগিয়া আনিয়াছিল। "বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ"—এই অপরাধে প্রভু তাহাকে বর্জ্জন করিলেন। ছোট হরিদাস প্রয়াগে ত্রিবেণীতে প্রবেশ করিয়া দেহ ত্যাগ করেন।

মাহিতীর ভগিনীর নাম মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখা করে যাঁর রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে মাত্র সাড়ে তিন জন॥
স্বরূপ গোঁসাই আর রায় রামানন্দ।
শিখী মাহিতী তিন আর তার ভগিনী অর্দ্ধজন॥
তার ঠাঞি তণ্ডুল মাগি আনিল হরিদাস।

*　　*　　*　　*

প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পার আমি তাহার বদন॥
আজি হৈতে আজ মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইহা আসিতে না দিবা।

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—২য় পঃ)

এক বৎসর অপেক্ষা করিয়াও যখন ছোট হরিদাসকে প্রভু ক্ষমা বা দয়া করিলেন না, তখন একদিন রাত্রিশেষে তিনি প্রয়াগে চলিয়া গেলেন এবং—

ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল।

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—২য় পঃ)

প্রভুর এই ব্যবহার, হরিদাসের প্রতি এই কঠোর শাস্তি, অনেকের মতে নিষ্ঠুর মনে হইতে পারে। কিন্তু বৈষ্ণব সমাজের নিয়ম রক্ষার জন্যই প্রভুকে এইরূপ কঠোর হইতে হইয়াছিল; নতুবা হরিদাসের প্রতি তাঁহার মন যে দয়াদ্র ছিল ইহার প্রমাণ আমরা পাই। কেননা হরিদাসের দেহত্যাগের পর প্রভু একদিন নিজেই বলিলেন—"হরিদাস কাহা তারে আনহ এখানে"।

দামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে বাক্য দণ্ড করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সেই দণ্ড সচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। উড়িয়া এক ব্রাহ্মণ কুমার—পিতৃহীন দেখিতে সুন্দর ও মৃদু ব্যবহার—মহাপ্রভুকে দেখিতে প্রতিদিন আসিত। প্রভুও তাহাকে দেখিয়া এবং তাহার সহিত কথা কহিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিতেন। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণ বালকের মাতা বিধবা এবং সুন্দরী যুবতী, কাজেই দামোদর পণ্ডিত সেই ব্রাহ্মণ বালকের সঙ্গে প্রভুর মেলামেশা পছন্দ করিতেন না। এবং একদিন প্রভুকে দামোদর পণ্ডিত স্পষ্টই বলিলেন—

রাণ্ডী ব্রাহ্মণী বালকে প্রীতি কেন কর॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী॥
তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোক কানাকানি বাতে দেহ অবসর॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—৩য় পঃ)

ইহাতে প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া দামোদর পণ্ডিতকে বলিলেন—তুমি অতিশয় নিরপেক্ষ ব্যক্তি, যেহেতু তুমি আমাকেও বাক্য দণ্ড করিতে ভয় করিলে না। অতএব তুমি নবদ্বীপ চলিয়া গিয়া আমার মাতার নিকট থাক, যেহেতু তোমার মত রক্ষক আমি আর কাহাকেও দেখিনা; এবং মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া আমাকে দর্শন দিও। প্রভুর চরিত্রের একটা দিক এই সামান্য ঘটনার মধ্যেও সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে।

যবন হরিদাস জাতিতে মুসলমান, তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করায় তাঁহার নাম হইয়াছে ঠাকুর হরিদাস। তিনি রাত্রিদিন তিনলক্ষ নাম সংকীর্ত্তন করেন; একমাসে এক কোটি নাম যজ্ঞ করেন। যখন তিনি

শান্তিপুরে আচার্য্য অদ্বৈতের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন, তখন আচার্য্য অদ্বৈত তাহাকে—

গঙ্গাতীরে গোফা করি নির্জ্জনে তারে দিল।
ভাগবত গীতার ভক্তি অর্থ শুনাইল॥

(চৈ চঃ, অন্ত্য—৩য় পঃ)

আচার্য্য অদ্বৈত, ঠাকুর হরিদাসকে প্রত্যহ ভোজনের জন্য অন্ন পাঠাইয়া দিতেন। তাহাতে ঠাকুর হরিদাস বলিলেন—

মহা মহা বিপ্র হেথা কুলিন সমাজ।
আমারে আদর কর না বসহ লাজ॥

শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন—"তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রাহ্মণ ভোজন"।

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—৩য় পঃ)

কৃষ্ণ অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিল।
জলতুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল॥
হরিদাস করে গোফায় নামসংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবে এই তার মন॥
দুই জনের ভক্তে চৈতন্য কৈল অবতার।
নাম প্রেম প্রচারি কৈল জগত উদ্ধার॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—৩য় পঃ)

শুধু অদ্বৈতের নয়, ঠাকুর হরিদাসের ভক্তিতেও চৈতন্য অবতার হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের অবতার হওয়ার একটি কারণ, হরিদাসের উপর যবনরাজ কর্ত্তৃক বাইশবাজারে চাবুকের আঘাত। প্রভু, ঠাকুর হরিদাসের সহিত প্রথমদিনের সাক্ষাতেই বলিয়াছিলেন—"যেবা গৌন ছিল মোর প্রকাশ করিতে। শীঘ্র আইনু তোর দুঃখ না পারি সহিতে॥" সুতরাং চৈতন্য অবতারে ঠাকুর হরিদাসের জীবন যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ইতিহাস তাহা ভুলিতে পারে না। এখন সমুদ্রতীরে নির্জ্জন গোফা করিয়া ঠাকুর হরিদাস নাম জপ করিতেছেন। এই সময় একদিন মহাপ্রভু হরিদাসের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

হরিদাস কলিকালে যবন অপার।
গো ব্রাহ্মণ হিংসা করে মহাদুরাচার॥

ইহা সবার কোন্ মতে হইবে নিস্তার।
তাহার হেতু না দেখিয়ে এ দুঃখ অপার॥
হরিদাস কহে প্রভু চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ॥
যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে॥
হা রাম হা রাম বলি কহে নামাভাসে॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে হা রাম হা রাম।
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম॥
যদ্যপি সঙ্কেতে তার হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—৩য় পঃ)

নামের তেজ বিনাশ হয় না—ঠাকুর হরিদাস মহাপ্রভুকে এই কথা বুঝাইলেন। তারপর প্রশ্ন উঠিল যে—সকল জীব যদি মুক্ত হইয়া যায়, তবে তো পৃথিবী শূন্য হইয়া যাইবে—তখন কি হইবে? ঠাকুর হরিদাস উত্তর করিলেন—

সূক্ষ্ম জীবে পুনঃ কাজে উদ্বুদ্ধ করিবে॥
সেই জীব হবে ইহা স্থাবর জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্বসম॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—৩য় পঃ)

ইতিপূর্ব্বে ঠাকুর হরিদাস নামজপের এক নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে ঐ অর্থ গৃহীত হইয়াছে।

কেহ বলে নাম হইতে হয় পাপ ক্ষয়।
কেহ বলে নাম হইতে জীবে মোক্ষ হয়॥
হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণ পদে প্রেম উপজয়॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—৩য় পঃ)

মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে হরিদাস কথিত নামজপের মাহাত্ম্য ও নূতন ব্যাখ্যা প্রভু সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন—"নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়"।

তারপর মথুরা হইতে সনাতন নীলাচলে আসিয়া হরিদাসের আশ্রমে উঠিয়া তাহার চরণ বন্দনা করিলেন। ঠাকুর হরিদাস সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন। তারপর মহাপ্রভু আসিয়া সেখানে মিলিত হইলেন। মহাপ্রভুকে দেখিয়াই আস্তেব্যাস্তে সনাতন বলিলেন—

মোরে না ছুঁইও প্রভু পড়ো তোমার পায়।
একে নীচ জাতি অধম আর কণ্ডুরসা গায়॥
বলাৎকারে প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
কণ্ডু ক্লেদ মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গে লাগিল॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—৪র্থ পঃ)

সনাতন মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, রথের সময় জগন্নাথের রথের তলায় পড়িয়া তিনি শরীর ছাড়িবেন। কেননা দুরারোগ্য ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত হইয়াছেন। মহাপ্রভু সনাতনের এই আত্মহত্যার সংকল্প জানিতে পারিয়া বলিলেন—

সনাতন দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে।
কোটী দেহ ক্ষণেক তবে ছাড়িতে পারিয়ে॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় কোন নাই ভক্তি বিনে।

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—৪র্থ পঃ)

প্রভুর কথার মর্ম্ম এই যে, দেহত্যাগ বা আত্মহত্যায় কৃষ্ণ পাওয়া যায় না। এক ভক্তি বিনা আর কোন উপায়েই কৃষ্ণ পাওয়া যায় না। তারপর সনাতনকে প্রভু কহিলেন—তোমার দেহ তুমি আমাকে সমর্পন করিয়াছ, তোমার দেহ আমার। যদি তুমি এখন তোমার এই দেহ বিনাশ কর, তবে তুমি আমার দ্রব্য চুরি করিবে। চুরি করা মহাপাপ। আমার প্রিয়স্থান মথুরা ও বৃন্দাবন, কিন্তু মাতার আজ্ঞায় আমি নীলাচলে বাস করিতেছি। মথুরা-বৃন্দাবন গিয়া আমি ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে পারি না, সুতরাং—"তোমার শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন"।

এত সব কর্ম্ম আমি যেদেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি কেমতে সহিব॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—৪র্থ পঃ)

তারপর ঠাকুর হরিদাসকেও সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন—"নিষেধিও ইহারে যেন না করে অন্যায়"। হরিদাস সনাতনকে বলিলেন—

তোমার দেহ কহে প্রভু মোর নিজ ধন।
তোমা সম ভাগ্যবান নাহি কোন জন॥
আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না লাগিল।
ভারত ভূমেতে জন্মি এ দেহ ব্যর্থ হইল॥
সনাতন কহে তোমা সম কেবা আছে আন।
মহাপ্রভু গনে তুমি মহাভাগ্যবান॥
অবতার কার্য্য প্রভুর নাম প্রচারে।
সে নিজ কার্য্য প্রভু করে তোমা দ্বারে॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—৪র্থ পঃ)

কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বলেন যে, শেষ অষ্টাদশ বৎসর প্রভু নীলাচলে শ্রীরাধার ভাবে ভাবিত হইয়া মগ্ন ছিলেন। গৌড়ে বা মথুরা-বৃন্দাবনে প্রচারকার্য্যে তাঁহার কোনই হাত ছিল না। কিন্তু একথা আদৌ সত্য নয়। নবদ্বীপলীলায় যে প্রতিভা বৈষ্ণব সমাজের সংগঠনে দীপ্তি পাইয়াছিল—নীলাচলে বসিয়া সেই প্রতিভাই গৌড়, বঙ্গ, উৎকল ও মথুরা-বৃন্দাবনে বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম্মকে কেন্দ্রীভূত করিয়া দিগবিদিক্ সূর্য্যরশ্মির মত বিচ্ছুরিত করিয়াছে। মহাপ্রভুই কেন্দ্র, আর সকল প্রচারকেরা বৃত্তাকারে তাহার পরিধির উপর বিচরণ করিয়া মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভু শুধু এই প্রচারের কেন্দ্র নন্, তিনি ইহার নিয়ামক ও পরিচালক।

বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া দিব্যোন্মাদের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে ছয় বৎসর (১৫১৬-১৫২২ খৃঃ), ইহা নিশ্চিন্ত আলস্যে ভাবোন্মাদের ছয় বৎসর নহে। ইহার প্রত্যেকটি বৎসরেই তিনি গৌড়ে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচার ও মথুরা-বৃন্দাবনে শ্রীরূপ-সনাতনের প্রচারকে উৎসাহ দিয়াছেন, নিয়মিত করিয়াছেন ও সংশোধনপূর্ব্বক পরিচালিত করিয়াছেন।*

* ধর্ম্মপ্রচার ইতিহাসের একটি অংশ। ইতিহাসের যে পটভূমিকার উপর এই প্রচার চলিতেছিল, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের থাকা দরকার। কেননা, (১) শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের সহিত তৎকালীন গৌড়ের ইতিহাস

ইতিমধ্যে পাণিহাটিতে নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথ দাসকে দিয়া চিড়া মহোৎসব আরম্ভ করিলেন।

চিড়া দধি মহোৎসব খ্যাত নাম যার।

*　　　*　　　*

এক ঠাঞি তপ্ত দুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া।
অর্দ্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া॥
অর্দ্ধেক ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধেতে ছানিল।
চাঁপাকলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল॥

*　　　*　　　*

উদ্ধারন দত্ত আদি যত আর নিজ জন।
উপরে বসিল সব কে করে গণন॥
শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র এলা।
মান্য করি প্রভু সবারে উপরে বসাইলা॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—৬ষ্ঠ পঃ)

জড়িত। (২) উড়িষ্যার প্রচারের সহিত প্রতাপরুদ্রের ইতিহাস জড়িত। (৩) শ্রীরূপ-সনাতনের মথুরা-বৃন্দাবনের প্রচারের সহিত দিল্লী ও আগ্রার ইতিহাস জড়িত।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যখন গৌড়ের প্রচার আরম্ভ করেন (১৫১৬ খৃঃ), তখন হুসেন শাহর রাজত্বকাল শেষ হইবার দুই কিম্বা চার বৎসর বাকী। হুসেন শাহ্ ১৮টি পুত্র রাখিয়া মারা যান। জ্যেষ্ঠ নসরৎ শাহ্ ১৫১৮ কিম্বা ১৫২০ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের রাজা হন। এবং যে বৎসর (১৫৩৩ খৃঃ) পুরীতে প্রভুর তিরোভাব ঘটে, সেই বৎসরই গৌড়ে নসরৎ শাহকে তাঁহার একজন ভৃত্য (খোজা) গুপ্তহত্যা করে। সুতরাং পুরীতে প্রভুর দিব্যোন্মাদের দ্বাদশ বৎসর (১৫২২—১৫৩৩ খৃঃ) গৌড়ে নসরৎ শাহের রাজত্বকাল। নসরৎ শাহের রাজত্বকালে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের সহিত যেসকল সংঘর্ষ হইয়াছিল, চরিতগ্রন্থে তাহার দুইএকটি মাত্র উল্লেখ আছে—বেশী অথবা বিস্তৃত বর্ণনা নাই। রাজশক্তির সহিত সংঘর্ষ ব্যতিরেকে গৌড়ে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচার নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় নাই। গৌড়ে নসরৎ শাহের সময়ে দিল্লীতে পাঠান সাম্রাজ্য ধ্বংস হইতেছে, আর তার স্থানে মোঘল সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হইতেছে। গৌড়েও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। পাণিপথের বিখ্যাত যুদ্ধে মোঘল বাবর পাঠান সম্রাট ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও হত্যা করেন। ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মহম্মদ লোদী গৌড়ে পলাইয়া আসেন ও নসরৎ শাহের আশ্রয় লন। নসরৎ মহম্মদকে আশ্রয় দেন।

এই ইতিহাসে স্মরণীয় চিড়া মহোৎসবে নিত্যানন্দ প্রভু এক অলৌকিক কার্য্য করিলেন। তিনি ধ্যানে মহাপ্রভুকে নীলাচল হইতে সশরীরে এই চিড়া মহোৎসবে আনয়ন করিলেন।

ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল॥
মহাপ্রভু এলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তারে লঞা সবা চিড়া দেখিতে লাগিলা॥
সকল কুণ্ডি হোলনার চিড়া একেক গ্রাস।
মহাপ্রভু মুখে দেন করি পরিহাস॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—৬ষ্ঠ পঃ)

মহাপ্রভু যে সশরীরে চিড়া মহোৎসবে আসিয়াছিলেন, তাহা সকলে দেখিতে পান নাই—

মহম্মদ ইব্রাহিম লোদীর এক কন্যাকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। নসরৎ সেই কন্যাকে খুব ঘটা করিয়া বিবাহ করেন। বাবর গৌড় আক্রমণে বহির্গত হইয়া বেহারের উত্তরাংশ পর্য্যন্ত আসিয়া পরেন। নসরৎ বাবরের সহিত সন্ধি করেন (১৫২৯—৩০খৃঃ)। তাহাতে এই সর্ত্ত থাকে যে—গৌড়েশ্বর নসরৎ বাবরের বিদ্রোহী আফগানদের আশ্রয় দিবে না, সাহায্য করিবে না এবং বাবর বাংলা আক্রমণ করিবে না। ১৫৩০—৩১ খৃষ্টাব্দে বাবরের আগ্রাতে মৃত্যু হয়।

গৌড়ের ইতিহাসে মোঘল-পাঠান প্রতিদ্বন্দ্বীতা রাজশক্তির মধ্যে একটা সংঘর্ষের সূত্রপাত করিল, সেই সময় গৌড়ে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর প্রচার চলিতেছে। এবং নীলাচলে মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদ অবস্থায় মনোরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন—বাস্তব জগৎ বা তাহার ইতিহাসের সহিত কোনই সম্পর্ক নাই।

এদিকে উড়িষ্যায় প্রতাপরুদ্রের ইতিহাস (১৫১০—১৫২০ খৃঃ) যুদ্ধবিগ্রহে পূর্ণ। প্রভু যখন ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে পুরী পৌছিলেন, প্রতাপরুদ্র তখন বিজয়নগরে কৃষ্ণদেব রায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন। প্রতাপরুদ্রের অনুপস্থিতিতে হুসেন শাহ উত্তর উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া বহু দেব মন্দির ধ্বংস করিলেন। বিজয়নগরে যুদ্ধকালীন প্রতাপরুদ্র এই কথা শুনিয়া—"বড় ক্রোধ করি তিন মাসে আসিলেক" (মাদলাপাঞ্জি)। জগন্নাথমন্দিরের মাদলাপাঞ্জিতে হুসেন শাহকে "গৌড় পতিশা, অমুড়া সুরথান," অর্থাৎ আমীর সুলতান বলা হইয়াছে। ১৫১১ খৃষ্টাব্দে প্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে, প্রতাপরুদ্র হুসেন শাহকে পিছু তাড়া করিয়া হুগলী জেলার মন্দারণ গড় পর্য্যন্ত গেলেন। কিন্তু প্রতাপরুদ্র তাঁহার মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধর ভৈ'র বিশ্বাস-

মহাপ্রভু দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে।

নিত্যানন্দ প্রভুর প্রবর্ত্তিত এই চিড়া মহোৎসব পংক্তিভোজনে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা লোপ পাইতে বসিল এবং ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়াছিল। কবিরাজ গোস্বামীর মতে মহাপ্রভুর নীলাচল হইতে চিড়া মহোৎসবে পাণিহাটীতে আসা কিছুই অসম্ভব নয়, কেননা তর্ক না করিয়া তিনি অলৌকিকে বিশ্বাস করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে জয়ানন্দ কিছু গোল বাধাইয়াছেন।

জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রভুকে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

মহোৎসব মাগিয়া নাচেন সংকীর্ত্তনে।
হেন যুক্তি তোমারে দিলেক কোন জনে॥

(জয়া, চৈঃ মঃ—উত্তর খণ্ড)

ঘাতকতায় পরাজিত হইয়া, হুশেন শাহর সহিত সন্ধি করিলেন। ১৫১২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ করিয়া পুরী ফিরিয়াছেন। প্রতাপরুদ্র এই সংবাদ পাইয়া কটক হইতে পুরী আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই বৎসরই পুনরায় কৃষ্ণদেব রায় উড়িষ্যা আক্রমণ করিলেন। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায় উদয়গিরি দুর্গ অবরোধ করিলেন। দেড় বৎসর অবরোধের পর ১৫১৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন এই দুর্গের পতন হইল। প্রতাপরুদ্র কোণ্ডভীরু দুর্গ অভিমুখে পলায়ন করিলেন। ১৫১৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে মহাপ্রভু গৌড় যাত্রা করিলেন। প্রতাপরুদ্র সেই সময় পুরীতে ছিলেন এবং প্রভুর গৌড় যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন কোণ্ডভীরু দুর্গের পতন হইল। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রতাপরুদ্রকে পরাজিত করিয়া কৃষ্ণদেব রায় নিজরাজ্য বিজয়নগরে চলিয়া গেলেন। প্রভু তখন বৃন্দাবন ভ্রমণ শেষ করিয়া নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইহার কোন এক বৎসরে প্রতাপরুদ্র গৌড় আক্রমণ করিতে সংকল্প করিয়া প্রভুর নিকট পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। প্রভু গৌড় আক্রমণ করিতে নিষেধ করিয়া কাঞ্চিদেশ অর্থাৎ বিজয়নগর আক্রমণ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। এরূপ পরামর্শ দিবার কারণ জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে, এরূপ করিলে হুসেন শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করিবে—"উড্রদেশ উচ্ছন্ন করিবেক যবনে। জগন্নাথ নীলাচল ছাড়িব এতদিনে॥" সুতরাং প্রতাপরুদ্র গৌড় আক্রমণ করিলেন না। কাজেই দেখা যাইতেছে প্রভু দিব্যোন্মাদ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রতাপরুদ্রকে যুদ্ধবিগ্রহাদি ব্যাপারে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া সুচিন্তিত পরামর্শ দিতেছেন। প্রভু যুদ্ধবিরোধী ছিলেন না। তিনি প্রতাপরুদ্রকে, "কাঞ্চীদেশ জিনি

জয়ানন্দের কথায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মহোৎসব করিবার যুক্তি নিত্যানন্দ প্রভুকে তিনি দেন নাই। মহাপ্রভু যদি চিড়া মহোৎসবে সত্যই সশরীরে আসিয়া থাকেন বা ভাব শরীর লইয়াও আসিয়া থাকেন, তবে জয়ানন্দের কথার কি অর্থ হয়? অথচ জয়ানন্দের কথার উত্তরে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—"কাঠিন্য কীর্ত্তন কলিযুগ ধর্ম্ম নহে"। মহোৎসবে জাতিভেদ-ভঙ্গকারী পংক্তিভোজন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুই প্রবর্ত্তন করেন।

প্রচারের সাফল্যের জন্য জাতিভেদ-বিরোধী মহোৎসবের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজনবোধেই নিত্যানন্দ প্রভু মহোৎসব প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, বিনা প্রয়োজনে করেন নাই। মহাপ্রভু হইতে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু এক্ষেত্রে অধিকতর উদার। এইবার ঠাকুর হরিদাসের নির্বানের কথা আসিতেছে।

মহাপ্রভু সংবাদ পাইলেন, ঠাকুর হরিদাসের ভোজ্য অভুক্ত পরিয়া থাকে। হরিদাস অসুস্থ মনে করিয়া, প্রভু নিজেই আসিলেন। বলিলেন—"হরিদাস সুস্থ হও"। হরিদাস উত্তর করিলেন—"শরীর সুস্থ হয় মোর; অসুস্থ বুদ্ধি আর মন॥"

কর নানা রাজ্য"—বলিলেন। কিন্তু গৌড় আক্রমণ করিতে উত্তম কারণ দেখাইয়া নিষেধ করিলেন। কৃষ্ণদেব রায় প্রতাপরুদ্রকে পরাজিত করিয়া "গজপতি সপ্তাঙ্গহরণ" ও "উৎকল ভূমিধর দর্পহরণ" উপাধি গ্রহণ করিলেন। তারপরে সন্ধি হইল। প্রতাপরুদ্র তাঁহার এক কন্যাকে কৃষ্ণদেব রায়ের সহিত বিবাহ দিলেন। এই রাজকুমারীর নাম ভদ্রা। উৎকল-রাজকুমারী কৃষ্ণদেবের তিন পট্ট মহিষীর অন্যতম ছিলেন। প্রতাপরুদ্রের এক রাণী কোণ্ডাপল্লী দুর্গে বন্দী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় প্রতাপরুদ্রের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার রাণীকে ফিরাইয়া দিলেন। ১৫২০ খৃষ্টাব্দের পর প্রতাপরুদ্রকে আর যুদ্ধ করিতে হয় নাই। কৃষ্ণদেব বা তা'র পরবর্ত্তী রাজা অচ্যুত রায় অথবা হুশেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ তাহাকে বিব্রত করেন নাই। এই সময় হইতে প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া এবং উড়িয়া-বৈষ্ণব জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ দাস প্রভৃতির সহিত বৈষ্ণব শাস্ত্র আলাপ করিয়া মহাপ্রভুর তিরোধানের ৬।৭ বৎসর পর (১৫৪০ খৃঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। Prataprudra died either late in 1539 or early in 1540 A. D.—History of Orissa—Vol I, Page 338, by R. D. Banerjee.

প্রভু কহে কোন ব্যাধি কহতো নির্ণয়।
তিঁহ কহে সংখ্যা কীর্ত্তন না পুরয়॥
প্রভু কহে বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধ দেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেন ধর॥
লোক নিস্তারিতে এই তোমা অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার॥
এবে অল্প সংখ্যা করি কর সংকীর্ত্তন।

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—১১দশ পঃ)

হরিদাস সংখ্যা অল্প করিতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন—"লীলা সম্বরিবে তুমি লয় মোর চিতে। সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।" তোমার সম্মুখে আমি দেহ রক্ষা করিব—এই আমার ইচ্ছা। মহাপ্রভু বলিলেন—

কিন্তু আমা যে কিছু সুখ সব তোমা লঞা।
তোমা যোগ্য নয় যাবে আমারে ছাড়িয়া॥
হরিদাস চরণে ধরি কহে না করিও মায়া।
তোমার লীলার সহায় কত কোটী ভক্ত হয়।
আমা হেন যদি এক কীট মরি গেল।
এক পিপীলিকা মৈলে কাহা হানি হৈল॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—১১দশ পঃ)

তারপরদিন প্রাতঃকালে সকল ভক্ত সঙ্গে করিয়া প্রভু আসিলেন। হরিদাসকে বেড়িয়া নামসংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। রামানন্দ, সার্ব্বভৌমকে প্রভু হরিদাসের গুণের কথা কহিতে লাগিলেন। সমস্ত ভক্তগণ হরিদাসের চরণ বন্দনা করিল।

হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল।
নিজনেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখ-পদ্মে দিল॥
স্বহৃদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ।
সর্ব্বভক্ত পদরেণু মস্তকে ভূষণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ বলে বার বার।
প্রভুমুখমাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিল উৎক্রামণ॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—১১দশ পঃ)

ইহা ১৫২১ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

তারপর—

হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া॥

পরে—

হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াইয়া।
সমুদ্রে লইয়া গেল কীর্ত্তন করিয়া॥

বাঙ্গালীর সংকীর্ত্তন বুঝি সেদিন সমুদ্র-গর্জ্জনকেও স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল।

আগে মহাপ্রভু চলে নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে॥
হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইলা।
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহা তীর্থ হৈলা॥
হরিদাস পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন॥
ডোর কড়ার প্রসাদ বস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকার গর্ত্ত করি তাহে শোয়াইল॥
হরিবোল হরিবোল বলে গৌররায়।
আপন শ্রীহস্তে বালু দিল তার গায়॥
তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বাধাইল।
চৌদিকে পিণ্ডার মহা আবরণ কৈল॥
তাঁরে বেড়ি প্রভু কৈল কীর্ত্তন নর্ত্তন।
হরিধ্বনি কোলাহলে ভরিল ভুবন॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—১১দশ পঃ)

তারপরে সমুদ্রে স্নান করিয়া প্রভু সিংহদ্বারে আসিয়া, নিজে আচল পাতিয়া হরিদাসের মহোৎসবের জন্য ভিক্ষা চাহিলেন। এমন বিচলিত

হইতে তাঁহাকে আর কখনও দেখা যায় নাই। নিজে আচল পাতিয়া তিনি কোনদিনই ভিক্ষা করেন নাই।

সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারির ঠাঞি।
আচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই ॥
হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহত আমারে ॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—১১দশ পঃ)

স্বরূপ গোসাই প্রভুকে সরাইয়া দিয়া লোক দিয়া বিস্তর প্রসাদ বহন করাইয়া নিয়া গেলেন।

সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে প্রভু বসাইলা সারি সারি।

নিজে পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা আর কোন দিনই দেখি নাই।

মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে।
একেক পাতে পঞ্চজনের ভক্ষ্য পরিবেশে ॥

তারপর প্রভু ভক্তমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যে তাঁহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন ॥
যে তারে বালুকা দিতে করিলা গমন।
তাঁর মহোৎসবে যেই করিলা ভোজন ॥
অচিরে তা সবাকার হবে কৃষ্ণ প্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে ঐছে হয় শক্তি ॥
কৃপাকরি কৃষ্ণমোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈলা সঙ্গ ভঙ্গ ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে ॥
ইচ্ছামাত্র কৈলা নিজ প্রাণ নিষ্ক্রমণ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ ॥

হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাহা বিনা রত্ন শূন্য হইল মেদিনী॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—১১দশ পঃ)

ঠাকুর হরিদাসের নির্ব্বাণ উপলক্ষে প্রভুকে যেরূপ বিচলিত দেখা যায়, এরূপ আর কোন ঘটনায় আমরা দেখিতে পাইনা।

দ্বাদশ বক্তৃতা

[শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদ উজ্জ্বল নীলমণি সম্মত কি-না ? 'উড়িয়া এক স্ত্রীলোকের জগন্নাথ দর্শন উপলক্ষে চৈতন্যদেবের ব্যবহার ও তাহার তাৎপর্য্য। শ্রীচৈতন্যের সিংহদ্বারে পতন—চটক পর্ব্বত গমন—দিব্যোন্মাদের কোন্ অবস্থা ? জগদানন্দকে শচীমাতার নিকট প্রেরণের হেতু কি ? শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের কত বৎসর পরে প্রতাপরুদ্রের মৃত্যু হয় ? শ্রীঅদ্বৈতের তরজা-প্রহেলী প্রেরণ—তরজার অর্থ কি—তরজা প্রাপ্তে দিব্যোন্মাদ বৃদ্ধি পাইবার কারণ কি ? নিদ্রিত শঙ্করের প্রতি শ্রীচৈতন্যের ব্যবহার। সমুদ্রে পতন ও উদ্ধার। শিক্ষাষ্টক শ্রীচৈতন্যের নিজ মুখের বাক্য কি-না ? নীতিবাদের ক্রম-বিকাশ। শ্রীচৈতন্যের দেহত্যাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত বিচার। দেহ গেল কোথায় ? শ্রীচৈতন্যের দেহত্যাগ শ্রবণে গৌড়দেশে ভক্তগণ-সমীপে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের অভিভাষণ।]

বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন যে—আমাকে সন্ন্যাসী বলিয়া ভ্রম করিও না, আমি সন্ন্যাসী নই। কৃষ্ণের বিরহে আমি পাগল হইয়া শিখা সূত্র মুড়াইয়া বাহির হইয়াছি।

প্রভু বলে শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়
সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইনু শিখা সূত্র মুড়াইয়া॥
সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—৩য় অঃ)

রায় রামানন্দ প্রভুকে বলিয়াছিলেন যে—তুমি শ্রীরাধিকার ভাবে নিজেকে ভাবিত করিয়া, নিজের দেওয়া রস নিজেই আস্বাদন করিবার জন্য অবতার হইয়াছ।

শ্রীরাধার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥

নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
আনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥
(চৈঃ চঃ, মধ্য—৮ম পঃ)

মহাপ্রভু রায় রামানন্দের কথা স্বীকার করিয়া বলিলেন—

গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্র সুত বিনা তিহোঁ না স্পর্শে অন্যজন॥
তার ভাবে ভাবিত করি আত্মমন।
তবে কৃষ্ণ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন॥
(চৈঃ চঃ, মধ্য—৮ম পঃ)

ইহা কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন কৃষ্ণবিরহে বিক্ষিপ্ত হওয়ার কথা, আর কবিরাজ গোস্বামী আর একটু অগ্রসর হইয়া লিখিয়াছেন রাধিকার ভাবে ভাবিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করার কথা। আমরা এইখানেই দিব্যোন্মাদের অঙ্কুর দেখিতে পাই। অবশ্য নবদ্বীপলীলায় গয়াগমন হইতেই দিব্যোন্মাদের প্রথম সূচনা লক্ষিত হয়। কবিরাজ গোস্বামী আরও লিখিয়াছেন যে, স্বরূপ গোঁসাই আর রঘুনাথ দাস দিব্যোন্মাদের দ্বাদশ বৎসর মহাপ্রভুর কাছে ছিলেন। তাঁহারা দুইজনে কড়চাতে এই লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যান্য কড়চা-কর্ত্তারা তখন দূরদেশে ছিলেন। সুতরাং দিব্যোন্মাদের ঘটনা-সকল তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই। কবিরাজ গোস্বামী আরও লিখিয়াছেন—স্বরূপ গোঁসাই সূত্র করিয়াছেন, আর রঘুনাথ দাস সেই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

স্বরূপ গোঁসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ॥
সে কালে এ দুই রহে মহাপ্রভু পাশে।
আর সব কড়চা-কর্ত্তা রহে দূর দেশে॥

* * *

স্বরূপ সূত্র-কর্ত্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার।
(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—১৪দশ পঃ)

কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল॥
উদ্ধব দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ বিলাপ॥
রাধিকার ভাবে প্রভু সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা-জ্ঞান॥
দিব্যোন্মাদে ঐছে হয়, কি ইহা বিস্ময়।
অধিরূঢ় ভাবে দিব্যোন্মাদে প্রলাপ হয়॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—১৪দশ পঃ)

শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে দিব্যোন্মাদ অবস্থার অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অনুরাগ যদি স্বতঃস্ফুর্ত্ত হয় অর্থাৎ আপনি প্রকাশিত হয় তবে তাহাকে বলা হয় ভাব। আর ব্রজগোপীদের যে ভাব তাহাকে বলা হয় মহাভাব। ভাব দুই প্রকার—'রূঢ় আর অধিরূঢ়'। কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—"অধিরূঢ় ভাবে দিব্যোন্মাদে প্রলাপ হয়"। শ্রীরূপ গোস্বামী এই অধিরূঢ় ভাবকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা —মোদন আর মাদন। এই মোদন বিরহ দশায় মোহন হয়। মোহন সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে—"ব্রহ্মাণ্ড ক্ষোভ করে সেই ত মোহন"। দিব্যোন্মাদ এই মোহনের অন্তর্গত।

মোহনে পরম গতি কথনীয় নয়।
তাথে চিত্তভ্রম আভা দিব্যোন্মাদ হয়॥
উদ্‌ঘূর্ণা চিত্র জল্পাদেৎ তার ভেদ হর।
অনেক আছয়ে ভেদ কবিগণ কয়॥

উজ্জ্বল নীলমণিতে শ্রীরূপ গোস্বামী এই কথাই লিখিয়াছেন—

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতির্যতে॥
উদ্‌ঘূর্ণা চিত্র জল্পাদ্যস্তদ্ভেদো বহবো মতাঃ॥

(উঃ নীঃ)

মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের অনেক পরে শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আবার উজ্জ্বল নীলমণি লেখা হইলে পর কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ লিখিয়া ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে উহা সমাপ্ত করিয়াছেন। সুতরাং মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের ঘটনাসকল ১৫২২-১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে, এই দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল। এবং কবিরাজ গোস্বামী উহা ১৬০৭-১৬১৫ খৃষ্টাব্দ, এই নয় বৎসরের সম্ভবতঃ শেষ বৎসরে অর্থাৎ ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন এই যে—কবিরাজ গোস্বামী উজ্জ্বল নীলমণি বর্ণিত দিব্যোন্মাদের অবস্থাসকল অনুধাবন করিয়া উহা মহাপ্রভুর জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসরের উপর আরোপ করিয়াছেন অথবা শ্রীরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বৎসরের ঘটনাসকল জানিতে পারিয়া উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে উহা সম্যক বিশ্লেষণপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় এ দুই কথাই সত্য হইতে পারে।

(বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত অসম্পূর্ণ পুঁথি। লীলার শেষ অংশ ইহাতে নাই। সুতরাং দিব্যোন্মাদের কোন কথাই আমরা বৃন্দাবনদাসে পাই না। কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃত একখানি আদ্যোপান্ত সম্পূর্ণ পুঁথি। লীলার শেষ অংশ ইহাতে সম্পূর্ণ বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থেই আমরা প্রভুর দিব্যোন্মাদের বিশদ ও বিস্তৃত বর্ণনা পাই। কিন্তু একটি লক্ষ্য করিবার কথা যে, বৃন্দাবনদাসে দিব্যোন্মাদ বর্ণিত না হইলেও উহার বীজ বা অঙ্কুর মহাপ্রভুর নিজমুখে স্বীকারোক্তির মধ্যেই আমরা পাই। (বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে প্রভু স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণের বিরহে বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ পাগল হইয়াই তিনি সন্ন্যাসের আবরণ লইয়া শিখাসূত্র মুড়াইয়া বাহির হইয়াছেন। পাতঞ্জল দর্শনে মনের এই বিক্ষিপ্ত অবস্থার বিশ্লেষণ ও বর্ণনা আছে। এই কৃষ্ণ বিরহই জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর তাহাকে দিব্যোন্মাদগ্রস্ত করিয়াছে। প্রেম না হইলে বিরহ হয় না। আর বিরহেরই পরিণত অবস্থায় উন্মত্ততা দেখা দেয়। যেহেতু ইহা ভগবানের প্রতি যে প্রেম সেই প্রেমজনিত বিরহ এবং সেই বিরহজনিত উন্মত্ততা, সুতরাং ইহাকে সাধারণ প্রেমজনিত উন্মত্ততা না বলিয়া দিব্যোন্মাদ বলা হইয়াছে।)

প্রভুর দিব্যোন্মাদের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন যে, প্রভু এইকালে পর পর তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়া লীলা প্রকট করিয়াছেন—কখনও তাহার বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় অটুট রহিয়াছে ; কখনও বা বাহ্যজ্ঞান অর্দ্ধেক লুপ্ত হইয়াছে ; আবার কখনও বা তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই, ভাবে সম্পূর্ণ মগ্ন হইয়াছেন। যদি বলা যায় যে—এ অবস্থায় তাঁহার স্নানভোজনাদি সাধারণ দৈহিককার্য্য কিরূপে নিস্পন্ন হইত ; তার উত্তরে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন যে—ইহা দেহ-স্বভাবে অথবা পূর্ব্ব অভ্যাসমত হয়।

কভু ভাবে মগ্ন কভু অর্দ্ধ বাহ্য স্ফূর্ত্তি।
কভু বাহ্য স্ফূর্ত্তি তিন রীতে প্রভুর স্থিতি॥
স্নান দর্শন ভোজন দেহ স্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয়॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—১৫দশ পঃ)

উড়িয়া এক স্ত্রীলোকের জগন্নাথ দর্শন উপলক্ষ্যে প্রভুর যে ব্যবহার, জগদানন্দকে শচীমাতার নিকট প্রেরণ এবং নিদ্রিত শঙ্করের গাত্রে নিজের কাঁথা জড়াইয়া দেওয়া প্রভৃতি ব্যবহারে প্রভুর স্বাভাবিক বাহ্যজ্ঞান অটুট রহিয়াছে, আমরা দেখিতে পাই। দেহমনে স্বাভাবিক অবস্থা অটুট না থাকিলে তিনি এসকল কার্য্য করিতে পারিতেন না।

যাবৎকাল দর্শন করে গরুড়ের পাছে।
প্রভু আগে দর্শন করে লোক লাখে লাখে॥
উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞা।
গরুড়ে চড়ে দেখে প্রভু স্কন্ধে পদ দিয়া॥
দেখিয়া গোবিন্দ আস্তেব্যস্তে সেই স্ত্রীকে বর্জ্জিলা।
তারে নামাতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা॥
আদিবশ্যা এই স্ত্রীকে না কর বর্জ্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন॥
আস্তেব্যস্তে সেই নারী ভূমিতে নামিলা।
মহাপ্রভু দেখি তাঁর চরণ বন্দিলা॥

তার আর্ত্তি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা।
এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা॥
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনুমনপ্রাণে।
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে॥
অহো ভাগ্যবতী এই বন্দি ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমার বা হয়॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—১৪দশ পঃ)

কলির জীবকে নিজের স্কন্ধে তুলিয়া জগন্নাথ দেখাইবার ভার প্রভু নবদ্বীপলীলায় শ্রীবাসের বাড়ীতে আচার্য্য অদ্বৈতের সম্মুখে অঙ্গীকার করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরীলীলায় দিব্যোন্মাদের ভিত্তিভূমি স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়াইয়া তিনি তাহা বিস্মরণ হন নাই। অবতার পুরুষের কি উচ্চ মহান্ ভাব! জগদানন্দকে প্রতি বৎসর নবদ্বীপ পাঠাইয়া তিনি জননীকে আশ্বাস দেন—

নদীয়া চলহ মাতাকে কহিও নমস্কার।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার॥
কহিয় তাঁহাকে তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিতে চরণ॥
যে দিনে তোমার ইচ্ছা করাতে ভোজন।
সে দিনে অবশ্য আমি করি যে ভক্ষণ॥
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ॥
তোমার অধীন আমি পুত্র যে তোমার॥
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—১৯শ পঃ)

তারপর—

জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনাঞা যতনে।
মাতাকে পৃথক পাঠান আর ভক্তগণে॥

মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি।
'সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী॥'

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—১৯শ পঃ)

সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার প্রাক্কালে বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, প্রভু জননীকে এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন—

'ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে, সব মোর ভার॥
বুকে হাথ দিয়া প্রভু বোলে বার বার।
তোমার সকল ভার আমার আমার॥'

(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৭শ অঃ)

এই আশ্বাসবাণী মিথ্যা হয় নাই। সন্ন্যাস লইয়াও জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি জননীকে সেবা করিয়া গিয়াছেন।

শঙ্কর পণ্ডিত প্রভুর পাদ সম্বাহন করিত এবং করিতে করিতে—

ঘুমাইয়া পড়ে তৈছে করেন শয়ন॥
উঘার অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়।
প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাহারে জড়ায়॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—১৯শ পঃ)

রঘুনাথ দাস চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে মহাপ্রভুর এই লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণ রথের সময় পুরী আসিয়া চারি-মাস প্রভুর সঙ্গে থাকিত।

প্রভু আজ্ঞা দিল সবে গেল গৌড়দেশে॥
তাঁ সবা সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান।
তাঁরা গেলে পুনঃ হইল উন্মাদ প্রধান॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—১৬শ পঃ)

সুতরাং দেখা যাইতেছে, দিব্যোন্মাদের সকল অবস্থাতেই তিনি উন্মাদগ্রস্ত ছিলেন না। উপরে উল্লিখিত সমস্ত ঘটনা গুলিরই মধ্যে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান অটুট ছিল।

কবিরাজ গোস্বামী পুনঃ পুনঃ প্রভুর তিন দশায় অবস্থানের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন—

তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল।
অন্তর্দ্দশা বাহ্যদ্দশা অর্দ্ধ-বাহ্য আর॥
অন্তর্দ্দশায় কিছু ঘোর কিছু বাহ্যজ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত অর্দ্ধ-বাহ্য নাম॥
অর্দ্ধ-বাহ্যে কহে প্রভু প্রলাপ বচনে।
আভাষে কহেন সব শুনে ভক্তগণে॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—১৮দশ পঃ)

বাহ্যজ্ঞান, অর্দ্ধ-বাহ্যজ্ঞান, বাহ্যজ্ঞানশূন্য সম্পূর্ণ ভাবে মগ্ন—এই তিন অবস্থাকেই কবিরাজ গোস্বামী দিব্যোন্মাদ বলিয়াছেন। এইবার অর্দ্ধ-বাহ্যের অবস্থার ঘটনাসকল বলা হইতেছে—

কৃষ্ণের বিয়োগ গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয়॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—১৪দশ পঃ)

প্রভু একাকী গভীর রাত্রে কৃষ্ণকে মিলিবার জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া জগন্নাথের মন্দিরের সিংহদ্বারে গিয়া পতিত হইয়াছেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। স্বরূপ গোঁসাই প্রভৃতি ভক্তেরা সিংহদ্বারে গিয়া কৃষ্ণনাম কর্ণে দিয়া প্রভুকে চেতন করাইল।

সিংহদ্বার দেখি প্রভুর বিস্ময় হইল।

* * *

প্রভু কহে কিছু স্মৃতি নাহিক আমার॥
সবে দেখি হয়ে মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান।
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্দ্ধান॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—১৪দশ পঃ)

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

রঘুনাথ দাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি।
তার মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—১৮দশ পঃ)

আর একদিনের ঘটনা—

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে।
চটক পর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে॥
গোবর্দ্ধনের শৈলজ্ঞানে আবিষ্ট হইল।
পর্ব্বত দিকেতে প্রভু ধাইয়া চলিল॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—১৪দশ পঃ)

* * *

গোবিন্দ ধাইল পাছে নাহি পায়ে লাগে।

—চটক পর্ব্বতকে প্রভু গোবর্দ্ধন পর্ব্বত বলিয়া ভ্রম করিলেন। প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি ভক্তগণকে বলিলেন—

গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইঁহা আনিল।
পাইয়া কৃষ্ণলীলা দেখিতে না পাইল॥
ইঁহা হৈতে আজি মুঞি গেনু গোবর্দ্ধনে।
দেখোঁ যদি কৃষ্ণ করে গোধন চারণে॥
গোবর্দ্ধন চড়ি কৃষ্ণ বাজাইল বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চড়ে সব ধেনু॥
বেনুণাদ শুনি আইলা রাধাঠাকুরাণী।
তাঁর স্বরূপভাব সখি বর্ণিতে না জানি॥
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখিগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈলা।
তাঁহা হৈতে ধরি মোরে ইঁহা লঞা আইলা॥
কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—১৪দশ পঃ)

চটক পর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত বলিয়া ভ্রম করার কারণ প্রভু নিজ মুখেই ব্যক্ত করিলেন। যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্তু জ্ঞান করার নাম ভ্রম। শ্রীরূপ গোস্বামী এইরূপ ভ্রমকে দিব্যোন্মাদের একটি লক্ষণ

বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখানে দেখা যাইতেছে, কৃষ্ণপ্রেমই এই ভ্রমের কারণ। আর একটি ঘটনা, যমুনাভ্রমে সমুদ্রে পতন।

শরৎকালের রাত্রি সব চন্দ্রিকা উজ্জ্বল।
প্রভু নিজগণ লঞা বেড়ান সকল ॥

*　　　　*　　　　*

এই মত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখেন আচম্বিতে ॥
চন্দ্রকান্ত্যে উচ্ছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল ॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা ॥
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা কিছুই না জানে।
কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে ॥
তরঙ্গে বহিয়া ফিরে যেন শুষ্ক কাঠ ॥
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট ॥
কোণার্কের দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লঞা যায়।
কভু ডুবায়ে রাখে কভু ভাসায়ে লঞা যায় ॥
যমুনার জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ করে মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে ॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—১৮দশ পঃ)

এখানেও দেখা যাইতেছে প্রভু সমুদ্রে যমুনা ভ্রম করিতেছেন এবং যমুনা ভ্রম করিবার কারণও তিনি নিজমুখে ব্যক্ত করিতেছেন। ইহা সমস্তই দিব্যোন্মাদের লক্ষণ। এই দিব্যোন্মাদ অবস্থায় প্রভুর দেহ নীলাচলে আছে বটে, কিন্তু মন বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছে। নীলাচলে থাকিয়াও তিনি দিব্যোন্মাদ অবস্থায় সম্পূর্ণ বৃন্দাবনলীলা আস্বাদন করিতেছেন। ইহারই নাম দিব্যোন্মাদ। দিব্যোন্মাদ প্রাকৃতের অবস্থা বা ভাব নয়, কেননা এই অবস্থায় অপ্রাকৃতের বস্তুসকল গোচর হইতেছে।

এই অবস্থার মধ্যে আচার্য্য অদ্বৈত শান্তিপুরে থাকিয়া প্রভুকে

নীলাচলে জগদানন্দের নিকট এক তরজা-প্রহেলী কহিয়া পাঠাইলেন। এই তরজার অর্থ সহজে বোধগম্য নয়। আচার্য্য অদ্বৈত বলিতেছেন—

প্রভুকে কহিয় আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥
বাউলকে কহিও লোকে হৈল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥
এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি তবে প্রভুকে কহিলা॥
তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
তাঁর যেই অজ্ঞা বলি মৌন করিলা॥
জানিয়া স্বরূপ গোঁসাই প্রভুকে পুছিল।
এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল॥
প্রভু কহে আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল॥
উপাসনা লাগি দেবে করে আবাহন।
পূজা লাগি কতক কাল করে নিরোধন॥
পূজা নির্ব্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তরজার না জানি অর্থ কিবা তার মন॥
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তরজাতে সমর্থ।
আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপ গোঁসাই কিছু হৈলা বিমন॥
সেই দিন হইতে প্রভু আর দশা হইল।
কৃষ্ণবিরহ দশা দ্বিগুণ বাড়িল॥
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রিদিনে।
রাধা ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে॥

আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণ মথুরা গমন।
উদঘূর্ণা দশা হৈল উন্মাদ লক্ষণ॥
রামানন্দের গলা ধরি করে প্রলাপন।
স্বরূপে পুছেন মানি নিজ সখীগণ॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—১৯শ পঃ)

প্রভু বলিতেছেন, এই তরজার অর্থ তিনি বুঝিতে পারেন না। অথচ তরজা শুনিয়া প্রভু ঈষৎ হাসিলেন এবং মহাযোগেশ্বর আচার্য্য অদ্বৈতের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন। স্বরূপ গোঁসাই এই তরজার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু যাহা বলিলেন তাহাও আকারইঙ্গিতে, সহজে বোধগম্য নয়। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"প্রভু মাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে"। প্রভু নিশ্চয়ই তরজার অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সকলের নিকট তরজার অর্থ প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যদি তিনি তরজার অর্থ বুঝিতেই না পারিবেন, তবে তরজা শুনিবার পর সহসা কৃষ্ণের বিরহদশা দ্বিগুণ বাড়িল কেন এবং উন্মাদলক্ষণ উদঘূর্ণাদশা হইল কেন?

১৫১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে মহাপ্রভুর আদেশমত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু গৌড়দেশে প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের অন্ততঃ দ্বাদশ বৎসর পরে আচার্য্য অদ্বৈত মহাপ্রভুকে এই তরজা প্রেরণ করেন। সুতরাং অনেকে মনে করেন যে, শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারকে উপলক্ষ করিয়াই আচার্য্য অদ্বৈত এই তরজা পাঠাইয়াছিলেন। ("লোকে হইল আউল", "হাটে না বিকায় চাউল", "কার্য্যে নাহিক আউল" ইত্যাদি কথায় শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের বিরুদ্ধেই কটাক্ষ ছিল। ইহা অনেকের মত হইলেও আমাদের মত নয়। কেননা, শ্রীবাসের বাড়ীতে মহাপ্রভুর নেতৃত্বগ্রহণরূপ অভিষেকের সময় আচার্য্য অদ্বৈত মহাপ্রভুকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—"যদি ভক্তি বিলাইবা। স্ত্রী শূদ্র, মূর্খ আদি তাদেরে সে দিবা। চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুন গ্যায়া॥" "প্রভু বলে সত্য যে তোমার অঙ্গীকার"—(চৈঃ ভাঃ, মধ্য—৬ষ্ঠ অঃ)।

ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের মধ্যে আচার্য্য অদ্বৈত মহাপ্রভুকে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কেননা, তাঁহারা মহাপ্রভুকে

মানে না। তাঁহারা এই প্রচারের বিরোধী। ইহা আচার্য্য অদ্বৈতের স্পষ্ট অভিমত।

আর এদিকে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ আচণ্ডালে প্রেম দিয়া স্ত্রী-শূদ্রকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া সমাজের নিম্নস্তরকে উদ্ধার করিবার কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। আচার্য্য অদ্বৈতের অভিপ্রায় অনুযায়ী শ্রীপাদ নিত্যানন্দ আচণ্ডালে মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিতরণ করিতেছেন। সুতরাং শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের বিরুদ্ধে এই তরজায় আচার্য্য অদ্বৈতের কটাক্ষ অনুমান করা ইতিহাসসম্মতও নয় এবং যুক্তিসিদ্ধও নয়।

কিন্তু এই তরজাতে আঘাত পাইবার মত এমন কিছু ছিল—নিশ্চয়ই ছিল—যাহাতে এই তরজা পাইয়া মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল।

তরজার প্রচলিত অর্থ হইতেছে যে, শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুকে বলিলেন যে, এখন তুমি লীলা সম্বরণ কর। কেননা, লীলার যে প্রয়োজন তাহা শেষ হইয়াছে; লোকে প্রেমধর্ম্ম পাইয়া 'আউল বাউল' অর্থাৎ পাগল হইয়া গিয়াছে। এই তরজা শ্রীপাদ নিত্যানন্দের গৌড়ে প্রচারের অন্ততঃ ১২ বৎসর পরের ঘটনা—দিব্যোন্মাদ আরম্ভ হইবার পর মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা। তরজার প্রচলিত যে ব্যাখ্যা, তাহা গ্রহণ করিতে ভরসা পাই না। কেননা, শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচার নির্বিঘ্নে হইতে পারে নাই। ইহা একটা ধর্ম্ম ও সমাজবিপ্লব, কাজেই ইহা কখনও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে না—বহু বাধাবিঘ্ন এই প্রচারের পথে দেখা দিয়াছে। বাংলা চরিতগ্রন্থে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে। বিশেষতঃ—তুমি লীলা সম্বরণ কর—অর্থাৎ মর, একথা আচার্য্য অদ্বৈত মহাপ্রভুকে বলিতে পারেন বলিয়া আমার ধারণা হয় না। ঠাকুর হরিদাস, প্রভু লীলা সম্বরণ করিবেন আশঙ্কায়, তৎপূর্ব্বেই দেহরক্ষা করিলেন।

আচার্য্য অদ্বৈতের এই অদ্ভুত তরজা যদি শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের প্রতি কটাক্ষ না হয়, আবার যদি ইহা শ্রীঅদ্বৈত কর্ত্তৃক মহাপ্রভুকে লীলা সংবরণ করিবার জন্য অনুরোধজ্ঞাপকও না হয়, তবে এই তরজার অর্থ কি? এই তরজার নিশ্চয়ই একটা সাধারণে অপ্রকাশ্য গূঢ় অর্থ ছিল। কি সেই অর্থ?

(আমার ধারণা শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের অন্তর্গত পতিত উদ্ধারের প্রতি এই তরজার কোন কটাক্ষ না থাকিলেও এই প্রচারের বিরুদ্ধে যে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল সেই প্রতিক্রিয়ার সহিত এই তরজা-প্রহেলিকার একটা যোগাযোগ ছিল।)

শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের বিরুদ্ধে স্বয়ং মহাপ্রভুর নিকট দোষোদ্ঘাটন করিয়া লাগানি হইয়াছিল এবং মহাপ্রভু শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে সে কথা বলিয়াওছিলেন। শ্রীপাদ যে মহোৎসব মাগিয়া খাইতেন, এ যুক্তি তাঁহাকে মহাপ্রভু দেন নাই—একথা মহাপ্রভু নিজ মুখেই প্রকাশ করিয়াছেন—"মহোৎসব মাগিয়া নাচেন সংকীর্ত্তনে। হেন যুক্তি তোমারে দিলেক কোনজনে ?"—(জয়া, চৈঃ মঃ—উত্তরখণ্ড)। শ্রীপাদ উত্তর করিলেন "কাঠিন্য কীর্ত্তন কলিযুগ ধর্ম্ম নহে"। শ্রীপাদের প্রচার লইয়া যে কিছুটা তর্কবিতর্ক মহাপ্রভুর সহিত হইয়াছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল। এই দিক দিয়া শ্রীঅদ্বৈতের তরজার সহিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের একটা যোগাযোগ থাকা অসম্ভব ত নয়ই বরং খুবই সম্ভব।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারকে দুইটী প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। "জাতিভেদ না করিব চণ্ডাল যবনে"—ইহা চারিটিখানি কথা নয়। 'চণ্ডালকে' জাতিভেদ না করিলে সমাজের কর্ত্তা ব্রাহ্মণ মারিতে আসে, আবার 'যবনকে' জাতিভেদ না করিলে যবনরাজশক্তি গৌড়েশ্বর অত্যাচারের প্রবল বন্যা বহাইতে সুরু করেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচার "চণ্ডাল ও যবনকে" আত্মসাৎ করিয়া এক বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। এত বড় বিপ্লব বাংলার ইতিহাসে অদ্যাপি দেখা যায় নাই। এই বিপ্লবের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই ছিল। সেই প্রতিক্রিয়ার সহিত আচার্য্য অদ্বৈতের এই তরজা-প্রহেলিকার যোগাযোগ আছে—আমার এইরূপ ধারণা হয়। মহাপ্রভু এই সমাজ ও ধর্ম্মবিপ্লবের স্রষ্টা। তর্জায় এই প্রতিক্রিয়ার ইঙ্গিত তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এবং তাহার পর হইতেই তাঁহার দিব্যোন্মাদ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

দিব্যোন্মাদ হঠাৎ একদিনে আরম্ভ হয় নাই। ইহা স্পষ্টরূপে

আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দেবদাসীর গীত শ্রবণে আবেশে মগ্ন হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রভু ধাবিত হইয়াছিলেন। দেবদাসী গীত-গোবিন্দকৃত গুর্জ্জরি রাগের একটি পদ সুমধুর স্বরে গাহিতেছিল; পদটি—রতিসুখ সারে গতম অভিসারে মদনমনোহর বেশং। তারপর—ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী ইত্যাদি। আবিষ্ট হইয়া দেবদাসীর প্রতি ধাইয়া আলিঙ্গন করিতে যাওয়ার চেষ্টা হইতেই দিব্যোন্মাদের সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়। ইহা একটি ক্রমবিকাশ; অদ্বৈতের তরজা পাওয়ার পর হইতেই ইহা দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়, দিব্যোন্মাদের ক্রমবিকাশ সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে সূক্ষ্মতর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

তারপর এইবার স্বরূপ ও রায় রামানন্দকে প্রভু বাহ্যজ্ঞানে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—২০শ পঃ)

লক্ষ্য করিবার বিষয়, দিব্যোন্মাদের অবস্থাতেও প্রভু তাঁহার ধর্ম্মের নীতিবাদ বিস্মরণ হইতেছেন না। শ্রীজীবের দার্শনিক মতবাদ (ষট্-সন্দর্ভ) ও শ্রীরূপের রসতত্ত্ব অলঙ্কার (উজ্জ্বল নীলমণি) শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মে পুরাপুরি গৃহীত হইয়াছে। শিক্ষিত রসিক ভক্ত সংখ্যায় এবং সংসারে অল্প। এই অল্প সংখ্যক ভক্তেরাই শ্রীজীব ও শ্রীরূপের দ্বারা প্রভাবান্বিত। কিন্তু আপামরসাধারণ মহাপ্রভুকথিত নীতি দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের নীতিবাদ তাহার দার্শনিক মত ও রসতত্ত্ব হইতে বৈষ্ণব সাধারণকে অধিকতর

প্রভাবান্বিত করিয়াছে, ফল তাহার যাহাই হউক। বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত মহাপ্রভুর নীতিবাদ বাংলার শাক্ত মতাবলম্বীদের নীতিবাদ হইতে বিপরীত। শাক্তেরা চণ্ডী ও গীতার নীতিবাদের পক্ষপাতী।

এই শিক্ষাষ্টক শ্রেণীর শ্লোকগুলি মহাপ্রভুর নিজমুখের বাক্য কি-না, তাহা লইয়া কথা উঠিয়াছে। এই শিক্ষাষ্টক প্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ, মধ্য—২২শ পঃ), রঘুনাথ দাসকেও বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ, অন্ত্য —৬ষ্ঠ পঃ)—"গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্য কথা না কহিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥ অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥" প্রভু বলিতেছেন—"এইত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ"। দিব্যোন্মাদের অবস্থায় স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দকে সেই একই উপদেশ দিতেছেন। কবিরাজ গোস্বামী ইহা শ্রীসনাতন ও শ্রীরঘুনাথ দাসের নিকট শুনিয়া লিখিয়াছেন; সুতরাং ইহা নির্ভরযোগ্য, সন্দেহের কোনই কারণ নাই।

(আমরা নবদ্বীপলীলায় দেখিয়াছি, প্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন— জগাই মাধাইকে "খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা" (চৈঃ ভাঃ, মধ্য— ১৩দশ অঃ), "ছিণ্ড ছিণ্ড পাষণ্ডীর মাথা"; চাঁদ কাজির বাড়ী আক্রমণ করিয়া বলিলেন—"ক্রোধে বলে প্রভু আরে কাজি বেটা কোথা। ঝাট আন ধরিয়া, কাটিয়া ফেল মাথা" (চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৩শ অঃ), "ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ প্রভু বলে বার বার। প্রভু বলে অগ্নি দেহ বাড়ির ভিতর॥ পুড়িয়া মরুক সব গণের সহিতে। আজি সব যবনের করিমু প্রলয়" (চৈঃ ভাঃ, মধ্য—২৩শ অঃ)। ইহা পুরীলীলায় শিক্ষাষ্টক নির্দ্দিষ্ট অহিংসনীতি নয়। এখন প্রশ্ন—নবদ্বীপ ও পুরীলীলার নীতিকথার মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়?) ১ম, নবদ্বীপলীলাতেই ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীপাদ নিত্যানন্দ অহিংসনীতি প্রথম প্রচার করিয়াছেন। ২য়, নবদ্বীপের পাষণ্ডী ও যবনরাজ অত্যাচার অহিংসনীতির অনুকূল ছিল না। ৩য়, পুরীলীলায় প্রতাপরুদ্রের হিন্দুরাজ্যে অহিংসনীতি প্রচার সহজ ও সুগম ছিল। নীতিবাদ ক্রমবিকাশের পথে নবদ্বীপ হইতে পুরীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যেমন অবতারবাদ নবদ্বীপ হইতে পুরীতে কৃষ্ণ হইতে রাধায় রূপান্তরিত হইয়াছে। অবতারবাদ ও নীতিবাদ এই উভয়েই নবদ্বীপ হইতে

পুরীলীলায় ক্রমবিকাশপথে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া সামঞ্জস্য করা কঠিন। যেমন অবতারবাদে, তেমনি নীতিবাদে ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা দিব্যোন্মাদের কথায় ফিরিয়া যাইতেছি। এই দিব্যোন্মাদ অবস্থায় যখন প্রভু ভাবে মগ্ন থাকিতেন তখন—

ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়॥
বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস শ্রীগীত গোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥
মধ্যে মধ্যে আপনে প্রভু শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করে প্রভু বিলাপ করিয়া॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য—১৭দশ পঃ)

ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু দিব্যোন্মাদ অবস্থায় যেসকল গ্রন্থের পাঠ শুনিতেন এবং কখনও বা নিজে পাঠ করিতেন, আমরা তাহার একটি তালিকা পাইলাম। দিব্যোন্মাদের পূর্ব্ব অবস্থাতেও আমরা দেখিয়াছি যে—

চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য—২য় পঃ)

সুতরাং স্বাভাবিক অবস্থায় যেসকল গ্রন্থ তিনি শ্রবণ করিতেন, উপভোগ করিতেন, রস আস্বাদন করিতেন—দিব্যোন্মাদের অবস্থাতেও সেই সকল গ্রন্থের ভাবে তিনি মগ্ন হইতেন ও রস আস্বাদন করিতেন।

এইবার মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান করিবার কথা আসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু ইহা এক মহা রহস্যে আবৃত। লীলা—নিত্য, কাজেই অপ্রকট হইবার পরেও প্রভু লীলা করিতেছেন। লীলার শেষ নাই—"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরারায়। কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥" সুতরাং লীলার শেষ বর্ণনা করা প্রাচীনদের মতে অপরাধ। বৃন্দাবনদাস বা কবিরাজ গোস্বামী কেহই এই তিরোভাব বর্ণনা করেন নাই। অথচ এই দুই মহাগ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণিক। লোচন বা জয়ানন্দের

গ্রন্থের প্রামাণ্য মর্য্যাদা বৃন্দাবনদাস ও কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থের প্রামাণ্য মর্য্যাদা অপেক্ষা কম। তথাপি লোচন বা জয়ানন্দ মহাপ্রভুর তিরোভাব সম্পর্কে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা মিথ্যা কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। জয়ানন্দ বলিতেছেন—

আষঢ় বঞ্চিত রথ বিজয় নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে।
সেই লক্ষ্য টোটায় শয়ন অবশেষে॥

(চৈঃ মঃ—উত্তর খণ্ড)

তারপর গরুড়ধ্বজ রথে চড়িয়া শ্রীচৈতন্যদেব চলিয়া গেলেন—"মায়া শরীর তথা রহিল যে পড়ি"। এই তিরোভাবের তারিখ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন।

কিন্তু প্রশ্ন হইবে—সেই মায়া শরীরের কি গতি হইল, দেহরক্ষা করিলেন কোথায়? আবার এই তিরোভাব সম্পর্কে লোচন বলিতেছেন—

আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥
গুঞ্জাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ।
কি কি বলি সত্বরে সে আইল তখন॥
বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা।
ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখিতে বড় ইচ্ছা॥
ভক্ত আর্ত্তি দেখি পড়িছা কহয়ে কথন।
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হইল অদর্শন॥

(চৈঃ মঃ—শেষ খণ্ড)

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ানন্দের কথাই মানিয়া লইয়াছেন। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন জয়ানন্দ ও লোচনকে একত্র করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, গুণ্ডিচা মন্দিরেই তাঁহার দেহের "সমাধি দেওয়া হইয়াছিল"; এখন জয়ানন্দ 'টোটা' কথাটার উল্লেখ করিয়াছেন। এই টোটা দ্বারা গুণ্ডিচা গৃহই অনুমিত হইতেছে। বস্তুতঃ

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তুলনামূলক বিচার করিয়া লোচনকেই অনুসরণ করিলেন (ভারতবর্ষ, ১৩১৫—ফাল্গুন)। আবার ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় "শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"আমার নিজের ধারণা যে, জয়ানন্দ প্রদত্ত বিবরণই সত্য। প্রভু ইটে আহত হইয়া জ্বর ও দূষিত ক্ষতে আক্রান্ত হন এবং তাঁহার প্রিয় বন্ধু গদাধর পণ্ডিতের আশ্রমে দেহরক্ষা করেন।"

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন গুণ্ডিচা মন্দিরে মহাপ্রভুর দেহের সমাধি দিলেন। আবার ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার গদাধর পণ্ডিতের আশ্রমে অর্থাৎ টোটায় প্রভুর দেহরক্ষা করিলেন। কিন্তু গুণ্ডিচা মন্দির ও গদাধর পণ্ডিতের আশ্রম এক স্থান নয়। সুতরাং একই উপাদান লইয়া একই তুলনামূলক বিচারে আমরা দুইজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের নিকট হইতে ভিন্ন মতবাদ পাইলাম।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদারের ১১ বৎসর আগে (ভারতবর্ষ, ১৩১৫—ফাল্গুন) এই আলোচনা করিয়াছেন। জগন্নাথে লীন হওয়ার মধ্যে একটা গুপ্ত হত্যার ইঙ্গিত সমর্থনের জন্য যখন কোন প্রমাণ ডাঃ মজুমদার পাইলেন না, তখন গুপ্তহত্যা একটা অনুমানমাত্রই থাকিয়া যাইতেছে—সত্য ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না, তবে অসম্ভব নয় এই যা।

এখন প্রশ্ন—মহাপ্রভুকে গুপ্ত হত্যার কথা উঠে কেন? প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, প্রতাপরুদ্র শেষ জীবনে রাজকার্য্যে অমনোযোগী হইয়া মহাপ্রভুর সহিত ধর্ম্ম চর্চ্চা করাতে তাঁহার রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি, প্রভুর দিব্যোন্মাদের দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতেই (১৫২০ খৃঃ) রাজা প্রতাপরুদ্র যুদ্ধবিগ্রহাদি সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া প্রভুর কৃপাপ্রার্থী হইয়া ধর্ম্মে মন দিয়াছিলেন। ইহাতে রাজ অমাত্যেরা অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। এদিকে জগন্নাথদেবের পাণ্ডারা দেখিল যে, রাজা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ অপেক্ষা মহাপ্রভুকেই অধিকতর সম্মান দিতেছেন এবং মহাপ্রভুর প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং রাজ অমাত্য ও পাণ্ডারা স্থির করিল যে, মহাপ্রভুকে গোপনে হত্যা করিলেই রাজ্যও রক্ষা পায় আর জগন্নাথের প্রতি প্রতাপরুদ্রের

ভক্তি ও আকর্ষণ ফিরিয়া আইসে। গুপ্ত হত্যার কারণ সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। কিন্তু এক অনুমান ভিন্ন যথেষ্ট প্রমাণের একান্তই অভাব। যে বৎসর প্রভুর তিরোভাব হয় (১৫৩৩ খৃঃ) ঠিক সেই বৎসরেই গৌড়েশ্বর নশরৎ শাহকে তাঁহার একজন ভৃত্য (খোজা) গোপনে হত্যা করে।

জগন্নাথে লীন হওয়ার কথায় যাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাঁহাদের কাছে প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে—প্রভুর মৃতদেহ তবে গেল কোথায়? এই মৃতদেহের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে গুপ্ত হত্যার সন্দেহ বৃদ্ধি পায়। জগন্নাথে লীন হওয়া সাধারণভাবে ভক্তদের ও বিশেষভাবে প্রতাপরুদ্রকে প্রবোধ দিবার জন্য হত্যাকারীদের তৈরী কথা।

প্রতাপরুদ্রের জীবিতকালেই মহাপ্রভু দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। কেননা, চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে কবি কর্ণপুর উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রভুর তিরোভাব প্রতাপরুদ্রের নিকট অসহ্য বোধ হওয়াতেই এবং প্রভুর বিরহ-জনিত দুঃখ দূর করিবার জন্য চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের উৎপত্তি হয়। ঐ নাটকে মহাপ্রভুর ভূমিকায় অবতীর্ণ সুদক্ষ নটকে দেখিয়া রাজা প্রতাপরুদ্রের জীবন্ত মহাপ্রভু বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। প্রতাপরুদ্র ১৫৩৯।৪০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের সময় শ্রীপাদ নিত্যানন্দ গৌড়দেশে আচণ্ডালে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এইবার নীলাচল হইতে গৌড়দেশে সংবাদ আসিল যে—

চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি।

তারপর—

অনেক সেবক সর্প দংশাইঞা মৈল।
উল্কাপাত বজ্রপাত ভূমিকম্প হৈল॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি শুনি।
বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্চ্ছা গেলা শচী ঠাকুরাণী॥

(চৈঃ মঃ—উত্তর খণ্ড)

বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতার অবস্থা বর্ণনার অতীত বলিয়াই কোন গ্রন্থকর্ত্তা উহা বর্ণনা করিবার চেষ্টা মাত্র করেন নাই। চৈতন্য বিজয় শুনিয়া

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রথমে সপারিষদ নিঃশব্দ হইলেন। পরে, কি করিয়া, কবে, কিরূপে অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন—জিজ্ঞাসা করিলেন।

চৈতন্য বিজয় লীলা করিলা শ্রবণ।

(চৈঃ মঃ—উত্তর খণ্ড)

তারপর পাছে মহাপ্রভুর তিরোভাবে বৈষ্ণবেরা হতাশ হইয়া পড়েন, প্রচারে বাধা আসে, তাই গম্ভীর স্বরে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ঘোষণা করিলেন—

নিত্যানন্দ স্বরূপ সে যদি নাম ধরোঁ।
আচণ্ডাল আদি যদি বৈষ্ণব না করোঁ॥
জাতি ভেদ না করিব চণ্ডাল যবনে।
প্রেমভক্তি দিঞা সভায় নাচামু কীর্ত্তনে॥
কুলবধূ নাচাইমু কীর্ত্তনানন্দে।
অন্ধ বধির পঙ্গু নাচিবে স্বচ্ছন্দে॥
অদ্বৈত আইনু চৈতন্য যে আইমু সে চৈতন্য।
গৌড় উৎকল রাজ্য করিমু ধন্য ধন্য॥

(চৈঃ মঃ—উত্তর খণ্ড)

মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর মূহূর্ত্তেই শ্রীপাদ নিত্যানন্দের মুখে বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্মের মর্ম্মকথা আবার দ্বিগুণ উৎসাহে ঘোষিত হইল। চণ্ডালে যবনে যে-বৈষ্ণব সে জাতিভেদ করিবে না—কুলবধূ কীর্ত্তন আনন্দে নাচিবে; অন্ধ, বধির ও পঙ্গু স্বচ্ছন্দে নাচিবে; গৌড় ও উৎকল রাজ্য ধন্য ধন্য হইবে।

বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কান পাতিয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দের এই অভিভাষণ শুন, আর ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে বাঙ্গালীর "সে বজ্রনির্ঘোষে কি ছিল বারতা" নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা কর।

সমাপ্ত

O.P./97—44